আমাদের পৃথিবী

অষ্টম শ্রেণি

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

প্রথম সংস্করণ: ডিসেম্বর, ২০১৩
দ্বিতীয় সংস্করণ: ডিসেম্বর, ২০১৪

গ্রন্থস্বত্ব : পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

প্রকাশক :
নবনীতা চ্যাটার্জি
সচিব, পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ
৭৭/২, পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১৬

মুদ্রক :
ওয়েস্ট বেঙ্গল টেক্সটবুক কর্পোরেশন
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগ)
কলকাতা-৭০০ ০৫৬

सत्यमेव जयते

ভারতের সংবিধান

প্রস্তাবনা

আমরা, ভারতের জনগণ, ভারতকে একটি **সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র** রূপে গড়ে তুলতে সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে শপথ গ্রহণ করছি এবং তার সকল নাগরিক যাতে : সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক **ন্যায়বিচার**; চিন্তা, মতপ্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম এবং উপাসনার **স্বাধীনতা**; সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন ও সুযোগের **সমতা** প্রতিষ্ঠা করতে পারে এবং তাদের সকলের মধ্যে ব্যক্তি-সম্ভ্রম ও জাতীয় ঐক্য এবং সংহতি সুনিশ্চিত করে **সৌভ্রাতৃত্ব** গড়ে তুলতে; **আমাদের গণপরিষদে**, আজ, ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর, **এতদ্বারা এই সংবিধান গ্রহণ করছি, বিধিবদ্ধ করছি** এবং **নিজেদের অর্পণ করছি**।

THE CONSTITUTION OF INDIA

PREAMBLE

WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC and to secure to all its citizens : JUSTICE, social, economic and political; LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship; EQUALITY of status and of opportunity and to promote among them all – FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the Nation; IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this twenty-sixth day of November 1949, do HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION.

ভূমিকা

অষ্টম শ্রেণির 'পরিবেশ ও ভূগোল' পর্যায়ের পাঠ্যপুস্তকটির নাম 'আমাদের পৃথিবী'। অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় বইটিতে পরিবেশ আর মানবজীবনের পারস্পরিক সম্পর্কের নানা অভিমুখ আলোচিত হয়েছে। জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা ২০০৫ এবং শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯– নথিদুটিকে নির্ভর করে এই বৈচিত্র্যময় অভিনব পরিকল্পনা করা হয়েছে। ২০১১ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক গঠিত একটি 'বিশেষজ্ঞ কমিটি'-কে বিদ্যালয়স্তরের পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তকগুলির সমীক্ষা ও পুনর্বিবেচনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। তাঁদের ঐকান্তিক চেষ্টায়, নিরলস শ্রমে পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি অনুযায়ী অষ্টম শ্রেণির 'আমাদের পৃথিবী' বইটি তৈরি করা সম্ভব হয়েছে।

তথ্যভার যাতে শিক্ষার্থীকে উদ্বিগ্ন না করে সে বিষয়ে বইটিতে বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন ছবি, সারণি, তালিকা ব্যবহার করে ভূগোলের বিভিন্ন ধারণার সঙ্গে শিক্ষার্থীর পরিচয় ঘটানো হয়েছে। আশা করি, রঙে রূপে চিত্তাকর্ষক এই বইটি শিক্ষার্থীমহলে সমাদৃত হবে।

বিভিন্ন শিক্ষাবিদ, শিক্ষক-শিক্ষিকা, বিষয় বিশেষজ্ঞ ও অলংকরণের জন্য খ্যাতনামা শিল্পীবৃন্দ—যাঁদের নিরন্তর শ্রম ও নিরলস চেষ্টার ফলে এই গুরুত্বপূর্ণ বইটির নির্মাণ সম্ভব হয়েছে, তাঁদের সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রাথমিক ও উচ্চপ্রাথমিক স্তরের সমস্ত বিষয়ের বই ছাপিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে বিতরণ করে থাকে। এই প্রকল্প রূপায়ণে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষাদপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার এবং পশ্চিমবঙ্গ সর্বশিক্ষা মিশন নানাভাবে সহায়তা করেন এবং এঁদের ভূমিকাও অনস্বীকার্য।

'আমাদের পৃথিবী' বইটির উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য সকলকে মতামত ও পরামর্শ জানাতে আহ্বান করছি।

জুলাই, ২০১৪
৭৭/২, পার্ক স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০১৬

কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়
প্রশাসক
পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

প্রাক্‌কথন

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১১ সালে বিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি 'বিশেষজ্ঞ কমিটি' গঠন করেন। এই বিশেষজ্ঞ কমিটির ওপর দায়িত্ব ছিল বিদ্যালয় স্তরের সমস্ত পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তক- এর পর্যালোচনা, পুনর্বিবেচনা এবং পুনর্বিন্যাসের প্রক্রিয়া পরিচালনা করা। সেই কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী নতুন পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তক নির্মিত হলো। পুরো প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রেই জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা ২০০৫ এবং শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯ (RTE Act, 2009) নথিদুটিকে আমরা অনুসরণ করেছি। পাশাপাশি সমগ্র পরিকল্পনার ভিত্তি হিসেবে আমরা গ্রহণ করেছি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষাদর্শের রূপরেখাকে।

উচ্চ-প্রাথমিক স্তরে 'পরিবেশ ও ভূগোল' পর্যায়ভুক্ত বইগুলির মধ্যে অষ্টম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক 'আমাদের পৃথিবী' প্রকাশিত হলো। এই পাঠ্যপুস্তকে 'ভূগোল' বিষয়টিকে মানবজীবন আর তার পরিবেশের নিরিখে পরিবেশন করা হয়েছে। শিক্ষার্থীর চেনা গণ্ডি অর্থাৎ তার বাড়ি, স্কুল, চারপাশের জগৎ থেকে ক্রমে ব্যাপ্ততর ভৌগোলিক ধারণার মধ্যে ধাপে ধাপে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। নানা ধরনের হাতে-কলমে কর্মচর্চার মাধ্যমে যাতে শিক্ষার্থীর কাছে ভূগোলের বিভিন্ন মৌলিক বিষয়গুলি স্পষ্ট হয়ে ওঠে, সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। নানান সরল মানচিত্র, বৈচিত্র্যে ভরা ছবি, ধারণা গঠনের লেখচিত্র, তথ্যমৌচাক প্রভৃতি অভিনব শিখন সম্ভারে বইটি আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে সামগ্রিক নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়নের (CCE) নানা ক্ষেত্র বইটিতে বিদ্যমান। সেসব সমীক্ষা আর সক্রিয়তা উত্তেজনা আর আনন্দে ভরপুর। আশা করি, ভূগোলের ধারণাগুলি শিক্ষার্থীর কাছে এইভাবে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা নির্ভর হবে। তাদের ব্যাখা করার ক্ষমতাও বৃদ্ধি পাবে। বইয়ের শেষে 'শিখন পরামর্শ' অংশে বইটির ব্যবহার বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি প্রস্তাবও মুদ্রিত হলো।

নির্বাচিত শিক্ষাবিদ, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং বিষয়-বিশেষজ্ঞবৃন্দ অল্প সময়ের মধ্যে বইটি প্রস্তুত করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক শিক্ষার সারস্বত নিয়ামক পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পাঠ্যপুস্তকটিকে অনুমোদন করে আমাদের বাধিত করেছেন। বিভিন্ন সময়ে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সর্বশিক্ষা মিশন, পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার প্রভৃত সহায়তা প্রদান করেছেন। তাঁদের ধন্যবাদ।

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ড. পার্থ চ্যাটার্জী প্রয়োজনীয় মতামত এবং পরামর্শ দিয়ে আমাদের বাধিত করেছেন। তাঁকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই।

বইটির উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য শিক্ষাপ্রেমী মানুষের মতামত, পরামর্শ আমরা সাদরে গ্রহণ করব।

অভীক মজুমদার

জুলাই, ২০১৪
নিবেদিতা ভবন, পঞ্চমতল
বিধাননগর, কলকাতা : ৭০০ ০৯১

চেয়ারম্যান
'বিশেষজ্ঞ কমিটি'
বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বিশেষজ্ঞ কমিটি পরিচালিত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন পর্ষদ

পুস্তক নির্মাণ ও বিন্যাস

অভীক মজুমদার (চেয়ারম্যান, বিশেষজ্ঞ কমিটি)

রথীন্দ্রনাথ দে (সদস্যসচিব, বিশেষজ্ঞ কমিটি)

অপর্ণা বেরা রায়চৌধুরী

অনিন্দিতা দে

শান্তনু প্রসাদ মণ্ডল

রুবি সরকার

বিশ্বজিৎ রায়চৌধুরী

শক্তি মণ্ডল

শুভনীল গুহ

পরামর্শ ও সহায়তা

সুস্মিতা গুপ্ত

পুস্তক সজ্জা

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ: সুব্রত মাজী

মুদ্রণ সহায়তা: বিপ্লব মণ্ডল

সূচিপত্র

১।পৃথিবীর অন্দরমহল (১)

২। অস্থিত পৃথিবী (৭)

৩। শিলা(১৯)

৪। চাপবলয় ও বায়ুপ্রবাহ (৩০)

৫। মেঘ-বৃষ্টি (৪৩)

৬। জলবায়ু অঞ্চল (৫০)

৭। মানুষের কার্যাবলি ও পরিবেশের অবনমন(৬৫)

৮। ভারতের প্রতিবেশী দেশসমূহ ও তাদের সঙ্গে সম্পর্ক (৭৩)

৯। উত্তর আমেরিকা (৭৮)

১০। দক্ষিণ আমেরিকা (৯৪)

১১। ওশিয়ানিয়া (১০৭)

পৃথিবীর অন্দরমহল

'আগামী ৪৮ ঘণ্টা গোটা রাজ্যে শৈত্যপ্রবাহ চলবে' — সকালের কাগজে খবরটা পড়ে মেহতাবের শীত শীত ভাবটা যেন আর একটু বেড়ে গেল। হাড় কাঁপানো ঠান্ডা হাওয়ায় সারা দেশ জবুথবু। পুরো উত্তর গোলার্ধ এখন শীতঋতুর কবলে। সৌরভদের বাড়ির ছাদে দুপুরবেলা রোদ পোহাতে পোহাতে দাদুর কাছে গল্প শুনতে দারুণ লাগে। রোববার, দাদু শোনাচ্ছিলেন জুল ভার্নের একটা বিখ্যাত কল্প বিজ্ঞানের গল্প। উনিশ বছরের এক ছেলে তার অধ্যাপক কাকার সাথে নিভে যাওয়া আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখের ভেতর দিয়ে পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে অভিযান করে। তাদের যাওয়া-আসার পথের রোমহর্ষক কাহিনি দাদু এমনভাবে বর্ণনা করছিলেন যে রীতিমতো গায়ে কাঁটা দিচ্ছিল।

ভূ-পৃষ্ঠের নীচে কী আছে জানতে, পরদিন ওরা দুজনে মিলে বাড়ির পিছনের বাগানে গর্ত খোঁড়া শুরু করল। বিকেলে যখন খোঁড়াখুঁড়ি শেষ করল তখন ওরা প্রায় ২ মিটার গভীরে দাঁড়িয়ে। স্কুলে এসে ওরা ঘটনাটা সবাইকে বলল। সব শুনে ওদের মাথায় অনেকগুলো প্রশ্ন এল—

- পৃথিবীর যে শক্ত পিঠটার ওপর আমরা আছি তার নীচে কী আছে?
- কেউ কি কখনো দেখেছ পৃথিবীর ভেতরটা কেমন?
- পৃথিবীর কেন্দ্র পর্যন্ত দেখতে গেলে কত গভীর গর্ত খুঁড়তে হবে?
- পৃথিবীর ভেতরটা কেমন তা কতটা জানা সম্ভব হয়েছে?
- পৃথিবীর ভেতরটা সম্পর্কে মানুষ যতটা জেনেছে, সেটুকু জানল কীভাবে?

পৃথিবীর ব্যাসার্ধ ৬৩৭০ কিমি। অর্থাৎ ভূ-পৃষ্ঠ থেকে পৃথিবীর কেন্দ্রের দূরত্ব ৬৩৭০ কিমি।

ভেবে দেখো — পৃথিবীর ভেতরটা দেখার জন্য ৬৩৭০ কিমি গর্ত খোঁড়া সম্ভব কি?

দক্ষিণ আফ্রিকায় পৃথিবীর গভীরতম খনির (সোনা) গভীরতা ৩-৪ কিমি (রবিনসন ডীপ)।

জানা গেছে প্রতি ৩৩মি গভীরতায় প্রায় ১° সে. করে পৃথিবীর অভ্যন্তরে তাপমাত্রা বাড়ে। পৃথিবী পৃষ্ঠের গড় তাপমাত্রা যদি ১৫° সে. হয় তাহলে অঙ্কের হিসেবে রবিনসন ডীপের সোনার খনির শ্রমিকদের কত গরম সহ্য করতে হয়?

পৃথিবীর গভীরে কী আছে জানার জন্য খনি ছাড়াও উত্তর-পশ্চিম রাশিয়ার কোলা উপদ্বীপের ১২ কিমি গভীর গর্তটি হলো পৃথিবীর গভীরতম কৃত্রিম গর্ত।

পৃথিবীর গভীরতার (৬৩৭০ কিমি) কাছে ১২ কিমি খুবই নগণ্য।

তাহলে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ — পৃথিবীর অন্দরমহল সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে যাওয়াটা কতটা কঠিন!

পৃথিবীর রহস্য

পৃথিবী কিন্তু মাঝে মধ্যেই বুঝিয়ে দেয় তার ভিতরে কী আছে।

● আগ্নেয়গিরির মুখ থেকে গলিত অর্ধতরল উত্তপ্ত লাভা বের হয়।

● কখনো কখনো প্রবল ভূমিকম্পে ভূ-পৃষ্ঠ কেঁপে ওঠে।

● উষ্ণ প্রস্রবণে ভূ-গর্ভ থেকে ফুটন্ত জল বের হয়।

পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতে ঘটে যাওয়া এরকম ঘটনার খবর সংবাদপত্র থেকে সংগ্রহ করে কোলাজ বানাও।

পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছিল আজ থেকে প্রায় ৪৬০ কোটি বছর আগে। তখন পৃথিবী ছিল প্রচণ্ড উত্তপ্ত গ্যাসীয় পিণ্ড। সময়ের সাথে সাথে উপরিপৃষ্ঠটা আগে ঠান্ডা হয়ে শক্ত হয়ে গেছে। কিন্তু পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগ এখনও বিরাট বড়ো অগ্নিকুণ্ড হয়ে আছে।

বাটিতে গরম দুধ ঢাললে ওপরটা ঠান্ডা হয়ে সর পড়ে। কিন্তু নীচটা অনেকক্ষণ গরম থাকে।

ম্যাগমা কী?
—ভূ-গর্ভের পদার্থ প্রচণ্ড চাপ ও তাপে গ্যাস, বাষ্প মিশ্রিত হয়ে গলিত অবস্থায় থাকলে তাকে ম্যাগমা বলে।

লাভা কী? —ভূ-গর্ভের গলিত উত্তপ্ত অর্ধতরল ম্যাগমা ফাটল দিয়ে ভূ-পৃষ্ঠের বাইরে বেরিয়ে এলে তাকে লাভা বলে।

➢ তাপ বাড়লে পদার্থ গলে তরলে পরিণত হয় ও আয়তনে বাড়ে। আবার চাপ বাড়লে পদার্থের আয়তন কমে। পৃথিবীর অভ্যন্তরে চাপ ও তাপ দুটোই খুব বেশি। তাহলে সেখানে পদার্থ কী অবস্থায় আছে?

বলোতো!

- কেন আমরা পৃথিবীর কেন্দ্র পর্যন্ত যেতে পারি না?
- কেন আমরা পৃথিবীর অভ্যন্তর সম্পর্কে সরাসরি কোনো তথ্য পাই না?

বিশ্বদীপ বক্রেশ্বরে বেড়াতে গিয়ে উষ্ণ প্রস্রবণ (hot spring) দেখেছিল। মাটির নীচ থেকে আপনা-আপনি গরম ফুটন্ত জল বেরিয়ে আসছে অনবরত। ও মাকে জিজ্ঞেস করতে জানল পৃথিবীর ভৌমজল (পৃথিবীর ভেতরকার জল) ভূ-তাপের (পৃথিবীর ভেতরকার তাপ) সংস্পর্শে এসে গরম হয়ে ফুটতে শুরু করে। পৃথিবীপৃষ্ঠের ফাটলের মধ্যে দিয়ে সেই জল বাইরে বেরিয়ে আসে।

ভূ-তাপ কী?—ভূ-তাপ হলো একধরনের শক্তি। পৃথিবীর কেন্দ্রের তাপ ধীরে ধীরে বাইরের দিকে অর্থাৎ পৃথিবীপৃষ্ঠের দিকে আসতে থাকে। এই তাপশক্তিকে ভূ-তাপ শক্তি বলে। পৃথিবীর বহু দেশে এই তাপ-শক্তি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। আইসল্যান্ড তাদের দেশের বিদ্যুতের চাহিদার প্রায় ৩০% ভূ-তাপ শক্তি দ্বারা মেটায়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভূ-তাপ শক্তি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে। ভূ-তাপ শক্তি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করলে জীবাশ্ম জ্বালানির (কয়লা, খনিজতেল) ব্যবহার কমানো যায়। ভারতের কোথায় কোথায় ভূ-তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র আছে জানার চেষ্টা করো।

পৃথিবীর ঘনত্ব

ভূ-পৃষ্ঠের গড় ঘনত্ব মাত্র ২.৬ থেকে ৩.৩ গ্রাম/ঘন সেমি। পৃথিবীর কেন্দ্রের কাছে পদার্থের গড় ঘনত্ব প্রায় ১১ গ্রাম/ঘন সেমি। সেটা বেড়ে পৃথিবীর একেবারে কেন্দ্রে প্রায় ১৩-১৪ গ্রাম/ঘন সেমি হয়। কিন্তু কৃত্রিম উপগ্রহের বিচারে সামগ্রিক ভাবে পৃথিবীর গড় ঘনত্ব ৫.৫ গ্রাম/ঘন সেমি।

এখন প্রশ্ন হলো — পৃথিবীর কেন্দ্রের কাছে থাকা পদার্থগুলোর ঘনত্ব বেশি হয় কেন?

ভারী জিনিস নীচে থিতিয়ে পড়ে। হালকা জিনিস ওপরে ভেসে ওঠে।

পৃথিবীর জন্মের সময় খুব গরম ও বেশি ঘন পদার্থ মাধ্যাকর্ষণের টানে কেন্দ্রের দিকে চলে যায়। বিশেষত লোহা আর নিকেল পৃথিবীর কেন্দ্রের চারিদিকে আবর্তন করতে থাকে। অপেক্ষাকৃত হালকা অ্যালুমিনিয়াম ও সিলিকা ওপরের দিকে ভেসে ওঠে।

নিজে পরীক্ষা করে দেখো —

➤কিছুটা নুড়ি, পাথর, মাটি নাও। কাঁচের গ্লাসে অর্ধেক জল ভর্তি করো। ওগুলো গ্লাসে ঢেলে নাড়িয়ে দিয়ে দেখো কী হয়।

ভূমিকম্প তরঙ্গ

ভূমিকম্পের তরঙ্গের গতিবিধি লক্ষ করেও বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর অভ্যন্তর সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। তরঙ্গগুলো বিভিন্ন ধরনের পদার্থের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার সময় কখনো দীর্ঘ, কখনো ক্ষুদ্র আবার কখনো দ্রুত বা ধীর গতিসম্পন্ন হয়। কম্পন তরঙ্গগুলো (P ও S) ভূ-অভ্যন্তর দিয়ে কোথায় কী গতিতে যাচ্ছে, কীভাবে অভিমুখ পাল্টাচ্ছে— এসব কিছুই পৃথিবীর অভ্যন্তর সম্পর্কে তথ্য দেয়। ভূমিকম্পের P তরঙ্গ ভূ-অভ্যন্তরের কঠিন তরল যেকোনো মাধ্যমের মধ্যে দিয়েই প্রবাহিত হতে পারে। কিন্তু S তরঙ্গ তরল বা অর্ধতরল মাধ্যমের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হতে পারে না।

ঘনত্ব (Density) কী?

একক আয়তনে পদার্থের কতটুকু ভর আছে তার পরিমাপকে পদার্থের ঘনত্ব বলে। প্রতি ঘন সেমি জায়গায় পদার্থের ভর কতটা সেটাই পদার্থের ঘনত্ব। পদার্থের অণু পরমাণুগুলি কত কাছাকাছি — বা কত দূরে দূরে আছে তার ধারণা হতে পারে ঘনত্ব জানা থাকলে। একই মাপের একটা লোহার পাত ও একটা অ্যালুমিনিয়ামের পাত হাতে নিয়ে দেখলে কোনটা ভারী লাগবে? আর কেনই বা লাগবে নিজেই বুঝে নাও।

স্বাভাবিক নিয়মে পৃথিবীর অভ্যন্তরে যত যাওয়া যায় তত পদার্থের চাপ বাড়ে। চাপ বাড়লে পদার্থের ঘনত্ব যেমন বেড়ে যায় তেমন বেশি ঘন পদার্থ চাপ দেয় বেশি। পৃথিবীর অভ্যন্তরে ক্রমশ তাপ ও চাপ বাড়ার ফলে ভিতরের পদার্থগুলো কোথাও কঠিন, কোথাও তরল আবার কোথাও অর্ধতরল অবস্থায় আছে।

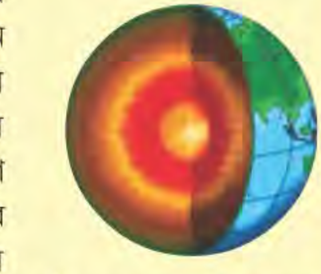

পেঁয়াজের খোসা ছাড়ালে যেরকম স্তর বিন্যাস দেখা যায়, পৃথিবীর অন্দরমহলটা অনেকটা সেরকম বিভিন্ন ঘনত্বের ও বৈশিষ্ট্যের স্তরে বিভক্ত।

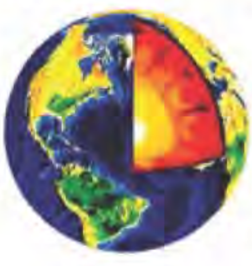

বর্তমানে পৃথিবীর অভ্যন্তর সম্পর্কে জানতে ভূমিকম্প তরঙ্গের গতিবিধি খুব সাহায্য করেছে। ভূমিকম্প তরঙ্গ ও আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ থেকে বেরোনো লাভা পর্যবেক্ষণ করে বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর অভ্যন্তরে প্রধানত তিনটি স্তরের সন্ধান পেয়েছেন। একেবারে ওপরে আছে ভূ-ত্বক (Crust)। ভূ-ত্বকের নীচে আছে গুরুমণ্ডল (Mantle)। আর একেবারে নীচে বা পৃথিবীর কেন্দ্রের চারদিকে অবস্থান করছে কেন্দ্রমণ্ডল (Core)।

'Journey to the Centre of the Earth' —পৃথিবী বিখ্যাত কল্প- বিজ্ঞানের গল্প, জুল ভার্নের লেখা। গল্পটি পড়ে বন্ধুদের সাথে আলোচনা করো, খুব মজা পাবে।

কাটা আপেলের খোসার সঙ্গে পৃথিবীর সবচেয়ে ওপরের স্তর ভূত্বকের তুলনা করা যায়।

- ভেবে দেখ আপেলের খোসা গোটা আপেলের তুলনায় কত পাতলা!

মহাসাগরের নীচে ভূত্বক গড়ে ৫ কিমি ও মহাদেশের নীচে গড়ে ৬০ কিমি গভীর। এর গড় গভীরতা প্রায় ৩০ কিমি। মহাসাগরের নীচে প্রধানত সিলিকন (Si) আর ম্যাগনেশিয়াম (Mg) দিয়ে তৈরি স্তরটি হলো সিমা (SIMA)। এই স্তর তুলনায় ভারী । প্রধানত ব্যাসল্ট জাতীয় আগ্নেয়শিলা এই স্তর গঠন করেছে। এর ঘনত্ব ২.৯ গ্রাম / ঘনসেমি। মহাদেশের নীচে প্রধানত সিলিকন (Si) আর অ্যালুমিনিয়াম (Al) দিয়ে তৈরি ভূত্বকের ওপরের স্তরটি হলো সিয়াল (SIAL)। গ্রানাইট জাতীয় আগ্নেয় শিলা এই স্তর গঠন করেছে। এই স্তর সিমার চেয়ে হালকা এবং একটানা নয়। সমুদ্রের নীচে এই স্তর অনুপস্থিত। সিমা বা মহাসাগরীয় ভূত্বকের ওপরে সিয়াল অবস্থান করছে।

সিয়াল

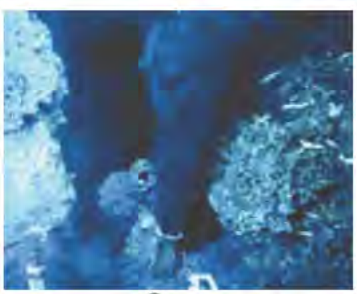

সিমা

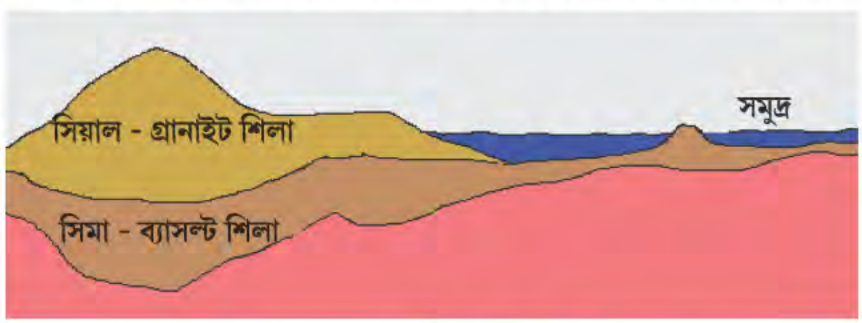

জানো কী !

ভূ-পৃষ্ঠ থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত যেখানে যেখানে ভূমিকম্পের তরঙ্গের গতিবেগ পরিবর্তিত হয় সেখানটাকে ভূ-তত্ত্ববিদরা বলেন বিযুক্তিরেখা (Discontinuity)। বিযুক্তিরেখা দ্বারা দুটি ভিন্ন উপাদান ও ঘনত্বের স্তরকে আলাদা করা যায়। সিয়াল ও সিমা স্তরের মাঝে আছে কনরাড বিযুক্তিরেখা (Conrad Discontinuity)।

পৃথিবীর সবচেয়ে বাইরের এই স্তর অত্যন্ত পাতলা। ভূত্বকের শিলা নানা খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ। ভূত্বকের একেবারে ওপরে আছে মাটি।

ভূত্বকের বেশিরভাগ অংশ (৪৭ শতাংশ) জুড়ে আছে অক্সিজেন। বায়ুমণ্ডলের চেয়ে অনেক বেশি অক্সিজেন পৃথিবীর ভূ-ত্বকের সঙ্গে নানা রাসায়নিক অবস্থায় মিশে আছে। ভূত্বকের দ্বিতীয় প্রধান উপাদান হলো সিলিকন।

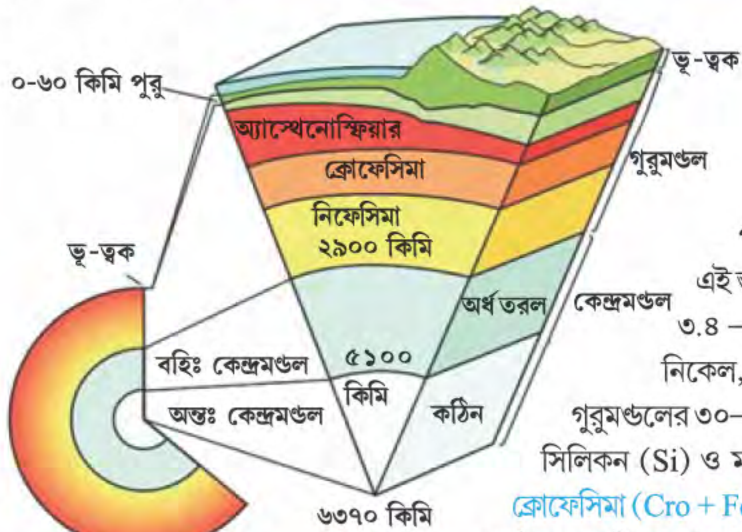

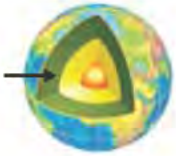

ভূ-ত্বক ছাড়িয়ে পৃথিবীর অভ্যন্তরে প্রায় ২৯০০ কিমি পর্যন্ত একই ঘনত্বযুক্ত স্তর হলো গুরুমণ্ডল (Mantle)। এই স্তরের উষ্ণতা ২০০০° সে — ৩০০০° সে। পদার্থের ঘনত্ব ৩.৪ — ৫.৬ গ্রাম/ ঘনসেমি। এই স্তরের প্রধান উপাদান লোহা, নিকেল, ক্রোমিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম ও সিলিকন।

গুরুমণ্ডলের ৩০—৭০০ কিমি পর্যন্ত অংশে ক্রোমিয়াম (Cr), লোহা (Fe), সিলিকন (Si) ও ম্যাগনেশিয়ামের (Mg) প্রাধান্য দেখা যায়। এটি হলো ক্রোফেসিমা (Cro + Fe+ Si+Ma) স্তর। আর গুরুমণ্ডলের ৭০০- ২৯০০ কিমি পর্যন্ত অংশে নিকেল (Ni), লোহা (Fe) সিলিকন (Si), ও ম্যাগনেশিয়ামের(Mg) আধিক্যের জন্য এই স্তর হলো নিফেসিমা (Ni + Fe+ Si +Ma)।

➤ আপেলের কোন অংশ গুরুমণ্ডলের সঙ্গে তুলনীয়?

ভূত্বক ও গুরুমণ্ডলের মাঝে আছে মোহোরোভিসিক বিযুক্তিরেখা (Mohrovicic Discontinuity) বা মোহো। ক্রোফেসিমা ও নিফেসিমার মাঝে আছে রেপিত্তি বিযুক্তিরেখা। (Repetti Discontinuity)।

অ্যাস্থেনোস্ফিয়ার

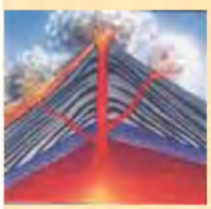

শিলামণ্ডলের নিচে গুরুমণ্ডলের ওপরের অংশে বিশেষ স্তরটি হলো অ্যাস্থেনোস্ফিয়ার (Asthenosphere)। Asthenosphere একটি গ্রিক শব্দ, যার মানে দুর্বল স্তর। এই স্তরে পদার্থ গলিত ও নরম প্রকৃতির। অত্যধিক তাপ ও চাপে এখানকার শিলা সান্দ্র (অর্ধ তরল অর্ধ কঠিন) অবস্থায় আছে। পিচ গলালে বা খেজুরের রস জাল দিয়ে গুড় তৈরি করলে যে অবস্থায় থাকে সেইরকম অবস্থায় এখানকার পদার্থগুলি আছে। ভূগর্ভের তাপে পদার্থগুলি উত্তপ্ত হয়ে ওপরের দিকে উঠে এসে অনুভূমিকভাবে প্রবাহিত হয়। আবার ওপরের অপেক্ষাকৃত ঠান্ডা, ভারী পদার্থ নীচের দিকে নেমে যায়। এই ভাবে পরিচলন স্রোতের সৃষ্টি হয়।

ভূত্বক ও গুরুমণ্ডলের উপরিঅংশ নিয়ে গঠিত হয়েছে শিলামণ্ডল। এর গভীরতা প্রায় ১০০ কিমি।

ভূকম্প তরঙ্গ এই স্তরের মধ্যে দিয়ে অপেক্ষাকৃত ধীর গতিতে প্রবাহিত হয়। সমুদ্রের নীচে এই স্তর কাছাকাছি অবস্থান করে। পরিচলন স্রোত ভূগর্ভের তাপকে ওপরের দিকে বয়ে নিয়ে আসে।

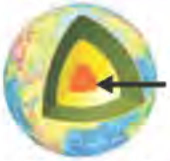

কেন্দ্রমণ্ডল

ভূত্বক ও গুরুমণ্ডলের পরবর্তী এবং কেন্দ্রের চারদিকে বেষ্টনকারী শেষ স্তরটি হলো কেন্দ্রমণ্ডল (Core)। এই স্তরটি প্রায় ৩৫০০ কিমি পুরু। অত্যন্ত ভারী নিকেল (Ni) আর লোহা (Fe) দিয়ে তৈরি বলে একে (Nife) 'নিফে' বলে। এর গড় তাপমাত্রা প্রায় ৫০০০° সে। এই স্তরের গড় ঘনত্ব প্রায় ৯.১ থেকে ১৩.১ গ্রাম/ঘনসেমি। পদার্থের ঘনত্ব, উষ্ণতা, চাপ কেন্দ্রমণ্ডলের সবজায়গায় একরকম নয়। এগুলোর ওপর ভিত্তি করে বিজ্ঞানীরা কেন্দ্রমণ্ডলকে দুটি অংশে বিভক্ত করেছেন —

➢ আপেলের কোন অংশটা কেন্দ্রমণ্ডলের মতো বলো তো?

(১) **অন্তঃকেন্দ্রমণ্ডল** — এই স্তর পৃথিবীর একেবারে কেন্দ্রের চারদিকে রয়েছে। এই স্তরের গভীরতা ৫১০০ কিমি থেকে প্রায় ৬৩৭০ কিমি। এই স্তরের চাপ, তাপ, ঘনত্ব সবচেয়ে বেশি। অত্যধিক চাপের ফলে পদার্থগুলো এখানে কঠিন অবস্থায় আছে।

(২) **বহিঃকেন্দ্রমণ্ডল** —অন্তঃকেন্দ্রমণ্ডলের চারদিকে রয়েছে বহিঃকেন্দ্রমণ্ডল। এই স্তর ২৯০০ কিমি —৫১০০ কিমি পুরু। এর চাপ, তাপ ও ঘনত্ব অন্তঃকেন্দ্রমণ্ডলের তুলনায় কম। এই স্তর অর্ধকঠিন অবস্থায় পৃথিবীর অক্ষের চারদিকে আবর্তন করে চলেছে। সান্দ্র অবস্থায় থাকা এই লোহা প্রচণ্ড গতিতে ঘুরতে ঘুরতে বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র তৈরি করেছে, যেখান থেকেই সৃষ্টি হয়েছে পৃথিবীর চৌম্বকত্ব।

গুরুমণ্ডল ও কেন্দ্রমণ্ডলের মাঝে আছে গুটেনবার্গ বিযুক্তিরেখা (Gutenberg Discontinuity)।

কেন্দ্রমণ্ডলের ভিতরের স্তর অন্তঃকেন্দ্রমণ্ডল ও বাইরের স্তর বহিঃকেন্দ্রমণ্ডলের মধ্যে রয়েছে লেহম্যান বিযুক্তিরেখা (Lehman Discontinuity)।

পৃথিবীর অভ্যন্তর সম্বন্ধে জানতে যা মনে রাখা দরকার —

- ➢ পৃথিবীর অভ্যন্তর একাধিক পৃথক স্তরে বিভক্ত।
- ➢ অপেক্ষাকৃত ভারী পদার্থ নীচের দিকে অর্থাৎ পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে থিতিয়ে পড়ে।
- ➢ তুলনায় হালকা পদার্থ বা উপাদান ভূ-পৃষ্ঠের কাছাকাছি উঠে আসে।
- ➢ ভূ-ত্বক বা শিলামণ্ডল সম্বন্ধে যতটা জানা গেছে সে তুলনায় গুরুমণ্ডল ও কেন্দ্রমণ্ডল সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায়নি।
- ➢ ভূকম্প তরঙ্গের গতিবিধি সম্পর্কিত গবেষণা থেকে পৃথিবীর অভ্যন্তর সম্পর্কে সঠিক ধারণা পাওয়া যায়।

উত্তরগুলো খুঁজে ফেলো —

- গুরুমণ্ডল ও কেন্দ্রমণ্ডল প্রায় একইরকম পুরু। কিন্তু পৃথিবীর মোট আয়তনের প্রায় ৮৪ শতাংশ দখল করে আছে গুরুমণ্ডল। এটা কীভাবে বা কেন হয় বলতে পারো?
- পৃথিবীর অভ্যন্তরের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে ঘনত্বের পার্থক্য লক্ষ করা যায় কেন?
- সহজ পরীক্ষার মাধ্যমে তুমি অ্যাস্থেনোস্ফিয়ারের পরিচলন স্রোত বুঝিয়ে দাও।
- ম্যাগমা ও লাভার মধ্যে তফাত কী?

➢ পৃথিবীর অভ্যন্তরের চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন করো।

➢ থার্মোকলের সাহায্যে পৃথিবীর অন্দরমহলের মডেল তৈরি করো।

- পৃথিবীর বাইরের আর পৃথিবীর ভিতরের সম্পর্কে তুমি জানো — তোমার কোনটা বেশি পছন্দের এবং কেন?

অস্থিত পৃথিবী

অগ্নুৎপাত

সুনামি

ভূমিকম্প

ভূমিধস

পৃথিবীকে আপাতভাবে শান্ত, স্থির বলে মনে হয়।

কিন্তু ওপরের ঘটনাগুলোকে দেখলে আমাদের ধারণা বদলে যায়। পৃথিবীর কোথাও না কোথাও প্রতিনিয়ত ভূমিকম্প, অগ্ন্যুৎপাত, ভূপৃষ্ঠের সরণ, পর্বত সৃষ্টি, ধস, হিমানী সম্প্রপাত প্রভৃতি ঘটনা ঘটে চলেছে। বিজ্ঞানীরা দীর্ঘ গবেষণা ও পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে দেখেছেন যে এর প্রধান কারণ হচ্ছে ভূপৃষ্ঠের চলন বা সরণ। আমাদের পায়ের তলার ভূপৃষ্ঠটা প্রতিনিয়ত সরছে আর আমরা বুঝতেই পারছি না! বিষয়টা একটু বিস্তারিত বুঝে নেওয়া যাক।

আলফ্রেড ওয়েগনারের 'মহীসঞ্চরণ তত্ত্ব' (Continental Drift Theory) থেকে জানা যায় — প্রায় ৩০ কোটি বছর আগে পৃথিবীর সমস্ত স্থলভাগ একটা বিশাল ভূখণ্ডরূপে (প্যানজিয়া) অবস্থান করত। পরবর্তীকালে 'প্যানজিয়া' ভেঙে গিয়ে বিভিন্ন দিকে সঞ্চারিত হয়। অর্থাৎ মহাদেশীয় ভূত্বক (SIAL) বিচ্ছিন্নভাবে মহাসাগরীয় ভূত্বকের (SIMA) ওপর বিভিন্ন দিকে সঞ্চারিত হয়। কিন্তু 'মহীসঞ্চরণ তত্ত্ব' থেকে মহাদেশ মহাসাগর সৃষ্টি, পর্বত গঠন, ভূমিকম্প, অগ্ন্যুদগমের মতো ঘটনার সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা পাওয়া যায় নি। এই ধারণার উপর ভিত্তি করেই ১৯৬০-এর দশকে পাত সংস্থান তত্ত্ব (Plate Tectonic Theory) -এর মাধ্যমে ভূবিদ্যায় এক যুগান্তকারী আবিষ্কার ঘটে, যা প্রায় সমস্তরকম ভূপ্রাকৃতিক বিষয়ের বিজ্ঞানসম্মতভাবে স্পষ্ট ও সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা দিতে পারে। পিঁচো, উইলসন, ম্যাকেনজি, পার্কার, মর্গান প্রভৃতি ভূবিজ্ঞানীরা পাত সংস্থান সম্পর্কে গবেষণা করেন।

ভূবিজ্ঞানীদের মতে পৃথিবীর ভূত্বক কতকগুলো শক্ত (rigid) ও কঠিন (solid) খণ্ডে বিভক্ত। এগুলোকে ভূবিজ্ঞানীরা এক একটা 'পাত' বলেছেন। পাতগুলোর পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফলের তুলনায় বেধ খুবই কম। পাতগুলো গড়ে ৭০-১৫০ কিমি পুরু। ভূপৃষ্ঠ থেকে বহিঃগুরুমণ্ডলের অ্যাসথেনোস্ফিয়ার স্তর পর্যন্ত পাতগুলো বিস্তৃত। পিচ্ছিল অ্যাসথেনোস্ফিয়ারের ওপর পাতগুলো খুব ধীরগতিতে সঞ্চরণ করছে। অ্যাসথেনোস্ফিয়ারের পরিচলন স্রোত এর অন্যতম কারণ। পাতগুলো তাদের সীমানা বরাবর কখনো একে অপরের দিকে, কখনো বিপরীত দিকে আবার কখনো বা পাশাপাশি ঘর্ষণ করে অগ্রসর হয়। এর প্রভাবে পাত সীমানা বরাবর ভূমিকম্প, অগ্ন্যুৎপাত, ভঙ্গিল পর্বত, সমুদ্রখাত, দ্বীপমালা প্রভৃতি সৃষ্টি হয়। পৃথিবীতে মোট ছটি বড়ো পাত এবং কুড়িটি মাঝারি ও ছোটো পাত রয়েছে। ছটি বড়ো পাত হলো ইউরেশিয় পাত, ইন্দো-অস্ট্রেলিয় পাত, আমেরিকা পাত, প্রশান্ত মহাসাগরীয় পাত, আফ্রিকা পাত এবং আন্টার্কটিকা পাত।

পাতের চলন ও ভূতাত্ত্বীয় ঘটনা : আগেই বলা হয়েছে ভূ ত্বকের এই পাতগুলো সর্বদা ধীরগতিতে সঞ্চরণশীল। সাধারণভাবে দেখা যায় সমুদ্র তলদেশে পাতের সীমানা বরাবর দুটো পাতপরস্পর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। এর ফলে সমুদ্র তলদেশে যে ফাঁকের সৃষ্টি হয় তা দিয়ে ভূঅভ্যন্তরের ম্যাগমা ক্রমাগত বেরিয়ে আসে। এই ম্যাগমা পরে শীতল ও কঠিন হয়ে নতুন ভূত্বক (বা পাত) এবং সমুদ্রের

তলদেশে মধ্য-সামুদ্রিক শৈলশিরা গঠন করে। এই পরস্পর বিপরীতমুখী পাতসীমানাকে অপসারী বা গঠনকারী পাত সীমানা বলা হয়। এই অঞ্চলে ভূমিকম্প, অগ্ন্যুৎপাত স্বাভাবিক ঘটনা। আটলান্টিক মহাসাগর, ভারত মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরের তলদেশে এই ধরনের ঘটনা দেখা যায়।

অনেক সময় দুটো পাত পরস্পরের দিকে অগ্রসর হয় এবং পাতের সংঘর্ষ ঘটে। দুটো পাতের মধ্যে অপেক্ষাকৃত ভারী পাত হালকা পাতের নীচে প্রবেশ করে। এর ফলে নিমজ্জিত পাতটির গলন হয়, সমুদ্রখাত সৃষ্টি হয় ও ভূত্বকের বিনাশ ঘটে। এই অঞ্চলে প্রতিনিয়ত ভূমিকম্প ও অগ্নুৎপাতের ঘটনা দেখা যায়। দুটো পরস্পরমুখী পাত সামুদ্রিক হলে তাদের ওপরের পলি ভাঁজ খেয়ে দ্বীপ ও

দ্বীপপুঞ্জ সৃষ্টি হয়। প্রশান্ত মহাসাগরের পশ্চিম উপকূল বরাবর জাপান ও সন্নিহিত দ্বীপপুঞ্জ এভাবে গড়ে উঠেছে। পাত দুটোর একটি সামুদ্রিক ও আর একটি মহাদেশীয় হলে মাঝের পলি ভাঁজ খেয়েভঙ্গিল পর্বতশ্রেণি সৃষ্টি করে। আমেরিকার পশ্চিম ভাগের রকি ও আন্দিজ পর্বতমালা এভাবেই সৃষ্টি হয়েছে। আবার পাতদুটো মহাদেশীয় হলে সংঘর্ষের ফলে মাঝের সংকীর্ণ সমুদ্রের পলি ভাঁজ খেয়ে ভঙ্গিল পর্বতের সৃষ্টি হয়। এইভাবে ইউরেশিয় ও ভারতীয় -এই দুই মহাদেশীয় পাতের মাঝের টেথিস সাগরের পলি ভাঁজ খেয়ে হিমালয় পর্বতের সৃষ্টি করেছে। এই ধরনের পরস্পরমুখী পাত সীমানাকে অভিসারী বা বিনাশকারী পাত সীমানা বলা হয়।

মহাদেশ—মহাসাগর সংঘর্ষ

মহাদেশ — মহাদেশ সংঘর্ষ

১—২.৫ কোটি বছর আগে যে ভঙ্গিল পর্বতগুলোর সৃষ্টি হয়েছে তারা হলো নবীন ভঙ্গিল পর্বত। যেমন রকি, আন্দিজ, আল্পস্, হিমালয়। ২০ কোটি বছরেরও আগে সৃষ্টি হওয়া ভঙ্গিল পর্বতগুলো হলো প্রাচীন ভঙ্গিল পর্বত। যেমন— উরাল, অ্যাপেলেশিয়ান, আরাবল্লী প্রভৃতি।

কিছু ক্ষেত্রে দুটো পাত পরস্পর ঘর্ষণ করে পাশাপাশি অগ্রসর হয়। ফলে ভূমিকম্প, চ্যুতি প্রভৃতি সৃষ্টি হয়। এই সীমান্তে পাতের ধ্বংস বা সৃষ্টি কিছুই হয় না। একে নিরপেক্ষ সীমানা বলা হয়। ক্যালিফোর্নিয়ার উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত সান আন্দ্রিজ চ্যুতি এরকম সীমানার উদাহরণ। এই চ্যুতি বরাবর প্রশান্ত মহাসাগরীয় পাত উত্তরে ও উত্তর আমেরিকা পাত দক্ষিণে সরছে।

সান আন্দ্রিজ চ্যুতি

পাতসঞ্চালন আমরা বুঝতে পারি না কেন?

পাতগুলো বিভিন্ন গতিতে, অনুভূমিকভাবে সঞ্চারিত হয়। এই চলন এত ধীর আর সুদীর্ঘ সময় ধরে চলে যে, আমরা তা বুঝতেই পারি না। প্রশান্ত মহাসাগরীয় পাত বছরে ১০ সেমি করে পশ্চিমে সরে যাচ্ছে। আবার আমেরিকান পাত পশ্চিমে সরছে বছরে মাত্র ২-৩ সেমি। তবে পাতের চলনের ফলে সৃষ্ট ভূমিকম্প, অগ্ন্যুৎপাত, ধ্বস প্রভৃতি আমাদের নজরে আসে।

পাত সঞ্চরণ : এক নজরে

ছবিগুলো চিহ্নিত করো আর ঠিক ঠিক লিখে ফেলো—

পাত সীমানা	অপসারী	অভিসারী	নিরপেক্ষ
পাতের চলন	পরস্পর বিপরীতমুখী	———	পাশাপাশি সঞ্চরণ
প্রভাব	————	সমুদ্রতলের বিনাশ	ভূত্বক সৃষ্টি/ধ্বংস হয় না
ভূমিরূপ	————	সমুদ্রখাত সৃষ্টি	——— ———
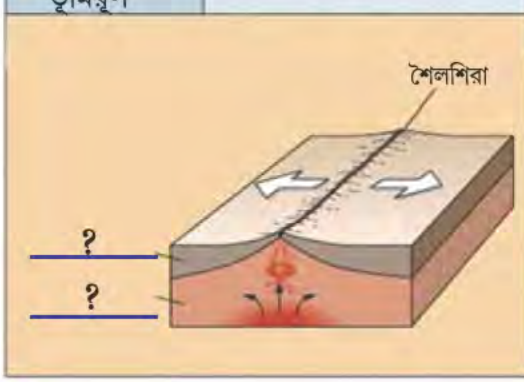			

অগ্ন্যুদ্গম (VOLCANISM)

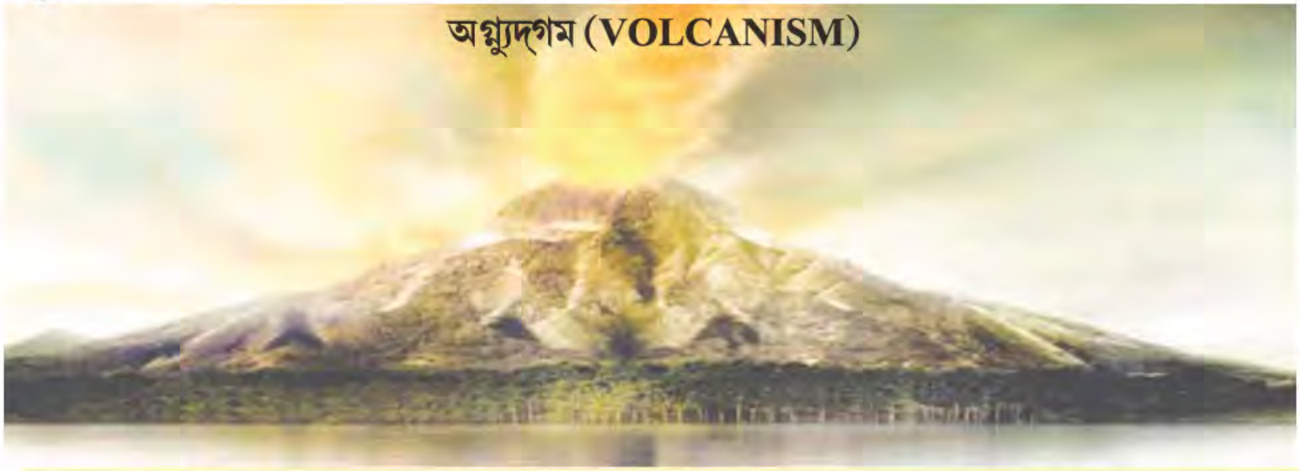

আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত অন্যতম ভয়ংকর সুন্দর দৃশ্য। এই মুহূর্তে পৃথিবীতে একাধিক জায়গায় অগ্ন্যুৎপাত হচ্ছে— উত্তপ্ত গলিত পদার্থ, গ্যাস, বাষ্প, ছাই, ভস্ম উৎক্ষিপ্ত হচ্ছে; আগুনের স্রোতের মতো লাভা ছড়িয়ে পড়ছে আশেপাশে —

ভূঅভ্যন্তরের গলিত সান্দ্র ম্যাগমা, গ্যাস, জলীয়বাষ্প কোনো ফাটল বা গহ্বরের মধ্য দিয়ে বিস্ফোরণ সহ প্রচন্ড জোরে অথবা ধীর শান্তভাবে ভূপৃষ্ঠে বেরিয়ে আসার প্রক্রিয়া হলো অগ্ন্যুদ্গম (Volcanism)। আর অগ্ন্যুৎপাতের উৎসগুলো হলো আগ্নেয়গিরি (Volcano)। অগ্ন্যুদ্গমের সময় উৎক্ষিপ্ত পদার্থ ফাটল বা গহ্বরের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এইভাবে বার বার অগ্ন্যুৎপাতের সময় আগ্নেয় পদার্থ ফাটলের চারিদিকে জমা হয়ে শঙ্কু আকৃতির পর্বতের আকার ধারণ করে। সঞ্চয়কার্যের ফলে সৃষ্টি হয় বলে একে সঞ্চয়জাত বা আগ্নেয় পর্বত (Volcanic mountain) বলা হয়। জাপানের ফুজিয়ামা, ইতালির ভিসুভিয়াস, ভারতের ব্যারেন, ইন্দোনেশিয়ার ক্রাকাতোয়া — এই জাতীয় পর্বত। সুতরাং আগ্নেয়গিরি হলো অগ্ন্যুৎপাতের উৎস ও ফলাফল।

ফুজিয়ামা

ক্রাকাতোয়া

বিশেষ কথা সৃষ্টির সময় থেকে কোটি কোটি বছর ধরে পৃথিবীতে অগ্ন্যুৎপাত হয়ে চলেছে।

- উৎক্ষিপ্ত লাভা, ছাই, আগ্নেয় পদার্থ স্তরে স্তরে জমে শীতল ও কঠিন হয়ে ভূ-ত্বকের অনেকটা অংশ গঠন করেছে।
- সৃষ্টির আদিলগ্নে আগ্নেয়গিরি নির্গত জলীয় বাষ্প থেকেই ঘনীভবনের মাধ্যমে সাগর-মহাসাগর তৈরি হয়।
- বিভিন্ন ভূতাত্ত্বিক যুগে অগ্ন্যুদ্গমের মাধ্যমেই পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রিত হয়ে বর্তমানের অনুকূল অবস্থায় পৌঁছেছে।

পাত সংস্থান তত্ত্ব অনুসারে অভিসারী পাত সীমানায় বিস্ফোরণ সহ অগ্ন্যুৎগম ঘটে। আর অপসারী ও নিরপেক্ষ পাত সীমানায় বিস্ফোরণ ছাড়া শান্তভাবে অগ্ন্যুদ্গম ঘটতে দেখা যায়। একে বিদার অগ্ন্যুদ্গম বলে। এইরকম বিদার অগ্ন্যুদ্গমের ফলে সৃষ্টি হয়েছে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে লাভা সঞ্চিত হয়ে লাভা মালভূমি (দাক্ষিণাত্য মালভূমি) বা লাভা সমভূমির সৃষ্টি হয়। অগ্ন্যুৎপাতের ফলে বেশ কিছু ভূমিরূপ সৃষ্টি হয়। তাই অগ্ন্যুৎগম একপ্রকার 'ভূগাঠনিক প্রক্রিয়া'।

সৃষ্টির সময় থেকে পৃথিবীতে একাধিক ভূগাঠনিক প্রক্রিয়া কাজ করে চলেছে। ভূ-অভ্যন্তরে হঠাৎ কোনো ভূআলোড়নের বহিঃপ্রকাশ হলো অগ্ন্যুৎপাত এবং ভূমিকম্প।

এবার জেনে নেওয়া যাক— অগ্ন্যুদ্গম কীভাবে হয়?

পৃথিবীর অভ্যন্তর অত্যন্ত উত্তপ্ত অবস্থায় রয়েছে। গুরুমণ্ডলে ২০০০° সে. এ স্বাভাবিকভাবে শিলা গলে যাওয়ার কথা। কিন্তু ওপরের স্তরের প্রবল চাপে গলনাঙ্ক বেড়ে যায়। ফলে শিলা আংশিক গলে, পিচ্ছিল হয়ে প্লাস্টিকের মতো প্রবাহিত হয়।

বহিঃগুরুমণ্ডলের কোনো কোনো অংশে শিলা সম্পূর্ণ গলে যায়। এই গলিত ম্যাগমার ঘনত্ব কম হয় এবং আশপাশের অর্ধগলিত শিলার তুলনায় হালকা বলে ওপরের দিকে উঠতে শুরু করে। ম্যাগমা যত ওপরে ওঠে, চাপ এবং গলনাঙ্ক দুটোই তত কমে যায়। তরল ম্যাগমার জলীয় অংশ গ্যাস ও জলীয় বাষ্পে রূপান্তরিত হয়। এই বাষ্প, গ্যাস মিশ্রিত ম্যাগমা প্রবল চাপে ভূপৃষ্ঠের কোনো দুর্বল ফাটল দিয়ে উৎক্ষিপ্ত হয়। ভূ-অভ্যন্তরের গলিত, সান্দ্র পদার্থকে 'ম্যাগমা' (Magma) আর ম্যাগমা ভূ-পৃষ্ঠের বাইরে নির্গত হলে তাকে 'লাভা'(Lava) বলা হয়।

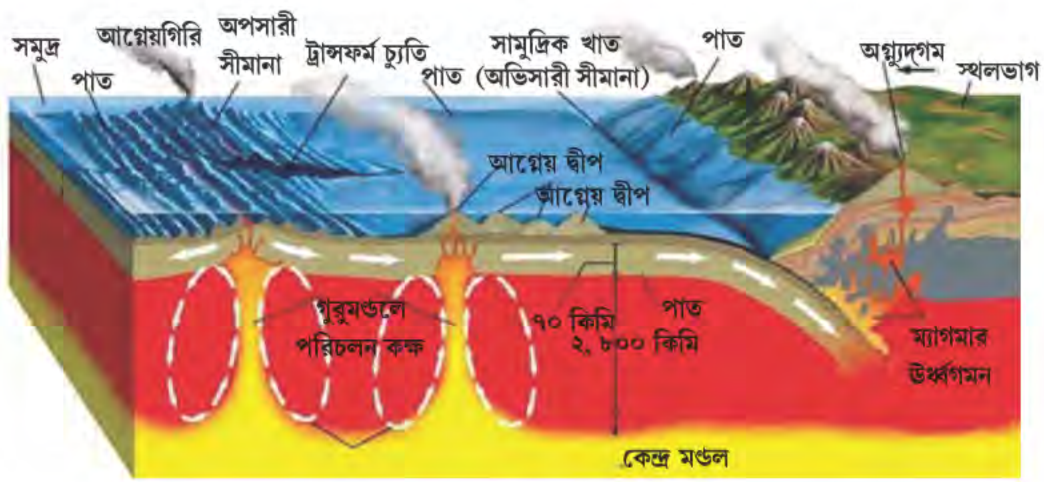

আগ্নেয়গিরির শ্রেনিবিভাগ

সক্রিয়তার ভিত্তিতে আগ্নেয়গিরি তিনধরনের হয়—

- সিসিলি দ্বীপের এটনা, লিপারি দ্বীপের স্ট্রম্বোলী, হাওয়াই দ্বীপের মৌনালোয়া, কিলাওয়া, ভারতের ব্যারেন— এই ধরনের আগ্নেয়গিরিগুলো সৃষ্টি হওয়ার পর থেকে অবিরামভাবে অথবা প্রায়শই অগ্ন্যুৎপাত ঘটিয়ে চলেছে— এরা হলো সক্রিয় আগ্নেয়গিরি ।

মৌনালোয়া

- জাপানের ফুজিয়ামা, ইন্দোনেশিয়ার ক্রাকাতোয়া — এই ধরনের আগ্নেয়গিরি একবার অগ্ন্যুৎপাতের পর দীর্ঘকাল নিষ্ক্রিয় থাকে। এরা সুপ্ত আগ্নেয়গিরি। এই ধরনের আগ্নেয়গিরিগুলো অত্যন্ত বিপজ্জনক। ক্রাকাতোয়া আগ্নেয়গিরি দুশো বছর পর হঠাৎ সক্রিয় হয়ে ইন্দোনেশিয়ার তিনটে শহর ধ্বংস করে দেয়।

- মেক্সিকোর পারকুটিন, মায়ানমারের পোপো এই ধরনের আগ্নেয়গিরিগুলো অতি প্রাচীনকালে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। কিন্তু ভবিষ্যতে অগ্ন্যুৎপাতের সম্ভাবনা প্রায় নেই। এগুলো মৃত আগ্নেয়গিরি।

পারকুটিন

ভারতের ব্যারেন আগ্নেয়গিরিতে ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দের পর ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে আবার অগ্ন্যুৎপাত ঘটতে দেখা যায়।

➢ পৃথিবীর মানচিত্রে আগ্নেয়গিরিগলোর অবস্থান দেখো।

অগ্ন্যুদগম : সহজ করে বুঝে নাও ...

একটা ছোটো ও একটা বড়ো কাঁচের পাত্র , ছোটো জাগ, কিছুটা পলিথিন, রাবার ব্যান্ড, পেনসিল আর রং লাগবে। প্রথমে ছোটো পাত্রটা গরম জল দিয়ে কানায় কানায় ভর্তি করতে হবে। এবার ঐ জলে গাঢ় কোনও রং মিশিয়ে সাবধানে পলিথিন আর রাবার ব্যান্ডটা দিয়ে মুখটা আটকে দিতে হবে। পেনসিল দিয়ে পলিথিন-এর উপরে দু-তিনটে ছিদ্র করতে হবে। এরপর এই ছোটো পাত্রটা বড়ো পাত্রটার মধ্যে বসাতে হবে। বড়ো পাত্রটার মধ্যে জাগে করে এমনভাবে ঠান্ডা জল ঢালতে হবে যেন ছোটো পাত্রটা সম্পূর্ণ ডুবে যায়।

ছোটো পাত্র থেকে গরম রঙিন জল বেরিয়ে ওপরে উঠতে থাকবে।

— পুরো পরীক্ষাটার কার্যকারণ ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করো।

'আ আ' আর 'পা হো হো' কি?

ইন্দোনেশিয়ার আগ্নেয়গিরি থেকে গাঢ়, সান্দ্র একরকম লাভা নির্গত হয়। হাওয়াই দ্বীপের ভাষায় এর নাম 'আ আ'। এই লাভা দ্রুত খুব বেশিদূর প্রবাহিত হয় না।

হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের আগ্নেয়গিরিগুলো থেকে অত্যন্ত পাতলা লাভা বেরিয়ে বহুদুর প্রবাহিত হয়। হাওয়াই দ্বীপের ভাষায় যার নাম 'পা হো হো'। এই লাভা প্রবাহের ওপরের স্তর দ্রুত ঠান্ডা হয়ে কুঁচকে গিয়ে পাকানো দড়ির মতো দেখতে হয়।

বানিয়ে ফেলো তোমার আগ্নেয়গিরি —

একটা কার্ডবোড, সরু লম্বা কৌটো, প্লাস্টিক টেপ, খবরের কাগজ, আঠা, বালি অথবা ছাই, রঙিন কাগজ, কিছুটা ভিনিগার আর খাবার সোডা গোলা জল লাগবে। কার্ডবোর্ডের মাঝখানে কৌটোটা টেপ দিয়ে আটকে দাও। কৌটোর চারদিক দিয়ে খবরের কাগজের দলা পাকিয়ে শঙ্কুর মতো তৈরি করো। এবার আগ্নেয়গিরির বাইরেটা অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল অথবা কোনো রঙিন কাগজ দিয়ে ঢেকে দাও। এর ওপর আঠা লাগিয়ে বালি ছড়িয়ে দিতে পারো।

তোমার আগ্নেয়গিরি মোটামুটি তৈরি। এবার অগ্ন্যুৎপাতের জন্য কৌটোর মধ্যে ভিনিগার আর খাবার সোডা গোলা জল ঢেলে দাও। কিছুটা লাল রং মিশিয়ে দিলেই দেখবে — তোমার আগ্নেয়গিরি থেকে লাল লাভা বেরিয়ে আসছে!

ভূমিকম্প (EARTHQUAKE)

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম উপকূলে ক্যালিফোর্নিয়ার সানফ্রান্সিসকো— মনোরম জলবায়ুর এই শহর পৃথিবী বিখ্যাত। কিন্তু এই শহরে বসবাস করা বেশ ঝুঁকিপূর্ণ। সানফ্রান্সিসকো এবং লস

এঞ্জেলস্ শহরদুটো San Andreas fault -এর প্রায় ওপরেই অবস্থিত। এই অঞ্চলে পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরীয় পাত উত্তরে এবং উত্তর আমেরিকা পাত দক্ষিণে পাশাপাশি অগ্রসর হচ্ছে। ফলে সংলগ্ন অঞ্চলটা ভূগাঠনিকভাবে অত্যন্ত অস্থির। প্রায়শই ভূ-আলোড়ন, ভূমিকম্প ঘটতে থাকে। যেমন- ১৯০৬ সালের শক্তিশালী ভূমিকম্পে সানফ্রান্সিসকো শহর প্রায় সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।

পৃথিবীর প্রায় প্রতিটা পাত সীমানা অত্যন্ত ভূমিকম্পপ্রবণ। আর এজন্যই আগ্নেয়গিরি এবং ভূমিকম্পকেন্দ্রগুলো প্রায়শই একই জায়গায় অবস্থিত হয়। তবে ভূআলোড়ন, পাতসঞ্চরণ, অগ্ন্যুৎপাত এর মতো প্রাকৃতিক কারণ ছাড়াও ভূগর্ভে গহ্বর, খনি ও সুড়ঙ্গ খনন, জলাধার নির্মাণ, ধস, বোমা বিস্ফোরণ ইত্যাদি কৃত্রিম কারণেও ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়। প্রতিমুহূর্তে পৃথিবীর কোথাও না কোথাও কম্পিত হচ্ছে। পৃথিবীর স্থিতিস্থাপক অভ্যন্তরে কোনো সঞ্চিত শক্তি হঠাৎ মুক্ত হলে ভূত্বক কেঁপে ওঠে এবং ভূমিকম্প (Earthquake) হয়।

ভূপৃষ্ঠের নীচে ভূঅভ্যন্তরে যে স্থান থেকে ভূমিকম্পের উদ্ভব হয়, তা হলো ভূমিকম্পেরকেন্দ্র (Focus)। অধিকাংশ ভূমিকম্পের কেন্দ্র ভূপৃষ্ঠ থেকে ৫০-১০০ কিমি গভীরে হয়ে থাকে।

কেন্দ্র থেকে ঠিক উল্লম্ব দিকে ভূপৃষ্ঠের যে বিন্দুতে প্রথম কম্পন পৌঁছায় সেটা ভূমিকম্পের উপকেন্দ্র (Epicentre)। পুকুরের মাঝে ঢিল ছুঁড়লে ঢেউগুলো যেমন বাইরের দিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে, তেমনি ভূমিকম্পের ফলে উদ্ভুত শক্তি কেন্দ্র, উপকেন্দ্র থেকে পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে তরঙ্গের মতো ছড়িয়ে পড়ে। এই তরঙ্গগুলোকে বলা হয় ভূ-কম্পন তরঙ্গ (Seismic wave)। ভূ-কম্পন তরঙ্গ তিন ধরনের হয়। যথা—

- প্রাথমিক তরঙ্গ (Primary wave, 'P'wave)— সব থেকে দ্রুত (৬ কিমি/সে.) এই তরঙ্গ ভূ-পৃষ্ঠে প্রথম এসে পৌঁছোয়। কঠিন, তরল, গ্যাসীয় পদার্থের মধ্য দিয়ে ক্রমসংকোচন ও প্রসারণ প্রক্রিয়ায় এই তরঙ্গ প্রবাহিত হয়।
- দ্বিতীয় পর্যায়ের তরঙ্গ (Secondary wave, 'S' wave)— P তরঙ্গের পরে এই তরঙ্গ (৩-৫ কিমি/সে.) ভূপৃষ্ঠে এসে পৌঁছোয়। বস্তুকণার ওপর-নীচে ওঠানামার মাধ্যমে প্রবাহিত হয়। এই তরঙ্গ তরল বা গ্যাসীয় পদার্থের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হতে পারে না। শুধুমাত্র কঠিন পদার্থের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়।
- ভূমিকম্পের উপকেন্দ্র থেকে ভূ-পৃষ্ঠ বরাবর দুধরনের পৃষ্ঠ তরঙ্গ (Level wave, 'L' wave) ছড়িয়ে পড়ে (৩-৪ কিমি/সে.)। লাভ তরঙ্গ (Love wave) এবং র‍্যালে তরঙ্গ (Reyleigh wave)— এই পৃষ্ঠ তরঙ্গগুলোর কারণেই বেশিরভাগ ক্ষয়ক্ষতি হয়ে থাকে।

ভূমিকম্প তরঙ্গগুলোর প্রতিফলন ও প্রতিসরণ সমীক্ষা করেই ভূ-অভ্যন্তরের গঠন বিন্যাস সম্বন্ধে জানা সম্ভব হয়েছে।

ভূমিকম্পের পরিমাপ

ভূমিকম্প সিসমোগ্রাফ (Seismograph) বা ভূকম্প- লিখ যন্ত্রে মাপা হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে প্রচুর ভূমিকম্প পরিমাপ কেন্দ্র আছে। কোনো ভূমিকম্পের কয়েক মিনিটের মধ্যেই একাধিক সিসমোগ্রাফ এর তথ্য তুলনা করে ভূমিকম্পের কেন্দ্র, উপকেন্দ্রের অবস্থান, স্থায়িত্ব, তীব্রতা — সবই নির্ভুলভাবে বলে দেওয়া যায়।

ভূমিকম্পে ক্ষয়ক্ষতি ও তীব্রতার মাত্রা পরিমাপ করা হয় রিখটার স্কেলে (Richter Scale)। চার্লস রিখটার উদ্ভাবিত এই স্কেলের সূচক মাত্রা ০–১০ । প্রতিটি মাত্রার ভূমিকম্প তার আগের মাত্রার চেয়ে দশ গুণ বেশি শক্তিশালী হয়। রিখটার স্কেলে '৬' এর বেশি মাত্রার ভূমিকম্পে বিরাট ক্ষয়ক্ষতি হয়। ১৯৬০ সালে চিলির ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল রিখটার স্কেলে ৮.৫।

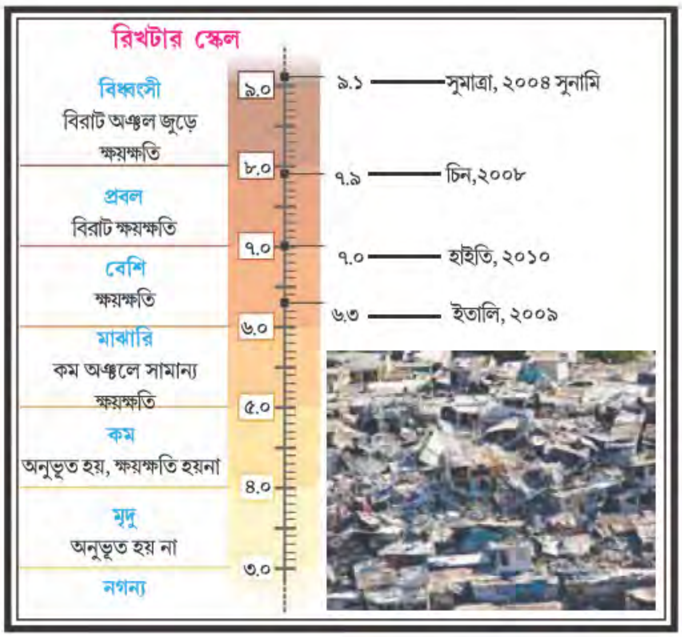

সব সিসমোগ্রাফের মূল গঠন এক। শক্ত ফ্রেম থেকে স্প্রিং এর সাহায্যে ভারী ওজন (Weight) ঝোলানো থাকে। এর সাথে পেন আটকানো থাকে। আর একদিকে বেলনের গায়ে কাগজের রোল জড়ানো থাকে। ভূমিকম্পের সময় ওজনের সঙ্গে ঝোলানো পেন কাঁপতে থাকে। বেলনে আটকানো কাগজের গায়ে আঁকাবাঁকা ঢেউ-এর মত দাগ পড়ে, একে 'সিসমোগ্রাম' (Seismogram) বলে।

ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চল

অভিসারী, অপসারী, নিরপেক্ষ সমস্ত ধরনের পাত সীমানায় ভূমিকম্প হলেও অভিসারী পাত সীমানায় তীব্র ভূমিকম্প হয়ে থাকে। প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে নিমজ্জিত পাত সীমানায়, হিমালয় ও আল্পস পার্বত্য অঞ্চলে অভিসারী সংঘর্ষ সীমানায় প্রায়শই ভূমিকম্প হয়। পৃথিবীর সমস্ত নবীন ভঙ্গিল পার্বত্য অঞ্চল ভূমিকম্পপ্রবণ।

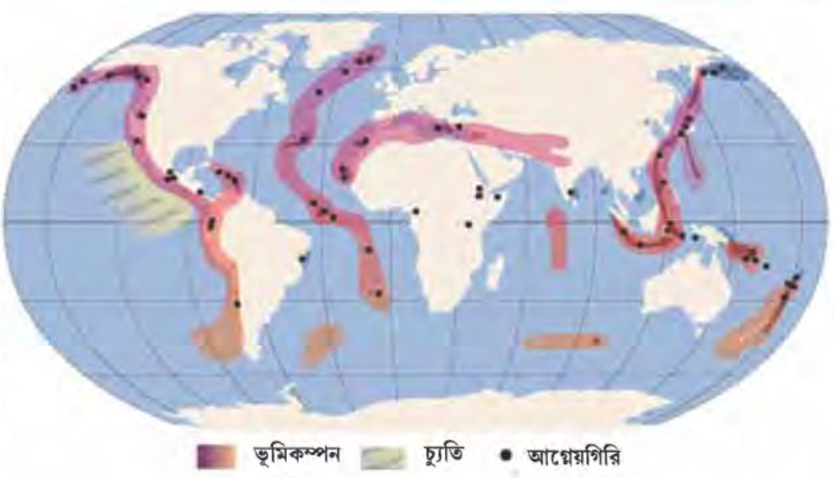

মানচিত্রে পৃথিবীর প্রধান আগ্নেয়গিরি এবং ভূমিকম্প বলয়গুলো ভালো করে লক্ষ করো—

- পৃথিবীর অধিকাংশ জীবন্ত আগ্নেয়গিরি, প্রশান্ত মহাসাগরকে বলয়ের মতো ঘিরে রেখেছে। এজন্য প্রশান্ত মহাসাগরের দুদিকের উপকূলের আগ্নেয়গিরি বলয়কে 'প্রশান্ত মহাসাগরীয় অগ্নিবলয়' (Pacific Ring of Fire) বলা হয়। পৃথিবীর ৭০ শতাংশ ভূমিকম্প হয় এই বলয়ে।

—এই বলয়ের প্রধান আগ্নেয়গিরিগুলো মানচিত্রে শনাক্ত করো—ফুজিয়ামা (জাপান), পিনাটুবো (ফিলিপাইনস), ক্রাকাতোয়া (ইন্দোনেশিয়া), সেন্ট হেলেন্স (আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র), পোপোক্যাটিপেটল্ (মেক্সিকো), কোটোপ্যাক্সি (ইকুয়েডর)।

- মেক্সিকো থেকে শুরু করে আটলান্টিক মহাসাগর, ভূমধ্যসাগর, আল্পস, ককেশাশ, হিমালয় হয়ে বিস্তৃত মধ্য পৃথিবীর পার্বত্য বলয় অথবা মধ্য মহাদেশীয় বলয়-এ পৃথিবীর ২০ শতাংশ ভূমিকম্প ঘটে। ইতালির ভিসুভিয়াস, সিসিলির স্ট্রম্বলি, এটনা প্রভৃতি আগ্নেয়গিরি এই বলয়ের অন্তর্গত।

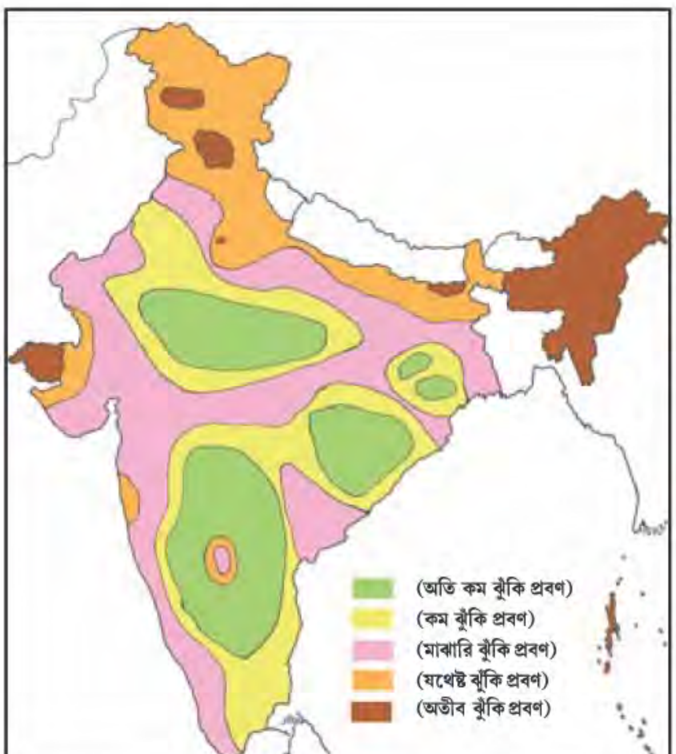

ভারতের ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চল

আমাদের দেশের কোন অঞ্চল কতটা ভূমিকম্পপ্রবণ জেনে নাও

ভারতের তিনভাগের দুভাগ অঞ্চলই ভূমিকম্প প্রবণ। ভূমিকম্প প্রবণতার বিচারে ভারতকে পাঁচটি অঞ্চলে ভাগ করা যায়। ভারতের ভূমিকম্প বলয় প্রধানত হিমালয় পার্বত্য অঞ্চল এবং গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় বিস্তৃত। তবে শেষ পঞ্চাশ বছরে দাক্ষিণাত্য মালভূমিতেও ভূমিকম্পের ঘটনা ঘটেছে।

- ➢ শ্রেণিকক্ষে এই পাঁচটা ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চল পর্যবেক্ষণ করো। ভারতের রাজনৈতিক মানচিত্রে মিলিয়ে দেখো— কোন অঞ্চলে কোন কোন বড়ো শহর, বিখ্যাত স্থান রয়েছে?
- ➢ তুমি যেখানে বাস করো সেটা কোন ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চলে অবস্থিত? সেখানে কখনো ভূমিকম্প হয়েছে?

অগ্ন্যুদ্‌গম, ভূমিকম্প : প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও মানুষের জীবন

অগ্ন্যুৎপাত এবং ভূমিকম্প — দুটোই ভূঅভ্যন্তরীণ শক্তির আকস্মিক বহিঃপ্রকাশ। এর ফলে একদিকে যেমন পৃথিবীর ভূপ্রকৃতি, জলবায়ুর বড়ো ধরনের পরিবর্তন হতে পারে, সম্পত্তি ধ্বংস হয়ে বিপর্যয় ঘটতে পারে। আবার পৃথিবীর অনেক আগ্নেয়গিরি সংলগ্ন অঞ্চল অত্যন্ত জনবহুল। আগ্নেয় ভস্ম, লাভা থেকে উর্বর মাটি তৈরি হয়, যা কৃষিকাজে খুবই উপযুক্ত। যেমন— ভারতের দাক্ষিণাত্য মালভূমির উর্বর কৃষ্ণ মৃত্তিকা (Black soil)। আগ্নেয়গিরি অধ্যুষিত অঞ্চলে উষ্ণপ্রস্রবণ, গাইজার থেকে অনেকসময় মূল্যবান রত্ন, খনিজ পাওয়া যায় (দক্ষিণ আফ্রিকার কিম্বারলির হিরের খনি অঞ্চল)।

- অন্যান্য প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মতো ভূমিকম্পের আগাম সতর্কবার্তা দিয়ে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কমানোর কোনো সুযোগ থাকে না। তাই আকস্মিক ভূমিকম্পে ঘরবাড়ি ভেঙে, চাপা পড়ে প্রচুর প্রাণহানি হয়। বড়ো বড়ো ধস, ফাটল তৈরি হওয়ায় পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা নষ্ট হয়ে যায়। বড়ো জলাধারের চাপে ভূমিকম্প হলে (মহারাষ্ট্রের কয়না জলাধার) বাঁধ ভেঙে জলাধারের জল বেরিয়ে গিয়ে সংলগ্ন অঞ্চলে হঠাৎ বন্যা হয়।

  সমুদ্র তলদেশে বা উপকূল অঞ্চলে ভূমিকম্পের ফলে ঢেউ-এর উচ্চতা বেড়ে প্রবল শক্তিতে উপকূল অঞ্চলে আছড়ে পড়ে (সুনামি)। এর ফলে বহু জীবনহানি ও ক্ষয়ক্ষতি হয়।

সুনামি

- পৃথিবীব্যাপী জনসংখ্যা বৃদ্ধি, অপরিকল্পিত নগরায়ণ, ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চলে বহুতল, রাস্তাঘাট, বাঁধ, জলাধার নির্মাণ, অবৈধ খনি খনন — সবই সম্ভাব্য বিপর্যয়ের প্রবণতাকে বাড়িয়ে তুলছে।

- ভূমিকম্পের ফলে কখনও কখনও উপকূল অঞ্চলে ভূভাগ নিমজ্জিত হয়ে প্রাকৃতিক বন্দর তৈরি হয়। বহু আন্তঃসাগরীয় এলাকা ভেসে উঠে নতুন 'ভূভাগ' তৈরি হয় (সাম্প্রতিক করাচির কাছে জেগে ওঠা 'কাদার দ্বীপ')।

- ২৬ ডিসেম্বর, ২০০৪ সালে ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রা দ্বীপ-এর কাছে ভারত মহাসাগরের নীচে রিখটার স্কেলে ৮.৯ মাত্রায় ভূমিকম্পে এবং ভয়ংকর জলোচ্ছ্বাসে (সুনামি) ভারতসহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ১১ টা দেশে বহু ক্ষয়ক্ষতি ও ৩,০০,০০০ মানুষের প্রাণহানি হয়।

পূর্বাভাস ও প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা

ভূকম্প প্রতিরোধী নির্মাণ

ভূমিকম্পের পূর্বাভাস দেওয়া যায় না। কিন্তু কিছু সতর্কতামূলক ব্যবস্থা ও পরিকল্পনা প্রচুর জীবনহানি আটকাতে পারে। যেমন— ভূকম্প প্রতিরোধী নির্মাণ, আপৎকালীন প্রস্তুতি, বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা। অনেক সময় আমাদের নিজস্ব পর্যবেক্ষণ, পরিবেশের আকস্মিক পরিবর্তন, জীবজন্তুদের অস্বাভাবিক আচরণ, ভূমিকম্প সম্পর্কে আগাম বার্তা দিতে পারে।

বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা

- বাড়ির ঝুঁকিপূর্ণ বিষয়গুলো চিহ্নিতকরণ
- দুর্যোগ মোকাবিলার পরিকল্পনা
- জরুরিকালীন জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখা
- বাড়ির দুর্বল স্থান মেরামত করা
- ভূমিকম্প চলাকালীন কোন শক্ত আসবাবের তলায় আশ্রয় নেওয়া
- কম্পন থেমে গেলে আঘাত, ক্ষয়ক্ষতির অনুসন্ধান
- বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা ও পরিকল্পনা অনুসরণ

মনে করো এই মুহূর্তে হঠাৎ ভূমিকম্প শুরু হলো। এরকম পরিস্থিতিতে তুমি প্রথমেই কী করবে?

- যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাড়ী বা স্কুল থেকে বেরিয়ে কোনো খোলা জায়গায় যাবে।
- যদি খোলা জায়গায় বেরিয়ে যাওয়া সম্ভব না হয় তবে বাড়ির মধ্যে দ্রুত কোনো টেবিল বা শক্ত আসবাবের তলায় ঢুকে পড়বে।
- ভূমিকম্প চলাকালীন বহুতল বাড়ির ঝুল বারান্দা, সিঁড়ি, লিফ্‌ট ব্যবহার এড়িয়ে চলবে।
- বাড়ি থেকে বেরবার আগে সম্ভব হলে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সঙ্গে নিয়ে নেবে।

শিলা

তন্ময় পুজোর ছুটিতে হিমাচল প্রদেশের মানালিতে বেড়াতে গিয়েছিল। ওখানে বিয়াস নদীর ধারে নানা ধরনের পাথর দেখতে পায়। তার অনেকগুলো তন্ময় বাড়ি নিয়ে আসে। ওগুলো শিলা আর খনিজ। আমাদের চারপাশের পাহাড়-পর্বত, উপত্যকা, সমুদ্রের পাড়, মালভূমি সবই এই শিলা দিয়ে গঠিত।

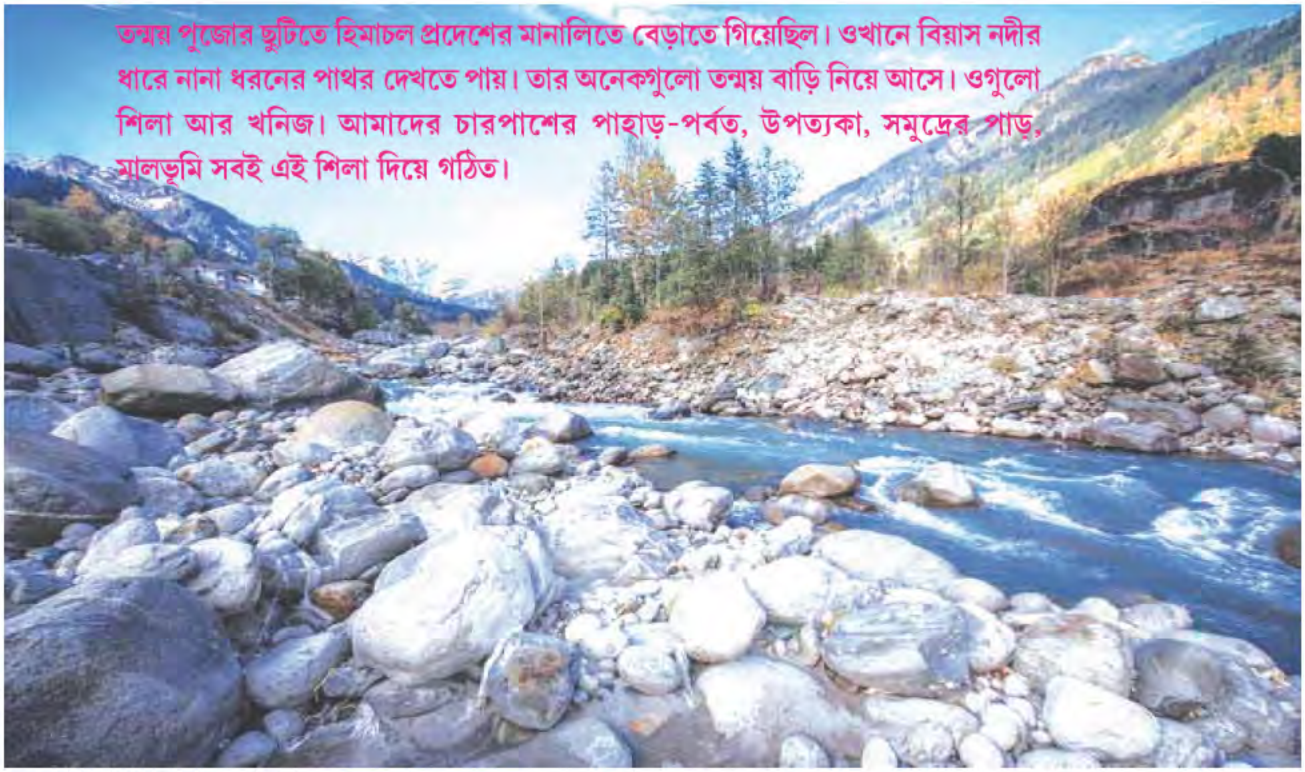

পৃথিবী যে শক্ত আবরণে ঢাকা তা হলো শিলা। শিলা (Rock) আসলে প্রকৃতিতে প্রাপ্ত এক বা একাধিক খনিজের সমসত্ত্ব বা অসমসত্ত্ব মিশ্রণ। আর যে খনিজ (Mineral) দিয়ে শিলা গঠিত তা হলো এক বা একাধিক অজৈব মৌলিক পদার্থের যৌগ। যেমন গ্রানাইট শিলা কোয়ার্টজ, ফেল্ডসপার, মাইকা ও হর্নব্লেন্ড খনিজ দ্বারা গঠিত। আবার চুনাপাথর শুধুমাত্র ক্যালসাইট অথবা অ্যারাগোনাইট খনিজ দিয়ে গঠিত।

♦ প্রকৃতিতে বিভিন্ন রকমের শিলা দেখতে পাওয়া যায়। এদের সৃষ্টি আর বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে শিলাকে তিনটি পরিবারে ভাগ করা যায় — (১) আগ্নেয় শিলা, (২) পাললিক শিলা ও (৩) রূপান্তরিত শিলা

জেনে রাখো

- **সমসত্ত্ব মিশ্রণে** উপাদানগুলো সব জায়গায় সম অনুপাতে থাকে। **অসমসত্ত্ব মিশ্রণে** উপাদানগুলো বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন অনুপাতে থাকে।
- শিলার প্রবেশ্যতা বলতে শিলার মধ্যে দিয়ে তরল বা গ্যাসীয় পদার্থের প্রবেশ করার ক্ষমতাকে বোঝায়। সছিদ্রতা হলো শিলার মধ্যেকার শূন্যস্থান এবং শিলার মোট আয়তনের অনুপাত। প্রবেশ্যতা বেশি হলে জলধারণ ক্ষমতা কমে। সছিদ্রতা বেশি হলে জলধারণ ক্ষমতা বাড়ে।

আগ্নেয় শিলা

পৃথিবী সৃষ্টির সময় উত্তপ্ত ও তরল অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে তাপ বিকিরণ করে ভূত্বকের মধ্যে ও ওপরে প্রথম যে কঠিন শিলার সৃষ্টি হয় সেটি আগ্নেয় শিলা (Igneous Rock)। পৃথিবীতে প্রথম সৃষ্টি হওয়ায় এই শিলার আরেক নাম প্রাথমিক শিলা। ভূ-অভ্যন্তরের বিভিন্ন ধাতব পদার্থ যেমন-সিলিকন, লোহা, নিকেল, ম্যাগনেশিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম প্রভৃতি উত্তপ্ত ও গলিত অবস্থায় ম্যাগমা রূপে থাকে। এই ম্যাগমা ভূ-অভ্যন্তরের প্রবল চাপে লাভা রূপে ভূপৃষ্ঠে উঠে এসে বা ভূ-অভ্যন্তরেই ধীরে ধীরে শীতল ও কঠিন হয়ে জমাট বেঁধে আগ্নেয় শিলার সৃষ্টি করে।

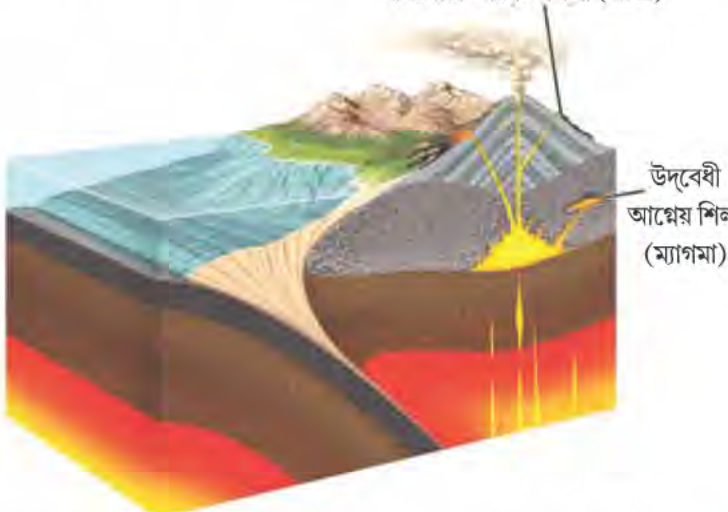

উৎপত্তি অনুসারে আগ্নেয় শিলা দুরকম। ভূ-অভ্যন্তরের অত্যধিক চাপে উত্তপ্ত গলিত ম্যাগমা ভূত্বকের কোনো দুর্বল ফাটলের মধ্যে দিয়ে ভূপৃষ্ঠে লাভা রূপে এসে শীতল ও কঠিন হয়ে যে আগ্নেয় শিলা সৃষ্টি করে তার নাম নিঃসারী আগ্নেয় শিলা। খুব দ্রুত জমাট বেঁধে গঠিত হয় বলে এর দানাগুলো বেশ সূক্ষ্ম হয়। যেমন— ব্যাসল্ট, অবসিডিয়ান।

আবার ভূ-অভ্যন্তরের গলিত ম্যাগমা ভূত্বকের দুর্বল ফাটল বা ছিদ্রের মাধ্যমে ভূপৃষ্ঠে পৌঁছোতে না পেরে ভূ-অভ্যন্তরেই ধীরে ধীরে শীতল ও কঠিন হয়ে উদবেধী আগ্নেয় শিলার সৃষ্টি করে। যেমন—গ্রানাইট, ডোলেরাইট। এই উদবেধী আগ্নেয় শিলা আবার দুরকমের হয়। ম্যাগমা ভূ-অভ্যন্তরের কোনো ফাটল বা ছিদ্রপথে ধীরে ধীরে শীতল ও কঠিন হয়ে জমাট বেঁধে সৃষ্টি করে উপপাতালিক শিলা। যেমন—ডোলেরাইট। আবার ম্যাগমা ভূ-অভ্যন্তরের একেবারে তলদেশে অতি ধীরে ধীরে শীতল ও কঠিন হয়ে সৃষ্টি করে পাতালিক শিলা। ধীরে ধীরে শীতল ও কঠিন হয়ে জমাট বাঁধে বলে এই শিলার দানাগুলো কিছুটা স্থূল হয়। যেমন— গ্রানাইট।

আগ্নেয় শিলার বিশেষত্ব

- এই শিলা শক্ত ও ভারী, ঘনত্ব খুব বেশি।

ব্যাসল্টের উল্লম্ব দারণ

- কেলাসের মতো গঠন দেখা যায়।
- এই শিলায় উল্লম্ব দারণ (Joint) ও ফাটল (Crack) দেখা যায়, তাই প্রবেশ্যতা বেশি।
- ভঙ্গুরতা যথেষ্ট কম হওয়ায় ক্ষয় প্রতিরোধের ক্ষমতা বেশি।

বিশেষ কথা

বিভিন্ন খনিজের সাথে দৃঢ় ভাবে জলের অণু সংযুক্ত হয়ে কেলাস গঠন করে, যা দেখতে স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল। এই কেলাসের মধ্যে পরমাণুগুলো যে নির্দিষ্ট বিন্যাসে অবস্থান করে তা অনেকটা ছবিতে দেখানো কমলালেবুগুলোর মতো। সাধারণত আগ্নেয় শিলা সৃষ্টির সময় তার মধ্যে খনিজের সাথে জল থেকে যায় যা শিলার মধ্যে শিরার মতো অবস্থান করে। শিলা ঠান্ডা হলে ঐ শিরার আকারে থাকা খনিজ জল বাষ্পীভূত হয় এবং কেলাস গঠিত হয়। কোয়ার্টজ, টোপ্যাজ, ক্যালসাইট, হিরে— এই সব খনিজগুলোতে কেলাসের গঠন ভালো ভাবে দেখা যায়।

ক্যালসাইটের কেলাস

কেলাসের গঠন চিনির দানা বা মিছরির টুকরোর মতো দেখতে হয়।

দুটি আগ্নেয় শিলার পরিচয়

গ্রানাইট : প্রধানত এই আগ্নেয়শিলায় মহাদেশীয় ভূত্বক তৈরি। হালকা সাদা, ধূসর থেকে গোলাপি রঙের এই শিলা কোয়ার্টজ, ফেল্ডসপার, মাইকা ও হর্নব্লেন্ড খনিজ দ্বারা গঠিত। এই শিলা অপ্রবেশ্য। খুব ভারী এবং শক্ত হওয়ায় গ্রানাইটের ক্ষয় প্রতিরোধ ক্ষমতা খুব বেশি। ভূ-অভ্যন্তরে অতি ধীরে ধীরে শীতল ও কঠিন হয়ে জমাট বাঁধায় এই শিলার দানাগুলো কিছুটা বড়ো (ব্যাস ৩ মিমি-এর বেশি)। গ্রানাইট শিলায় গঠিত অঞ্চলের ভূমিরূপ সাধারণত গোলাকার হয়।

ব্যাসল্ট : প্রধানত এই আগ্নেয় শিলায় মহাসাগরীয় ভূত্বক গঠিত। খুব ভারী ও শক্ত, ক্ষয় প্রতিরোধী এই শিলা গাঢ় ধূসর থেকে কালো রঙের হয়। ব্যাসল্ট গঠনকারী প্রধান খনিজগুলি হলো কোয়ার্টজ, ফেল্ডসপার, অলিভিন ও পাইরক্সিন। ব্যাসল্ট শিলায় উল্লম্ব দারণ ও ফাটলের সংখ্যা খুব বেশি থাকায় এর প্রবেশ্যতা যথেষ্ট বেশি। খুব দ্রুত জমাট বেঁধে গঠিত হওয়ায় এর দানাগুলো বেশ সূক্ষ্ম (ব্যাস ১ মিমি-এর কম)। ব্যাসল্ট শিলা গঠিত অঞ্চলে চ্যাপ্টা আকৃতির ভূমিরূপ দেখা যায়।

পায়েল পুরিতে বেড়াতে গিয়েছিল। সমুদ্রের সামনে শুধু বালি আর বালি। বালি শুকনো থাকলে অনেক ঝুরঝুরে আর হালকা লাগে, কিন্তু জলে ভিজলেই ভারী হয়ে ওঠে। পায়েল তার বাবার কাছ থেকে জানতে পারে এই বালি আসলে শিলার ক্ষয়প্রাপ্ত অংশ, যা সমুদ্রের ঢেউ-এর মাধ্যমে পাড়ে এসে জমা হয়।

পাললিক শিলা

আগ্নেয় শিলা বহু দিন ধরে বিভিন্ন প্রাকৃতিক ক্ষয়কারী শক্তি যেমন—নদী, হিমবাহ, বায়ু, সমুদ্রতরঙ্গ প্রভৃতির প্রভাবে উৎস স্থান থেকে ধীরে ধীরে ক্ষয়প্রাপ্ত ও পরিবাহিত হয়ে কোনো সমুদ্র, হ্রদ বা নদীর তলদেশে জমা হতে থাকে। এভাবে বছরের পর বছর ক্ষয়প্রাপ্ত পদার্থগুলো স্তরে স্তরে সঞ্চিত হয় এবং চাপের ফলে জমাট বেঁধে শক্ত হয়ে পাললিক শিলার সৃষ্টি করে। এই শিলার মধ্যে বালি, পলি ও কাদার ভাগ বেশি থাকে। পলি জমাট বেঁধে সৃষ্টি হওয়ায় এর নাম পাললিক শিলা (Sedimentary Rock)। যেমন—চুনাপাথর, বেলেপাথর, কাদাপাথর।

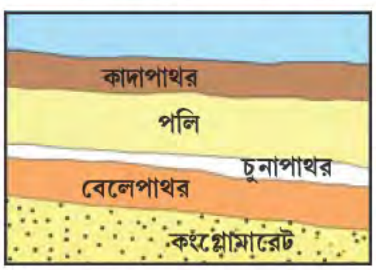

পাললিক শিলার বিশেষত্ব

- এই শিলায় স্তরায়ণ এবং কাদার চিড় খাওয়া দাগ লক্ষ করা যায়।
- একমাত্র এই শিলাতেই জীবাশ্ম দেখা যায়।
- এই শিলায় সছিদ্রতা ও ভঙ্গুরতা দেখা যায়।
- এই শিলার প্রবেশ্যতা খুব বেশি।
- ক্ষয় প্রতিরোধের ক্ষমতা বিভিন্ন রকম হয়।
- কয়লা, খনিজ তেল, প্রাকৃতিক গ্যাসের ভাণ্ডার এই শিলা।
- কাঠিন্য আগ্নেয় শিলার থেকে কম; দারণ, ফাটল বা কেলাসের গঠন থাকে না।

স্তরায়ণ

পাললিক শিলার অপরিহার্যতা : প্রায় ৩০-৩৫ কোটি বছর আগে ভূ-আন্দোলনের সময় পৃথিবীর অরণ্য ভূগর্ভে চাপা পড়ে যায় এবং ভূগর্ভের চাপ ও তাপে উদ্ভিদের কাণ্ডে সঞ্চিত কার্বন স্তরীভূত হয়ে কয়লায় পরিণত হয়।

প্রায় ৭-১০ কোটি বছর আগে পাললিক শিলাস্তরে নানাধরনের প্রাণী ও উদ্ভিদ চাপা পড়ে যায়। ওপরের স্তরের প্রবল চাপে ও ভূগর্ভের প্রচণ্ড তাপে তাদের দেহাবশেষ হাইড্রোজেন ও কার্বনের দ্রবণে পরিণত হয়ে খনিজ তেলের সৃষ্টি হয়। খনিজ তেলের ওপরের স্তরে প্রাকৃতিক গ্যাসের উপস্থিতি দেখা যায়। শুধুমাত্র সছিদ্র পাললিক শিলাস্তরেই খনিজ তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস পাওয়া যায়।

অতীতের ছাপ—জীবাশ্ম

স্তরে স্তরে জমাট বেঁধে পাললিক শিলা সৃষ্টির সময় কখনো কখনো সামুদ্রিক উদ্ভিদ বা প্রাণী তার মধ্যে চাপা পড়ে যায়। পরে পাললিক শিলার মধ্যে ওই উদ্ভিদ বা প্রাণীর দেহ প্রস্তরীভূত হলে তাদের দেহাবশেষের ছাপ থেকে যায়। একে বলে **জীবাশ্ম (Fossil)**।

পলির উৎপত্তি অনুসারে পাললিক শিলা দু প্রকার

সংঘাত শিলা — প্রাচীন শিলা চূর্ণ বিচূর্ণ ও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে বহুদিন ধরে জমাট বেঁধে যে শিলার সৃষ্টি করে তা হলো সংঘাত শিলা। যেমন — কংগ্লোমারেট, ব্রেকসিয়া। অসংঘাত শিলা — রাসায়নিক উপায়ে অথবা জৈবিক উপায়ে সৃষ্ট শিলা হলো অসংঘাত শিলা। যেমন— চুনাপাথর, লবণ শিলা।

যান্ত্রিক উপায়ে গঠিত পাললিক শিলা তিন প্রকার

কর্দমময় (০.০৬ মিমি-এর কম ব্যাসযুক্ত দানা)

বালুকাময় (০.০৬ - ২ মিমি পর্যন্ত ব্যাসযুক্ত দানা)

প্রস্তরময় (২ মিমি-এর বেশি ব্যাসযুক্ত দানা)

তিনটি পাললিক শিলার পরিচয়

চুনাপাথর: চুনাপাথর বা ক্যালশিয়াম কার্বনেট বিশুদ্ধ জলে দ্রবীভূত হয় না। কিন্তু বৃষ্টির জল বা অ্যাসিড মিশ্রিত জলে দ্রুত দ্রবীভূত হয় এবং ক্যালশিয়াম বাইকার্বনেট-এ পরিণত হয়। এর ক্ষয় প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশ কম এবং প্রবেশ্যতা বেশি। চুনাপাথর যুক্ত অঞ্চলে বৃষ্টির জলে দ্রুত গর্ত সৃষ্টি হয় এবং জল নীচে নেমে যায়। চুনাপাথরের রং সাদা, ধূসর, সবুজ, কালচে হতে পারে। সিমেন্ট তৈরিতে, লৌহ ইস্পাত শিল্পে কাঁচামাল হিসাবে চুনাপাথর ব্যবহৃত হয়।

বেলেপাথর: বেলেপাথরের প্রবেশ্যতা বেশি হলেও ক্ষয় প্রতিরোধ ক্ষমতা যথেষ্ট বেশি। বেলেপাথর হলুদ, কমলা, লাল, গোলাপি, সাদা, ধূসর হতে পারে। বেলেপাথর গঠিত অঞ্চলের মৃত্তিকা লবণাক্ত ও এর উর্বরতা কম। স্থাপত্য, স্মৃতিসৌধ এই পাথরে নির্মিত হয়। লালকেল্লা, উদয়গিরি-খণ্ডগিরির মন্দির, খাজুরাহোর মন্দির, জয়সলমীরের সোনার কেল্লা বেলেপাথরে তৈরি।

কাদাপাথর: কাদাপাথরের রং কালচে ধূসর। কাদাপাথরের মধ্যে স্তরায়ন খুব স্পষ্ট। এটি মিহি দানাযুক্ত শিলার উদাহারণ। এর সছিদ্রতা খুব বেশি। কাদাপাথর বেশ নরম ও ভঙ্গুর প্রকৃতির। এই শিলাকে পাতলা স্তরে ভাঙা যায় বলে বাড়ির টালি তৈরিতে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। খুব সহজেই স্তর বরাবর ভেঙে যায় বলে এই শিলায় গঠিত অঞ্চলে বড়ো ধরনের নির্মাণকার্য করা উচিত নয়।

সন্দীপ শীতকালে দিল্লি, আগ্রা, ফতেপুর সিক্রি ঘুরতে গিয়েছিল। আগ্রার তাজমহল দেখে সন্দীপের ভীষণ ভালো লেগেছিল। সন্দীপের মা বলেছিলেন, 'তাজমহলের পাথরগুলোর সাথে কলকাতার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের পাথরের কোনো মিল খুঁজে পাচ্ছো?' সন্দীপ বলেছিল, 'পাথরগুলো অনেকটাই একরকম দেখতে। কিন্তু এগুলো কী পাথর?' মা বলেছিলেন 'এগুলো সবই মার্বেল।'

রূপান্তরিত শিলা

আগ্নেয় ও পাললিক শিলা ভূ-অভ্যন্তরের প্রচণ্ড চাপ, তাপ, নানা রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে দীর্ঘ সময় ধরে তার পুরোনো ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম হারিয়ে সম্পূর্ণ নতুন ধর্ম বিশিষ্ট শিলায় পরিণত হয়। একেই বলে রূপান্তরিত শিলা (Metamorphic Rock)। অনেকভাবেই শিলার রূপান্তর হতে পারে। যথা— (১) অত্যধিক তাপে (পিট কয়লা থেকে গ্রাফাইট), (২) প্রচণ্ড চাপে (শেল থেকে স্লেট), (৩) রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে (অ্যান্ডালুসাইট থেকে সিলিমেনাইট)।

প্রধানত চাপের ফলে বিশাল অঞ্চল জুড়ে শিলার আঞ্চলিক বা ব্যাপক রূপান্তর ঘটে। যেমন- স্লেট। স্পর্শ বা তাপের ফলে শিলার স্পর্শ বা স্থানীয় রূপান্তর হয়ে থাকে। যেমন— মার্বেল।

কয়েকটি শিলার রূপান্তরিত রূপ

রূপান্তরিত শিলার বিশেষত্ব

- রূপান্তরের ফলে আগ্নেয় বা পাললিক শিলা অনেক বেশি কঠিন হয়ে যায়।
- এই শিলা কেলাসযুক্ত হতে পারে।
- আগ্নেয় শিলা রূপান্তরিত হলে তা আগের তুলনায় আরও মসৃণ, চকচকে ও কেলাসিত হয়ে যায়।
- পাললিক শিলা রূপান্তরিত হলে তার ভঙ্গুরতা কমে যায়।
- রূপান্তরের ফলে শিলার ভেতরের খনিজের অবস্থানের পরিবর্তন ঘটে। তখন একই ধর্মবিশিষ্ট খনিজ শিলার একদিকে কাছাকাছি চলে আসে।
- প্রচণ্ড তাপ ও চাপে রূপান্তরের সময় পাললিক শিলা মধ্যস্থ জীবাশ্মগুলো নষ্ট হয়ে যায়।

- পাললিক শিলায় কেলাস গঠন হয় না কেন?
- আগ্নেয় শিলাতে জীবাশ্ম দেখা যায় না কেন?
- কোন ধরনের শিলা থেকে খনিজ পদার্থ সংগ্রহ করতে সুবিধা হয় এবং কেন?

তিনটি রূপান্তরিত শিলার পরিচয়

মার্বেল : চুনাপাথরের রূপান্তরিত রূপ। মার্বেল পাথর দেখতে খুবই সুন্দর, মসৃণ ও চকচকে। এর রং সাদা, সবুজ, ধূসর, হলুদ, নীল অনেক রকমের হয়। মার্বেলকে খুব সুন্দর ভাবে নির্দিষ্ট আকারে কেটে নেওয়া যায়। তাই স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পে এই শিলার প্রচুর ব্যবহার দেখা যায়। তবে অ্যাসিডে মার্বেল দ্রুত ক্ষয়ে যায়। তাই অ্যাসিড মিশ্রিত জল মার্বেলের সংস্পর্শে আনা উচিত নয়।

স্লেট : শেলের রূপান্তরিত রূপ। স্লেট বেশ মসৃণ, নীলচে-ধূসর থেকে কালো রঙের হয়ে থাকে। পাতলা পাতের আকারে স্লেট সহজেই ভেঙে যায়। এই ধর্মের জন্য স্লেট দিয়ে ঘরের টালি তৈরি করা হয়। এছাড়া ব্ল্যাকবোর্ড তৈরিতে এবং লেখার কাজে স্লেট ব্যবহার করা হয়।

নিস : গ্রানাইটের রূপান্তরিত রূপ। নিস শক্ত, ক্ষয় প্রতিরোধী শিলা। এতে অনেক সময় বলয়ের আকারে খনিজগুলো একসাথে থাকে। এই ধরনের নিসকে ব্যান্ডেড নিস বলা হয়। এর থেকে নির্দিষ্ট খনিজ সংগ্রহ করতে সুবিধা হয়। রাস্তাঘাট ও নির্মাণকার্যে এই শিলার প্রচুর ব্যবহার হয়ে থাকে।

শিলাচক্র

অগ্ন্যুদ্গমের মাধ্যমে বা ভূপৃষ্ঠের কোনো দুর্বল ছিদ্রপথে ম্যাগমা ভূপৃষ্ঠে লাভারূপে বেরিয়ে এসে অথবা ভূ-অভ্যন্তরে শীতল ও কঠিন হয়ে আগ্নেয় শিলার সৃষ্টি করে। পরে এই শিলা নদী, বায়ু, হিমবাহ প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত ও অপসারিত হয়ে কোনো সমুদ্র, হ্রদ বা নদীর তলদেশে বহু বছর ধরে সঞ্চিত ও কঠিন হয়ে পাললিক শিলার সৃষ্টি করে। আগ্নেয় ও পাললিক—

শিলাচক্র

এই দু'ধরনের শিলা ভীষণ তাপ, চাপ অথবা রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে দীর্ঘ সময় ধরে পরিবর্তিত হয়ে রূপান্তরিত শিলায় পরিণত হয়। আবার বহু বছর পর এই তিন ধরনের শিলা ভূআলোড়নের ফলে ভূগর্ভে প্রবেশ করলে ম্যাগমায় পরিণত হয়। এই ম্যাগমা থেকে আগ্নেয় শিলার সৃষ্টি হয়। আবার কখনো রূপান্তরিত শিলা বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তি দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত ও অপসারিত হয়ে

নদী, সমুদ্র বা হ্রদের তলদেশে সঞ্চিত হয়ে ও জমাট বেঁধে পাললিক শিলা তৈরি করে। প্রকৃতিতে শিলার উৎপত্তি ও এক শিলা থেকে অন্য শিলায় রূপান্তর একটি নির্দিষ্ট নিয়মে চক্রাকারে আবর্তিত হয়ে চলেছে। এইভাবে ক্রমান্বয়ে তিন প্রকার শিলার বিভিন্ন পদ্ধতিতে চক্রাকারে আবর্তনের সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি হলো শিলাচক্র।

ভূমিরূপের ওপর শিলার প্রভাব

গ্রানাইট শিলায় গঠিত ভূমিরূপ

অরিজিৎ তার মামার বাড়ি রাঁচিতে বেড়াতে গিয়েছিল। ওখান থেকে বেতলা আর নেতারহাটেও ঘুরতে যায়। এই পুরো অঞ্চলটাতে অরিজিৎ একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য লক্ষ করে। যেমন- বিভিন্ন ধরনের ছোটো ছোটো গোলাকার টিলা। রাঁচিসহ সমগ্র ছোটনাগপুর অঞ্চল প্রধানত গ্রানাইট শিলায় গঠিত। এই প্রাচীন শিলা গঠিত ভূমিরূপ সাধারণত গোলাকার হয়।

ফারহা গিয়েছিল মহারাষ্ট্রের পঞ্চগণি-মহাবালেশ্বর অঞ্চলে। সেখানে চ্যাপ্টা মাথা বিশিষ্ট টেবিলের মতো ভূমিরূপ দেখতে পায়। এই জায়গাটা দাক্ষিণাত্য মালভূমির ডেকানট্র্যাপ-এর অংশ। এই অঞ্চল ব্যাসল্ট জাতীয় ক্ষারকীয় শিলায় গঠিত হওয়ায় এখানকার ভূমিরূপগুলো অনেকটা চ্যাপ্টা আকারের।

ডেকানট্র্যাপ

স্ট্যালাকটাইট ও স্ট্যালাগমাইট

ইমরান চেরাপুঞ্জী-মৌসিনরামে ঘুরতে গিয়ে চুনাপাথরের গুহা দেখতে পায়। গুহার ছাদ থেকে ঝুলতে থাকা চুনাপাথরের দন্ডকে বলে স্ট্যালাকটাইট। গুহার মেঝে থেকে ওপরের দিকে জমে থাকা চুনাপাথরের দন্ডকে বলে স্ট্যালাগমাইট। এই স্ট্যালাকটাইট ও স্ট্যালাগমাইট জুড়ে গিয়ে চুনাপাথরের স্তম্ভ তৈরি করে। আবার চুনাপাথরযুক্ত অঞ্চলে নদী বা বৃষ্টির জল মাটিকে দ্রুত ক্ষয় করে ভূগর্ভে গিয়ে ছোটো বড়ো নানা আকৃতির গর্তের সৃষ্টি করে। এই ধরনের ভূমিরূপের নাম **কার্স্ট ভূমিরূপ**।

কয়েকটি শিলার তুলনামূলক বৈশিষ্ট্য

শিলার নাম	শিলার প্রকৃতি	শিলাগঠিত অঞ্চলের ভূমিরূপের বৈশিষ্ট্য	রূপান্তরিত রূপ
গ্রানাইট	আগ্নেয়	গোলাকার	নিস
ব্যাসল্ট	আগ্নেয়	চ্যাপটা	অ্যাম্ফিবোলাইট
চুনাপাথর	পাললিক	গুহা	মার্বেল
বেলেপাথর	পাললিক	খাড়া ঢালবিশিষ্ট	কোয়ার্টজাইট

বিশেষ কথা

চুনাপাথরযুক্ত অঞ্চলে কোনো বাঁধ বা জলাধার, বহুতল বাড়ি, অতিরিক্ত রাস্তাঘাট নির্মাণ করা উচিত নয়। কারণ নদী বা বৃষ্টির জলের সংস্পর্শে চুনাপাথর দ্রবীভূত হয়ে ক্ষয়ে গিয়ে এগুলো ভেঙে যেতে পারে। এই ধরনের নির্মাণ কার্যের জন্য আগ্নেয় শিলা অধ্যুষিত অঞ্চলই উপযুক্ত।

জানার চেষ্টা করো

- কোনো জায়গায় বেড়াতে গেলে সেখান থেকে কিছু ছোটো বড়ো পাথর খুঁজে নিয়ে এসো। নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে পাথরগুলো চিনে নিতে চেষ্টা করো, প্রয়োজনে শিক্ষক-শিক্ষিকার সাহায্য নাও।
- তোমার চারপাশে কোনো বিশেষ দ্রষ্টব্য স্থান বা স্থাপত্যকার্য থাকলে তা কোন কোন শিলায় তৈরি জানার চেষ্টা করো।
- রেললাইনের মাঝে থাকা শিলার নাম কী? কেন এই ধরনের শিলা এখানে রাখা হয়?
- গ্রানাইট শিলা চিকচিক করে কেন?
- তোমার কাছে কোনো শিলা বা খনিজ থাকলে একটু উত্তপ্ত করে দেখো— কোন শিলা তাড়াতাড়ি গরম হয় আর কোন শিলা বেশিক্ষণ গরম থাকে?
- পেনসিলের সিস কোন শিলা দিয়ে তৈরি এবং এই শিলা কী ধরনের?

শিলা গঠনকারী খনিজ :

শিলা মধ্যস্থ কেলাসিত, নির্দিষ্ট রাসায়নিক সংযুক্তি বিশিষ্ট, নির্দিষ্ট পারমাণবিক গঠনযুক্ত মৌলিক বা যৌগিক পদার্থ হলো খনিজ। এর নিজস্ব আকার, বর্ণ, কাঠিন্য, গঠন দেখা যায়। খনিজ একটি নির্দিষ্ট মৌলিক পদার্থ হতে পারে। যেমন-হিরে, যা হলো কার্বনের রূপভেদ। আবার খনিজ অনেক মৌলিক পদার্থ দিয়ে গঠিত কোনো যৌগিক পদার্থও হতে পারে। যেমন- গোলাপি রঙের অর্থোক্লেজ ফেল্ডসপার— পটাশিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম, সিলিকন আর অক্সিজেন দিয়ে গঠিত। প্রকৃতির বেশির ভাগ শিলা গঠনকারী খনিজ সিলিকন, অক্সিজেন, লোহা, অ্যালুমিনিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, ক্যালশিয়াম, সোডিয়াম আর পটাশিয়াম — এই আটটা মৌল দিয়ে গঠিত।

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ খনিজের সংক্ষিপ্ত পরিচয়—

কোয়ার্টজ : খুব কঠিন, মূলত সাদা, ষড়ভুজাকৃতি কেলাসাকার। গ্রানাইট ও ব্যাসল্ট শিলার মূল উপাদান। কোয়ার্টজ থাকায় এই শিলাগুলো বেশি ক্ষয় প্রতিরোধী। গয়না তৈরি, কাঁচ আর পাথর কাটতে কোয়ার্টজ ব্যবহৃত হয়।

ফেল্ডসপার : সাদা বা গোলাপি রঙের ফেল্ডসপার গ্রানাইট ও ব্যাসল্টের অন্যতম প্রধান উপাদান। সাদা রঙের প্ল্যাজিওক্লেজ ফেল্ডসপারের মূল রাসায়নিক উপাদান সোডিয়াম। আবার গোলাপি অর্থোক্লেজ ফেল্ডসপারের মূল উপাদান হলো পটাশিয়াম। সেরামিক শিল্পে ও কাঁচ তৈরিতে ফেল্ডসপার ব্যবহৃত হয়।

অভ্র : চকচকে, মসৃণ, পাতলা ও ভঙ্গুর প্রকৃতির। অভ্র সাদাটে স্বচ্ছ মাসকোভাইট অথবা কালো রঙের বায়োটাইট জাতীয় হতে পারে। এর উপস্থিতিতে গ্রানাইট চিকচিক করে। অভ্র তাপ ও বিদ্যুতের কুপরিবাহী। বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, প্রতিমার সাজ, রঙ তৈরিতে অভ্র ব্যবহৃত হয়।

জিপসাম : বেশ নরম, হালকা, হলুদ রঙের খনিজ। জিপসাম ক্যালশিয়াম সালফেটের জলযুক্ত কেলাস। সিমেন্ট শিল্পে, সার তৈরি ও নির্মাণ কার্যে জিপসাম ব্যবহৃত হয়।

জানার বিষয়

খনিজের কাঠিন্য পরিমাপের স্কেল হলো **মোহ (Mohs) স্কেল** যার সূচক মাত্রা ১ - ১০। এই স্কেল অনুসারে সর্বনিম্ন কাঠিন্যের খনিজ হল ট্যাল্ক (১) এবং সর্বোচ্চ কাঠিন্যের খনিজ হলো হীরে (১০)।

- আমি দেখতে চকচকে, সাদা বা কালো রঙের। আমি নরম, সহজেই পাতের মতো বেঁকে যাই। গ্রানাইট শিলার একটি মূল খনিজ উপাদান আমি। বলতে পারো আমি কে?

খনিজের প্রভাব

প্রকৃতিতে খনিজের প্রভাব খুব স্পষ্ট। লোহা অথবা বক্সাইট সমৃদ্ধ ভূমির উপরিস্তর বেশ শক্ত ও লাল রঙের হয়। আবার জিপসামযুক্ত ভূমি নরম, হালকা হলুদ রঙের হয়। নরম ক্যালসাইট খনিজ থাকলে তা চুনাপাথরের সৃষ্টি করে এবং যথেষ্ট ক্ষয়প্রবণ হয়। খনিজ তেল বা প্রাকৃতিক গ্যাস যেখানে পাওয়া যায় সেই অঞ্চল যথেষ্ট নরম, সছিদ্র ও প্রবেশ্য পাললিক শিলার দ্বারা তৈরি হয়ে থাকে। অতিরিক্ত খনিজযুক্ত মাটির (যেমন—লোহা ও অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইডযুক্ত ল্যাটেরাইট মাটি ও লাল মাটি) উর্বরতা কম, ফলে চাষবাস ভালো হয় না। ভারতের ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলে বিভিন্ন খনিজ সম্পদ যেমন—লোহা, তামা, বক্সাইট, ম্যাঙ্গানিজ, ডলোমাইট, মাইকা প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় বলে একে ভারতের খনিজ ভান্ডার বলে। ছোটনাগপুর মালভূমির মানুষের প্রধান জীবিকা হলো খনিজ সম্পদ উত্তোলন এবং খনিভিত্তিক শিল্প।

- ছোটনাগপুর মালভূমি ছাড়া ভারতের আরেকটি মালভূমির নাম করো যা বিশেষ ভাবে খনিজ সম্পদ দ্বারা সমৃদ্ধ।

শিলা থেকে মাটির সৃষ্টি—

আদিশিলার ওপর শিলাচূর্ণ ও জৈবপদার্থের মিশ্রিত পাতলা আবরণ হলো মাটি, জীবকূলের আবাসস্থল। বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তি যেমন- নদী, বায়ু, বৃষ্টিপাত, সমুদ্রতরঙ্গ, হিমবাহ দ্বারা বহুদিন ধরে শিলা ও শিলা গঠনকারী খনিজগুলো ক্ষয় হয়ে সূক্ষ্ম শিথিল শিলাচূর্ণ রূপে অবস্থান করে। এই শিলাচূর্ণ হলো রেগোলিথ। পরে এর সাথে জল, বায়ু, জৈবপদার্থ মিশে মাটির সৃষ্টি হয়। মাটির চরিত্র অনেক ক্ষেত্রেই তার নীচের পৃষ্ঠ বা আদিশিলার ওপর নির্ভর করে। যেমন— সাধারণত ব্যাসল্ট শিলায় কৃষ্ণমৃত্তিকা, গ্রানাইট শিলায় লোহিত মৃত্তিকা, বেলেপাথরে বেলেমাটি তৈরি হয়।

কৃষ্ণমৃত্তিকা

লোহিত মৃত্তিকা

বেলে মাটি

ঠিকঠিক মিলিয়ে ফেলো

১) চুনাপাথর	গোলাকার ভূমিরূপ
২) বেলেপাথর	শিলার রূপান্তরের একটি কারণ
৩) গ্রানাইট	জিপসাম
৪) প্রচণ্ড চাপ	স্ট্যালাকটাইট
৫) ব্যাসল্ট	চ্যাপ্টা ভূমিরূপ
৬) মার্বেল	রূপান্তরিত শিলা
৭) পটাশিয়াম	অর্থোক্লেজ ফেল্ডসপার
৮) ক্যালশিয়াম সালফেট	পাললিক শিলা

আমাকে চিনে নাও —

- আমি মসৃণ, দেখতে খুব সুন্দর। নানা রঙে আমায় পাওয়া যায়। আমি ঘরবাড়ির মেঝে তৈরির কাজে আসি। বিখ্যাত ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল-এর মতো স্থাপত্যশিল্পে আমার ব্যবহার আছে।
- আমি খুব শক্ত, সূক্ষ্ম দানার কালো-ধূসর রঙের শিলা। রাস্তাঘাট নির্মাণে আমার ব্যবহার হয়ে থাকে। আমার মধ্যে দিয়ে জল সহজেই প্রবেশ করতে পারে।

আমাদের জীবনে শিলা

আগ্নেয় শিলার ব্যবহার

ব্যাসল্টে তৈরি

গ্রানাইটে তৈরি

পাললিক শিলার ব্যবহার

চুনাপাথরে তৈরি

বেলেপাথরে তৈরি

রূপান্তরিত শিলার ব্যবহার

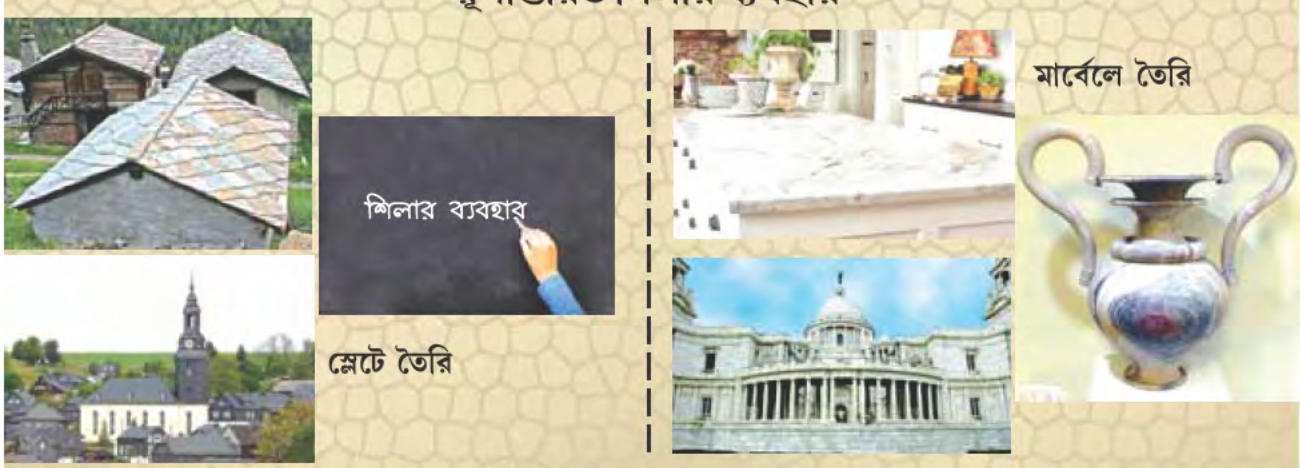

শ্লেটে তৈরি

মার্বেলে তৈরি

সহজে চিনে নাও

তোমার বাড়ি, স্কুল, আশেপাশের অঞ্চল থেকে শিলা জোগাড় করো। প্রয়োজনে জল ও ব্রাশের সাহায্যে ভালো করে পরিষ্কার করে নাও। এরপর শিলাগুলো চেনার চেষ্টা করো।

শিলার নাম :

শিলার নমুনার নম্বর :

শিলাকে ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করে নীচের শূন্যস্থানগুলো পূরণ করো :

সছিদ্রতা আছে/ নেই	প্রবেশ্যতা আছে/ নেই	চকচকে/ চকচকে নয়	মসৃণ/ অমসৃণ	গোলাকার/ চ্যাপটা/ কোণাকৃতি	রং	দানা– বড়ো/ মাঝারি/ ছোটো	শিলায় দাগ কাটা যায়/যায় না	ভারী/ হালকা	সহজে ভাঙা যায়/ যায় না	বিশেষ বৈশিষ্ট্য

(শিলাগুলো ভালোভাবে চিনতে প্রয়োজনে আতস কাঁচ, পয়সা, জল প্রভৃতি ব্যবহার করো।)

ওপরের লেখাগুলো থেকে যা যা বৈশিষ্ট্য পেলে সেগুলো নিয়ে একটা অনুচ্ছেদ লিখে ফেলো। বন্ধুরা মিলে একে অপরের লেখাগুলো দেখো। দেখবে তোমরা নিজেরাই হয়ে উঠেছ এক একজন শিলা বিশারদ!

শব্দছক সমাধান

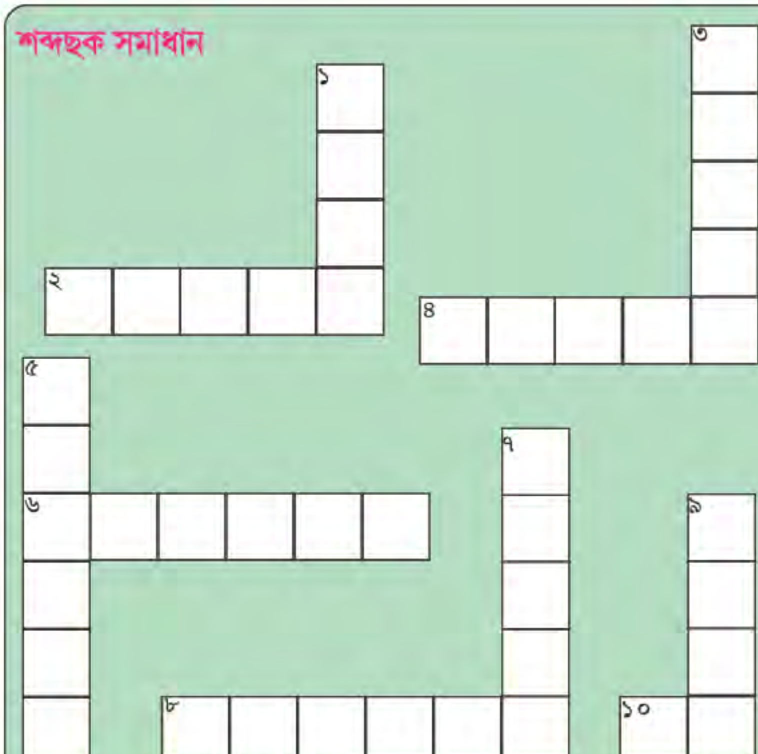

ওপর-নীচ

১। পাতালিক শিলার উদাহরণ
৩। বালিময় পাললিক শিলা
৫। গুহায় ঝুলন্ত চুনাপাথরের দণ্ড
৭। কালো রঙের অভ্র
৯। কয়লার রূপান্তরিত রূপ

পাশাপাশি

২। উপপাতালিক শিলার উদাহরণ
৪। ক্যালশিয়াম কার্বনেট
৬। প্রস্তরময় পাললিক শিলা
৮। সাদা রঙের অভ্র
১০। শেলের রূপান্তরিত রূপ

চাপবলয় ও বায়ুপ্রবাহ

সৌরজগতের গ্রহগুলোর মধ্যে পৃথিবী হলো বায়ুর চাদরে মোড়া একমাত্র গ্রহ। বায়ুর ওজন আছে, বায়ু পৃথিবী পৃষ্ঠে চাপ দেয়। এই চাপই বায়ুর চাপ। স্থান ও সময় বিশেষে এই চাপের পার্থক্য লক্ষ করা যায়। কোথাও চাপ বেশি (উচ্চ), আবার কোথাও কম (নিম্ন)।

➢ সমগ্র পৃথিবী জুড়ে বিভিন্ন অঞ্চলে বায়ুচাপের তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। এর কারণগুলো তোমরা সপ্তম শ্রেণিতে জেনেছ। পৃথিবী পৃষ্ঠের ওপর নির্দিষ্ট দূরত্বে সমধর্মী বায়ুস্তর অনুভূমিকভাবে প্রায় হাজার কিলোমিটার জুড়ে পুরো পৃথিবীকে কয়েকটি বলয়ের আকারে বেষ্টন করে আছে। একে বলে বায়ুচাপ বলয় (Pressure Belts)।

বায়ুচাপ বলয়

নিরক্ষীয় অঞ্চল : নিরক্ষরেখার দুপাশে ০° থেকে ৫° অক্ষরেখা পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল হলো নিরক্ষীয় অঞ্চল। এই অঞ্চলে একটি বায়ুচাপ বলয় অবস্থান করছে।

দেখা যাক সেটি উচ্চচাপযুক্ত না নিম্নচাপযুক্ত—

- ➢ নিরক্ষীয় অঞ্চলে সারাবছর সূর্যরশ্মি লম্বভাবে পড়ে। ফলে এখানকার বায়ু সারা বছর উষ্ণ থাকে।
- ➢ এই অঞ্চলে স্থলভাগের তুলনায় জলভাগ বেশি। উষ্ণ বায়ুর জলীয়বাষ্প ধারণক্ষমতা বেশি হয়। আবার উষ্ণ বায়ুর ঘনত্ব কম বলে এটি হালকা হয়। এই হালকা জলীয়বাষ্পযুক্ত বায়ু প্রসারিত হয়ে ওপরে ওঠে।
- ➢ এই ঊর্ধ্বগামী বায়ু পৃথিবীর আবর্তন গতির কারণে নিরক্ষরেখা থেকে উত্তর ও দক্ষিণ দিকে ছিটকে যায়। ফলে এই অঞ্চলে বায়ুর পরিমাণ কমে যায়।

- ভেবে দেখো এইগুলোর জন্য নিরক্ষীয় অঞ্চলে কোন ধরনের (উচ্চচাপ/নিম্নচাপ) বায়ুচাপ বলয় সৃষ্টি হয়েছে?
- দুটো দেশ ও দুটো মহাসাগরের নাম করো যার ওপর দিয়ে এই বায়ুচাপ বলয় বিস্তৃত?

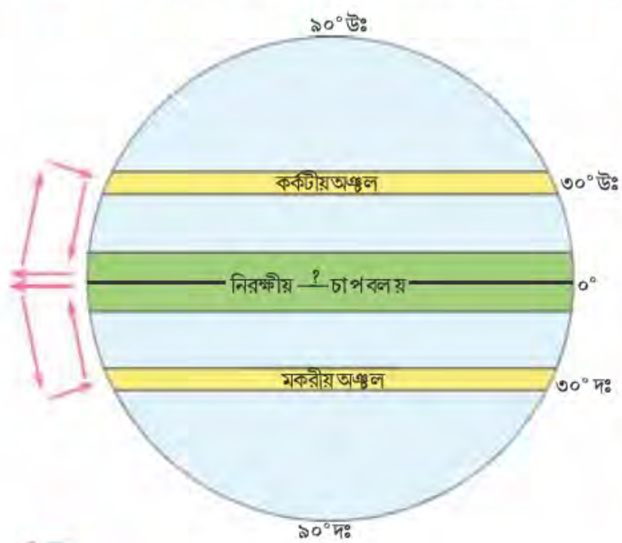

বিশেষ কথা

ভূপৃষ্ঠের সমান্তরালে বায়ুর অনুভূমিক চলাচল হলো বায়ুপ্রবাহ।

ভূপৃষ্ঠের ওপর বায়ুর উল্লম্ব চলাচল হলো বায়ুস্রোত।

নিরক্ষীয় শান্তবলয় (Doldrums) : নিরক্ষীয় অঞ্চল বরাবর উষ্ণ ও হালকা বায়ু সোজা ওপরের দিকে উঠে যাওয়ায় এখানে বায়ুর ঊর্ধ্বমুখী স্রোত লক্ষ করা যায়। ভূপৃষ্ঠের সমান্তরালে কোনো বায়ু প্রবাহিত হয় না। ফলে এখানে বায়ুর কোনো চলাচল বোঝা যায় না, শান্তভাব বিরাজ করে। তাই এই অঞ্চলের নাম নিরক্ষীয় শান্তবলয়। প্রাচীনকালে এই অঞ্চলের ওপর দিয়ে জাহাজ চালানোর সময় প্রায়ই জাহাজগুলো থেমে যেত। নাবিকরা এই অঞ্চলের নামকরণ করেন '**ডোলড্রামস**' (যার অর্থ শান্তাবস্থা)।

কর্কটীয় ও মকরীয় অঞ্চল : উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধে ২৫° থেকে ৩৫° অক্ষরেখার মধ্যবর্তী অঞ্চল যথাক্রমে কর্কটীয় ও মকরীয় অঞ্চল নামে পরিচিত। এই দুই অঞ্চলে দুটি বায়ুচাপ বলয় সৃষ্টি হয়েছে। নিরক্ষীয় শান্তবলয়ের মতো এই দুই অঞ্চল যথাক্রমে কর্কটীয় শান্তবলয় ও মকরীয় শান্তবলয় নামে পরিচিত।

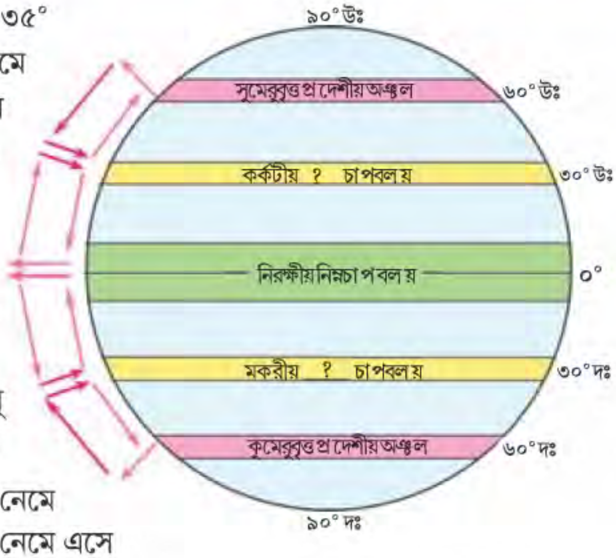

দেখা যাক অঞ্চল দুটি উচ্চচাপযুক্ত না নিম্নচাপযুক্ত—

- নিরক্ষীয় অঞ্চল থেকে উষ্ণ, আর্দ্র ও হালকা বায়ু ওপরের দিকে উঠতে শুরু করে। এই ঊর্ধ্বগামী বায়ুর উষ্ণতা ক্রমশ কমতে থাকে। বায়ু ঠান্ডা ও ভারী হয়ে ওঠে এবং ঘনত্ব বেড়ে যায়। নিরক্ষীয় ও মেরু অঞ্চলে এই ঊর্ধ্বগামী বায়ু পৃথিবীর আবর্তনের ফলে বিক্ষিপ্ত হয়।
- এই বিক্ষিপ্ত শীতল ও ভারী বায়ু কর্কটীয় ও মকরীয় অঞ্চলে নেমে আসে। আবার মেরু অঞ্চল থেকে ঠান্ডা ও শুষ্ক বায়ু নীচের দিকে নেমে এসে দুই ক্রান্তীয় অঞ্চলে অবস্থান করে।
- দুটি বিপরীতধর্মী বাতাস দুই ক্রান্তীয় অঞ্চলে মিলিত হবার ফলে এখানে বায়ুর পরিমাণ বেড়ে যায়, ঘনত্বও বাড়ে।

- এই কারণগুলোর জন্য কর্কটীয় ও মকরীয় অঞ্চলে কোন ধরনের বায়ুচাপ বলয় অবস্থান করে?
- কর্কটীয় ও মকরীয় বলয়কে শান্তবলয় বলার কারণ কী?

অশ্ব অক্ষাংশ

ষোড়শ শতকে কর্কটীয়-মকরীয় শান্তবলয় দিয়ে পালতোলা জাহাজগুলো চলাচলের সময় গতিহীন হয়ে পড়ত। ফলে মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপ থেকে আসা ঘোড়াভর্তি বাণিজ্যিক জাহাজগুলোর পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ও আমেরিকায় যেতে অনেক বেশি সময় লাগত। এই অবস্থায় জাহাজের ভার কমাতে এবং পানীয় জল ও খাবারের সংকট এড়াতে কিছু জীবন্ত ঘোড়াকে আটলান্টিক মহাসাগরে ফেলে দিতে হতো। এই কারণে দুই ক্রান্তীয় অঞ্চল (২৫°- ৩৫° উঃ ও দঃ) অশ্ব অক্ষাংশ নামে পরিচিত।

○ অশ্ব অক্ষাংশ বরাবর পালতোলা জাহাজগুলো গতিহীন হয়ে পড়ত কেন?

মেরুবৃত্ত প্রদেশীয় অঞ্চল : উভয় গোলার্ধে ৬০° থেকে ৭০° অক্ষরেখার মাঝের অঞ্চল অর্থাৎ সুমেরুবৃত্ত ও কুমেরুবৃত্ত বরাবর দুটি চাপবলয় অবস্থান করে। এই দুটি চাপবলয় উত্তর গোলার্ধে সুমেরুবৃত্ত প্রদেশীয় চাপবলয় ও দক্ষিণ গোলার্ধে কুমেরুবৃত্ত প্রদেশীয় চাপবলয় নামে পরিচিত।

দেখা যাক এই চাপবলয় দুটি উচ্চচাপযুক্ত না নিম্নচাপযুক্ত —

➢ দুই গোলার্ধের মেরু অঞ্চলের তুলনায় পার্শ্ববর্তী মেরুবৃত্ত প্রদেশীয় অঞ্চলের উষ্ণতা বেশি হয়। ফলে এই অঞ্চলের বায়ু হালকা হয়ে ওপরে ওঠে ও প্রসারিত হয়।

➢ এই ঊর্ধ্বগামী বায়ু পৃথিবীর আবর্তনের কারণে উত্তর ও দক্ষিণ দিকে বিক্ষিপ্ত হয়ে উভয় গোলার্ধের ক্রান্তীয় ও মেরু অঞ্চলের দিকে নেমে আসে। অর্থাৎ উত্তর গোলার্ধে সুমেরুবৃত্ত প্রদেশীয় অঞ্চল থেকে ঊর্ধ্বগামী বায়ু উত্তরে বিক্ষিপ্ত হয়ে সুমেরু অঞ্চলে নেমে আসে। আবার দক্ষিণে বিক্ষিপ্ত হয়ে কর্কটীয় অঞ্চলে নেমে আসে। ফলে দুই মেরুবৃত্ত প্রদেশীয় অঞ্চলে বায়ুর পরিমাণ কমে, ঘনত্ব হ্রাস পায়।

- ভেবে বলো দুই মেরুবৃত্ত প্রদেশে বায়ুর কী ধরনের চাপ সৃষ্টি হয়?
- দক্ষিণ গোলার্ধে কুমেরুবৃত্ত প্রদেশীয় অঞ্চল থেকে বায়ু ঊর্ধ্বগামী হয়ে কোন কোন অঞ্চলে নেমে আসে ?

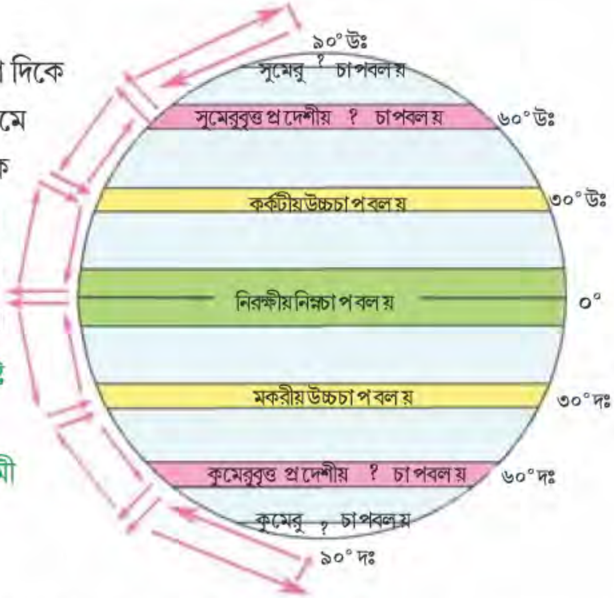

মেরু অঞ্চল : দুই গোলার্ধে ৮০° অক্ষরেখা থেকে মেরু বিন্দু মধ্যবর্তী অঞ্চলে দুটি বায়ু চাপবলয় সৃষ্টি হয়েছে।

দেখা যাক এই চাপ বলয় দুটি উচ্চচাপযুক্ত না নিম্নচাপযুক্ত —

➢ দুই মেরু অঞ্চল প্রায় সারাবছর বরফে ঢাকা থাকায় উষ্ণতা হিমাঙ্কের নীচে থাকে। তাই এখানকার বাতাস ভীষণ শীতল ও ভারী।

➢ এই অঞ্চলে সূর্যরশ্মি তির্যকভাবে পড়ায় তাপের অভাবে বাষ্পীভবনের পরিমাণ খুব কম। ফলে বাতাসে জলীয়বাষ্পের পরিমাণও কম থাকে।

➢ পৃথিবীর আবর্তনের কারণে মেরুবৃত্ত প্রদেশীয় অঞ্চল থেকে বায়ুর কিছু অংশ মেরু অঞ্চলে নেমে আসে।

- এই কারণগুলোর জন্য দুই গোলার্ধে মেরু অঞ্চলে কী ধরনের বায়ুচাপ বলয় অবস্থান করে?
- সুমেরু অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত দুটো দেশ ও দুটো সাগরের নাম লেখো।

আলোচনা করে নীচের প্রশ্নগুলো সমাধান করার চেষ্টা করো :

- পৃথিবীতে কটা বায়ুচাপ বলয় আছে তাদের নাম লিখে ফেলো।
- বায়ুচাপ বলয়গুলোর অক্ষাংশগত বিস্তৃতি উল্লেখ করে চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন করো।
- অক্ষাংশগত বিস্তৃতির উল্লেখ করে অশ্ব-অক্ষাংশ এবং ডোলড্রাম অঞ্চলের চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন করো।
- কোন কোন বায়ুচাপ বলয় থেকে বায়ু উল্লম্বভাবে বিক্ষিপ্ত হয় এবং কোন কোন বায়ুচাপ বলয়ে এসে বায়ু মিলিত হয় এঁকে বোঝাও।
- দুই ক্রান্তীয় অঞ্চল এবং দুই মেরু অঞ্চলে বায়ুর ঘনত্ব বেশি হয় কেন?

বায়ুপ্রবাহ

চাপের সমতা বজায় রাখার জন্য বায়ু সবসময় উচ্চচাপ অঞ্চল থেকে নিম্নচাপ অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হয়। দুটো অঞ্চলের মধ্যে চাপের পার্থক্য বায়ু চলাচলের অন্যতম প্রধান কারণ। উচ্চচাপ ও নিম্নচাপযুক্ত অঞ্চলের মধ্যে চাপের পার্থক্য বেশি হলে বায়ুর গতিবেগ বাড়ে, আবার চাপের পার্থক্য কমলে বায়ু ধীর গতিতে বয়। যখন চাপের পার্থক্য প্রায় থাকে না, শান্ত আবহাওয়া বিরাজ করে।

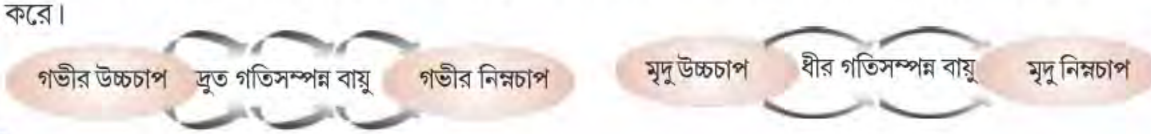

➢ পাশের ছবিটা লক্ষ করে দেখো—এভাবে ঘোরার সময় ওদের বাইরের দিকে ছিটকে যাবার প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে। এক্ষেত্রে কেন্দ্র থেকে বাইরের দিকে কেন্দ্র বহির্মুখী বল (Centrifugal force) কাজ করায় তারা পেছনের দিকে হেলে পড়ছে।

পৃথিবীর আবর্তন বা ঘূর্ণন গতির কারণে পৃথিবী-পৃষ্ঠস্থ যেকোনো স্বচ্ছন্দ, গতিশীল বস্তুর ওপর একধরনের বল কাজ করে যা বস্তুগুলোর দিক বিক্ষেপ (পরিবর্তন) ঘটায়। এই বল হলো কোরিওলিস বল (Coriolis force)। পৃথিবীতে স্বাভাবিকভাবে চলাচলকারী বাতাস ও সমুদ্র স্রোতের ওপর সাধারণভাবে এই বল কাজ করে। এই কোরিওলিস বলের কারণে উচ্চচাপ থেকে নিম্নচাপের দিকে চলাচলের সময় বায়ু সোজাপথে প্রবাহিত না হয়ে উত্তর গোলার্ধে তার প্রবাহের ডানদিকে বেঁকে ও দক্ষিণ গোলার্ধে তার প্রবাহের বাঁদিকে বেঁকে চলাচল করে। মার্কিন আবহবিদ উইলিয়ম ফেরেল প্রথম এই বিষয়টি উল্লেখ করায় এটি ফেরেলের সূত্র নামে পরিচিত।

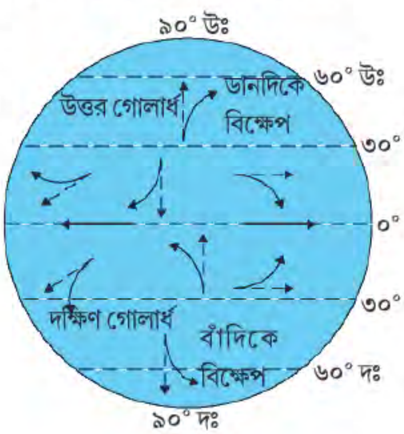

এঁকে ফেলো

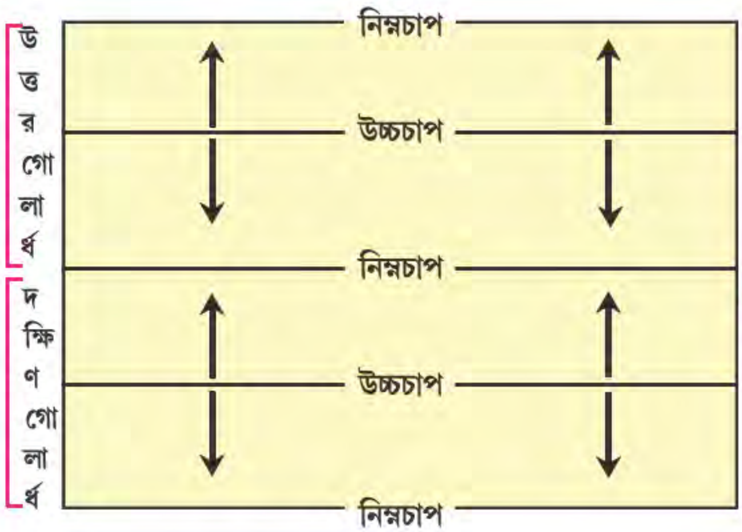

বায়ুপ্রবাহের সোজা পথ ⟶

- ফেরেলের সূত্র অনুসারে বায়ু কোন গোলার্ধে কোন দিকে প্রবাহিত হবে তির চিহ্ন দিয়ে দেখাও।

➢ পৃথিবী পৃষ্ঠের উপরিভাগ সব জায়গায় সমান নয়। অসমতল স্থলভাগের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হবার সময় ঘর্ষণজনিত বাধার কারণে বায়ুর গতিবেগ কমে যায়, দিক পরিবর্তন ঘটে। আবার সমুদ্রের ওপর বা মরু অঞ্চলের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হবার সময় ঘর্ষণের প্রভাব কম থাকায় বায়ুর গতিবেগ বেড়ে যায়।

বায়ু প্রবাহের নামকরণ :
বায়ু যেদিক থেকে প্রবাহিত হয় সেই দিক অনুসারে বায়ুর নামকরণ করা হয়।

● বর্ষাকালে আমাদের রাজ্যে যে বায়ুর প্রভাবে বৃষ্টি হয় সেই বায়ু কোন দিক থেকে প্রবাহিত হয়?

বাইস ব্যালট সূত্র

ডাচ আবহবিদ্ বাইস ব্যালট ১৮৫৭ সালে বায়ুচাপের পার্থক্য ও বায়ুপ্রবাহের মধ্যে সম্পর্কের উল্লেখ করেন। তাঁর মতে উত্তর গোলার্ধে বায়ু যে দিক থেকে প্রবাহিত হয় সেই দিকে পিছন ফিরে দাঁড়ালে ডানদিকে বায়ুর উচ্চচাপ ও বাঁদিকে নিম্নচাপ হয়। দক্ষিণ গোলার্ধে এর ঠিক বিপরীত অবস্থা দেখা যায়।

● মনে করো, তুমি দক্ষিণ গোলার্ধে বায়ুপ্রবাহের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছ। তোমার কোন দিকে বায়ুর চাপ কী রকম হবে, তা নীচের শূন্যস্থানে লিখে ফেলো।

নিয়ত বায়ুপ্রবাহ

সারাবছর ধরে নিয়মিতভাবে ভূপৃষ্ঠের সমান্তরালে একইদিকে প্রায় একই গতিবেগে প্রবাহিত বায়ু হলো নিয়ত বায়ু। নিয়ত বায়ু তিন ধরনের —

আয়ন বায়ুর পরিচয় : কর্কটীয় ও মকরীয় উচ্চচাপ বলয় থেকে সারাবছর ধরে প্রায় নিয়মিতভাবে নিরক্ষীয় নিম্নচাপ বলয়ের দিকে প্রবাহিত বায়ু হলো আয়ন বায়ু (**Trade wind**)।

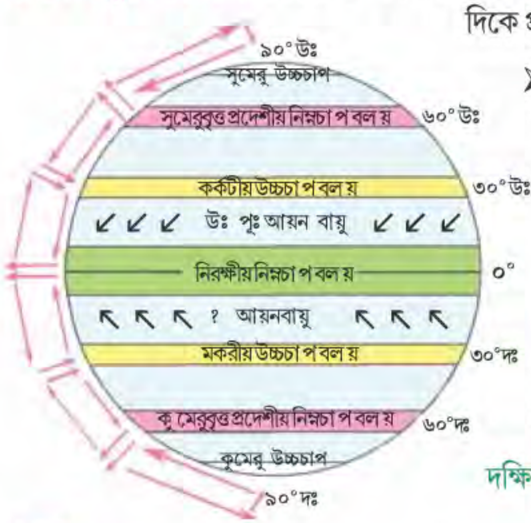

➢ উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধে ৫° থেকে ২৫° অক্ষাংশের মধ্যবর্তী অঞ্চলে এই বায়ু প্রবাহিত হয়।

➢ উত্তর গোলার্ধে আয়ন বায়ু কর্কটীয় উচ্চচাপ অঞ্চল থেকে নিরক্ষীয় নিম্নচাপ অঞ্চলের দিকে সোজা প্রবাহিত না হয়ে ফেরেলের সূত্র অনুসারে ডানদিকে বেঁকে প্রবাহিত হয়। এই বায়ু উত্তর-পূর্ব আয়ন বায়ু নামে পরিচিত। দক্ষিণ গোলার্ধে আয়ন বায়ু মকরীয় উচ্চচাপ বলয় থেকে নিরক্ষীয় নিম্নচাপ বলয়ের দিকে ফেরেলের সূত্র অনুসারে বাঁ দিকে বেঁকে প্রবাহিত হয়।

দক্ষিণ গোলার্ধে এই বায়ু কী নামে পরিচিত ?

➢ উত্তর গোলার্ধে স্থলভাগ বেশি থাকায় পাহাড়-পর্বত, ঘরবাড়ি, গাছপালায় বাধা পেয়ে আয়ন বায়ুর গতিবেগ কমে যায়। ঘণ্টায় প্রায় ১৬ কিমি বেগে এই বায়ু প্রবাহিত হয়। দক্ষিণ গোলার্ধে স্থলভাগের তুলনায় জলভাগ বেশি থাকায় ঘর্ষণ বলের প্রভাব কম। তাই এই গোলার্ধে বায়ু ঘণ্টায় প্রায় ২২-৩০ কিমি বেগে প্রবাহিত হয়।

অন্য নামে আয়নবায়ু

আয়ন বায়ুর ইংরাজি নাম Trade wind, যার আক্ষরিক অর্থ হলো **'বাণিজ্য বায়ু'**। আগেকার দিনে পালতোলা জাহাজ এই বায়ু দ্বারাই নির্দিষ্ট গতিপথে বাণিজ্য সামগ্রী নিয়ে চলাচল করত। তাই এই বায়ুর অপর নাম **'বাণিজ্য বায়ু'**।

ক্রান্তীয় অঞ্চলে মহাদেশের পশ্চিম দিকে পৃথিবীর অধিকাংশ মরুভূমির সৃষ্টি হয়েছে কেন?

দুই গোলার্ধে ক্রান্তীয় অঞ্চলের কম উষ্ণ স্থান থেকে তুলনায় বেশি উষ্ণ নিরক্ষীয় অঞ্চলের দিকে আয়নবায়ু প্রবাহিত হওয়ায় এর উষ্ণতা বেড়ে যায়। জলীয়বাষ্প ধারণের ক্ষমতা বাড়ে। ফলে এই বায়ু মহাদেশের পূর্ব উপকূলে বৃষ্টিপাত ঘটালেও পশ্চিমাংশে একেবারেই বৃষ্টিপাত হয়না। এই কারণে মহাদেশের পশ্চিমাংশে অধিকাংশ উষ্ণ মরুভূমির সৃষ্টি হয়েছে। যেমন—আফ্রিকার সাহারা (উত্তর গোলার্ধে), আফ্রিকার কালাহারি (দক্ষিণ গোলার্ধে)।

বিশেষ কথা

ITCZ (Inter Tropical Convergence Zone) বা আন্তঃক্রান্তীয় অভিসরণ অঞ্চল :

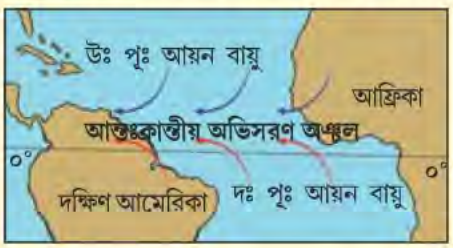

উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব আয়ন বায়ু নিরক্ষীয় অঞ্চলে মিলিত হয়। এই স্থানই আন্তঃক্রান্তীয় অভিসরণ অঞ্চল বা **ITCZ**। এই অঞ্চলের আরেক নাম নিরক্ষীয় শান্তবলয়।

পৃথিবীর তিনটি অংশ জুড়ে নিরক্ষীয় শান্ত বলয় অবস্থান করছে। সবচেয়ে বড়ো অংশটি ভারত মহাসাগর থেকে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। আরেকটি অংশ রয়েছে আফ্রিকার পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগরে। দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগরের ওপর শেষ অংশটি অবস্থান করছে।

পশ্চিমা বায়ু : কর্কটীয় ও মকরীয় উচ্চচাপ বলয় থেকে যথাক্রমে সুমেরুবৃত্ত ও কুমেরুবৃত্ত প্রদেশীয় নিম্নচাপ বলয়ের দিকে প্রবাহিত বায়ু হলো পশ্চিমা বায়ু (Westerlies)। পশ্চিম দিক থেকে চলাচল করায় এই বায়ুর নাম পশ্চিমা বায়ু। সাধারণত এই বায়ু আয়ন বায়ুর তুলনায় কিছুটা অনিয়মিত।

➢ উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধে ৩৫° থেকে ৬০° অক্ষরেখার মধ্যবর্তী অঞ্চলে পশ্চিমা বায়ু প্রবাহিত হয়।

➢ উত্তর গোলার্ধে এই বায়ু কর্কটীয় উচ্চচাপ বলয় থেকে সুমেরুবৃত্ত প্রদেশীয় নিম্নচাপ বলয়ের দিকে প্রবাহিত হবার সময় ফেরেলের সূত্র অনুসারে ডান দিকে বেঁকে দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে প্রবাহিত হয়। তাই এই বায়ুর নাম দক্ষিণ-পশ্চিম পশ্চিমা বায়ু। দক্ষিণ গোলার্ধে পশ্চিমা বায়ু মকরীয় উচ্চচাপ বলয় থেকে কুমেরুবৃত্ত প্রদেশীয় নিম্নচাপ বলয়ের দিকে প্রবাহিত হবার সময় ফেরেলের সূত্র অনুসারে বাঁ দিকে বেঁকে যায়।

➢ উত্তর গোলার্ধে পশ্চিমা বায়ুর গতিবেগ দক্ষিণ গোলার্ধের তুলনায় কম হয়।

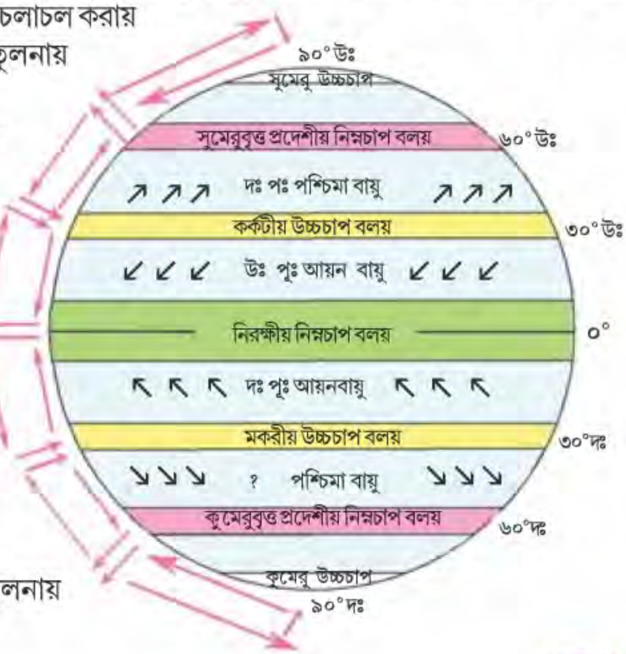

- দক্ষিণ গোলার্ধে পশ্চিমা বায়ু কোন দিক থেকে প্রবাহিত হয় এবং এই বায়ু কী নামে পরিচিত?
- দক্ষিণ গোলার্ধে পশ্চিমা বায়ুর গতিবেগ বেশি কেন?

পশ্চিমা বায়ুর প্রবাহ পথে মহাদেশের পূর্ব ও মধ্য অংশে পৃথিবীর অধিকাংশ নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমির সৃষ্টি হয়েছে কেন?

➢ শীতকালে জলভাগ স্থলভাগের তুলনায় বেশি উষ্ণ থাকে। এই সময় জলীয়বাষ্পপূর্ণ পশ্চিমা বায়ু পশ্চিম থেকে পূর্বে প্রবাহের সময় মহাদেশের পশ্চিমাংশে যথেষ্ট পরিমাণে বৃষ্টিপাত ঘটায়। যেমন—ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী অঞ্চল। কিন্তু মহাদেশের পূর্বদিকে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ক্রমশ কমতে থাকে। এই কারণে পশ্চিমা বায়ুর প্রবাহ পথে মহাদেশগুলোর পূর্ব ও মধ্য অংশে নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমির সৃষ্টি হয়েছে। যেমন—মধ্যএশিয়ার স্তেপ তৃণভূমি অঞ্চল।

বহুরূপী পশ্চিমা

গর্জনশীল চল্লিশা (Roaring Forties) : ৪০° দক্ষিণ অক্ষরেখা বরাবর পশ্চিম থেকে পূর্বে সশব্দে প্রবাহিত পশ্চিমা বায়ু।

ক্রোধোন্মত্ত পঞ্চাশ (Howling Fifties) : ৫০° দক্ষিণ অক্ষরেখা বরাবর প্রচণ্ড গতিতে প্রবাহিত উন্মত্ত পশ্চিমা বায়ু।

তীক্ষ্ণ চিৎকারকারী ষাট (Screaming Sixties) : ৬০° দক্ষিণ অক্ষরেখা বরাবর তীক্ষ্ণ শব্দে প্রবাহিত পশ্চিমা বায়ু।

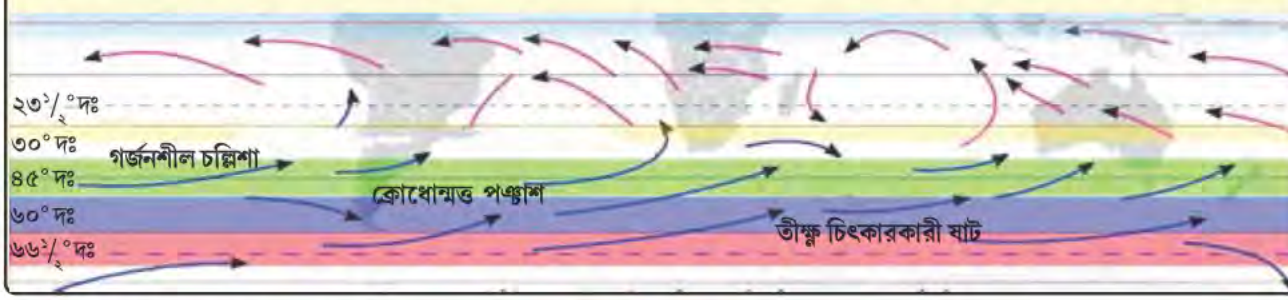

মেরু বায়ু : দুই গোলার্ধে মেরুদেশীয় উচ্চচাপ বলয় থেকে শুষ্ক ও শীতল মেরু বায়ু (Polar Wind) মেরুবৃত্ত প্রদেশীয় নিম্নচাপ বলয়ের দিকে সারাবছর ধরে প্রবাহিত হয়।

➢ উত্তর গোলার্ধে ৭০°- ৮০° অক্ষরেখার মধ্যবর্তী অঞ্চলে এই বায়ু প্রবাহিত হয়।

➢ উত্তর গোলার্ধে সুমেরু উচ্চচাপ বলয় থেকে মেরু বায়ু ডানদিকে বেঁকে উত্তর-পূর্ব মেরু বায়ু হিসাবে সুমেরুবৃত্ত প্রদেশীয় নিম্নচাপ বলয়ের দিকে প্রবাহিত হয়। দক্ষিণ গোলার্ধে মেরু বায়ু কুমেরু উচ্চচাপ বলয় থেকে কুমেরুবৃত্ত প্রদেশীয় নিম্নচাপ বলয়ের দিকে প্রবাহিত হয়।

➢ মেরুবায়ুর কারণে দুই গোলার্ধে মেরুবৃত্তীয় অঞ্চলে মাঝে মাঝে তুষারঝড় হয়। যেমন রাশিয়ার সাইবেরিয়া।

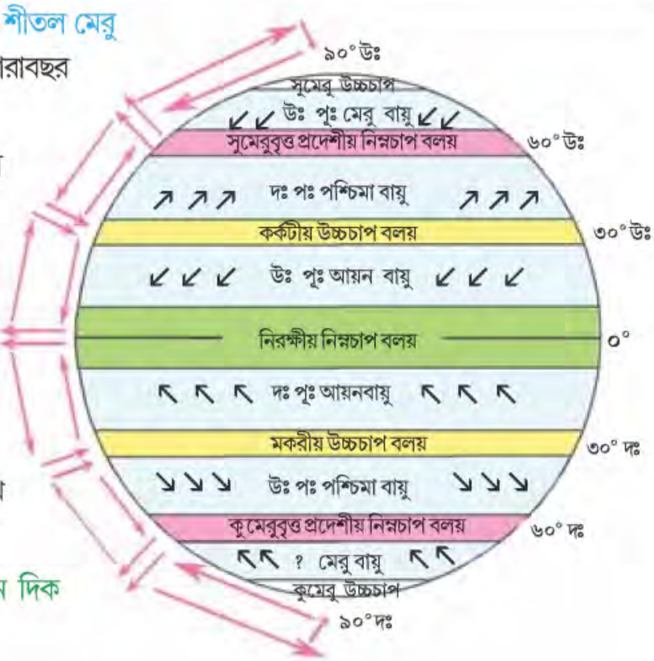

- ফেরেলের সূত্র অনুসারে দক্ষিণ গোলার্ধে মেরু বায়ু কোন দিক থেকে প্রবাহিত হয় এবং কী নামে পরিচিত?
- মেরু বায়ু শীতল হয় কেন?

পৃথিবী পৃষ্ঠে প্রবাহিত নিয়তবায়ু

- কোন তির চিহ্ন কোন বায়ুর গতিপথকে নির্দেশ করছে তার নাম লিখে ফেলো।

মগজাস্ত্র !

- কোন বায়ুর প্রভাবে এশিয়ার চিন, আফ্রিকার ইথিওপিয়া, উত্তর আমেরিকার মেক্সিকোতে বৃষ্টিপাত হয়?
- ভেবে বলোতো নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের অন্তর্গত কোন স্থান 'ক' (নিউইয়র্ক) থেকে অপর একটি স্থান 'খ' (লন্ডন) -তে যেতে প্লেনের পাইলট কোন বায়ুর পথ অনুসরণ করবেন?

স্থানগুলি কোন গোলার্ধ ও কোন নিয়ত বায়ু প্রবাহের অন্তর্ভুক্ত লিখে ফেলো —

স্থান	গোলার্ধ	বায়ুর নাম
বাল্টিক সাগর		
জার্মানি		
বলিভিয়া		
কিউবা		
গ্রিনল্যান্ড		
বোফোর্ট সাগর		

- সঠিক বায়ুর নাম লিখে নীচের ফাঁকা জায়গা পূরণ করো। '→' চিহ্ন দিয়ে বায়ুপ্রবাহের দিক নির্দেশ করো। নীচের নমুনাটি দেখে নাও।

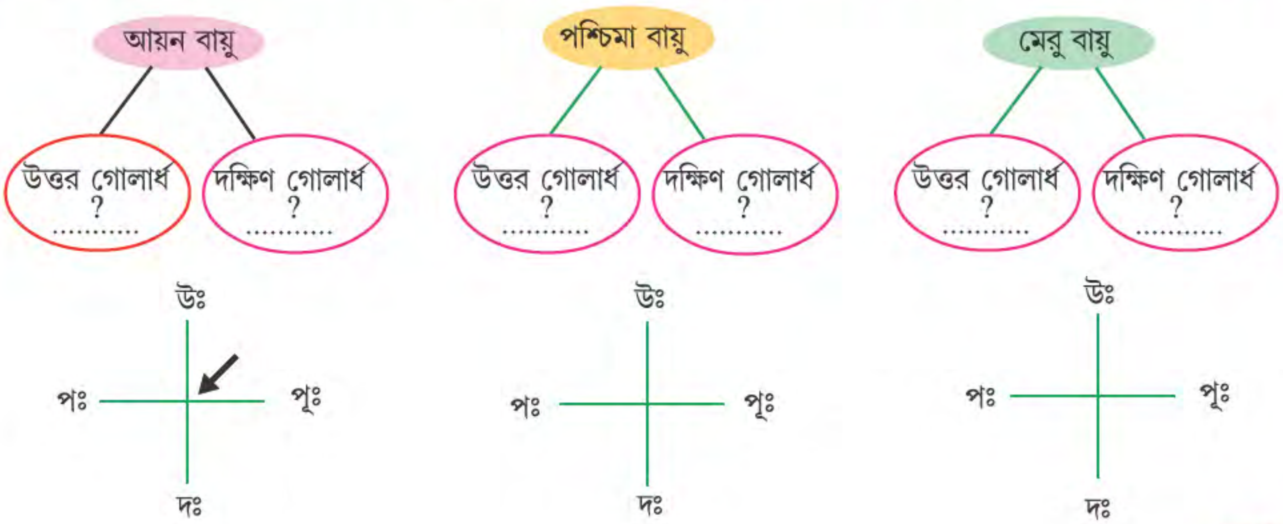

বায়ুচাপ বলয়ের অবস্থান পরিবর্তন

জলবিষুব ও মহাবিষুবের দিন বায়ুচাপ বলয়গুলো নিজের অবস্থানে থাকে। সূর্যের উত্তরায়ণের এবং দক্ষিণায়নের সময় নিয়ত বায়ুচাপ বলয়গুলো ৫° থেকে ১০° অক্ষরেখা পর্যন্ত যথাক্রমে উত্তর ও দক্ষিণ দিকে সরে যায়। একে বলে বায়ুচাপ বলয়ের অবস্থান পরিবর্তন। কর্কটসংক্রান্তির দিন (২১ জুন) ও মকর সংক্রান্তির দিন (২২ ডিসেম্বর) সূর্যরশ্মি যথাক্রমে কর্কটক্রান্তি রেখা ও মকরক্রান্তি রেখায় লম্বভাবে পড়ে।

বায়ুচাপ বলয়গুলোর অবস্থান পরিবর্তন দুই গোলার্ধের ৩০°থেকে৪০° অক্ষরেখার মাঝের স্থানগুলোর জলবায়ুর ওপর বিশেষ প্রভাব ফেলে। এই অঞ্চলগুলো গ্রীষ্মকালে আয়নবায়ু আবার শীতকালে পশ্চিমা বায়ুর দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়।

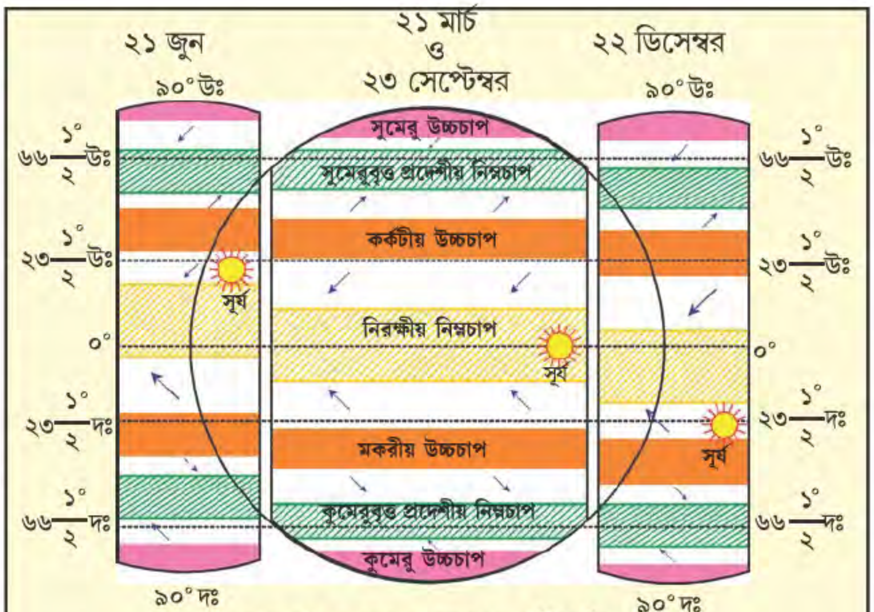

বায়ুচাপ বলয়ের অবস্থান পরিবর্তন

বায়ুচাপ বলয়ের অবস্থান পরিবর্তন সহজ করে বুঝে নাও —

গ্রীষ্মকালে আয়ন বায়ুর প্রভাব ----→ আয়ন বায়ু

➢ সূর্যের উত্তরায়নের সময় কর্কটীয় উচ্চচাপ বলয়টি উত্তর দিকে সরে যায়। ফলে গ্রীষ্মকালে স্থলভাগ থেকে আগত উত্তর-পূর্ব আয়ন বায়ুর প্রভাবে ভূমধ্যসাগরের সন্নিহিত দেশগুলোতে বৃষ্টিপাত প্রায় হয় না।

শীতকালে পশ্চিমা বায়ুর প্রভাব → পশ্চিমা বায়ু

➢ আবার সূর্যের দক্ষিণায়নের সময় কর্কটীয় উচ্চচাপ বলয়টি দক্ষিণ দিকে সরে যাওয়ায় ভূমধ্যসাগরের উপকূলবর্তী অঞ্চলে দক্ষিণ পশ্চিম পশ্চিমা বায়ু প্রবাহিত হয়। ফলে শীতকালে এই অংশে জলভাগের ওপর দিয়ে বয়ে আসা দক্ষিণ-পশ্চিম পশ্চিমা বায়ুর প্রভাবে যথেষ্ট বৃষ্টিপাত হয়।

- পোর্তুগাল, স্পেন, ইতালি ও ফ্রান্সে কোন বায়ুর প্রভাবে কোন ঋতুতে বৃষ্টিপাত হয়?

সাময়িক বায়ু

➢ বছরের একটা নির্দিষ্ট ঋতুতে কিংবা দিন ও রাতের একটা নির্দিষ্ট সময়ে প্রবাহিত বায়ু হলো সাময়িক বায়ু (Periodic Wind)। এই বায়ু নিয়ত বায়ুর মতো সারাবছর ধরে নিয়মিতভাবে চলাচল করে না।

বিকেল-সন্ধের দিকে সমুদ্র বা নদীর ধারের আবহাওয়া বেশ আরামদায়ক হয়। এই সময় সমুদ্র থেকে স্থলভাগের দিকে ঠান্ডা বাতাস বয়। এই বাতাসই হলো সমুদ্রবায়ু (Sea Breeze)। স্থলভাগ ও জলভাগের ওপরের বায়ুর মধ্যে তাপমাত্রা ও চাপের পার্থক্যই এই বায়ুর উৎপত্তির কারণ। দিনের বেলা সূর্যের তাপ শোষণ করে স্থলভাগ জলভাগের তুলনায় তাড়াতাড়ি উষ্ণ হয়ে ওঠে। স্থলভাগের ওপরের হালকা বায়ু প্রসারিত হয়ে ওপরে উঠে গেলে সেখানে নিম্নচাপ সৃষ্টি হয়। অপরদিকে সমুদ্রের জল স্থলভাগের তুলনায় শীতল হওয়ায় সেখানকার বাতাসে তুলনামূলক উচ্চচাপ সৃষ্টি হয়। ফলে দিনের বেলা সমুদ্র থেকে স্থলভাগের দিকে অপেক্ষাকৃত শীতল আরামদায়ক সমুদ্রবায়ু প্রবাহিত হয়। সূর্য ওঠার ঘণ্টা চারেক পর থেকেই এই বায়ু বইতে শুরু করে এবং বিকেল-সন্ধের দিকে এর গতিবেগ বেড়ে যায়।

সমুদ্রবায়ু

স্থলবায়ু

সূর্যাস্তের পর থেকেই স্থলভাগের ওপরের বায়ু তাপ বিকিরণ করে রাতের দিকে বেশ শীতল হয়ে পড়ে। কিন্তু সমুদ্রের ওপরের বায়ু তখনও স্থলভাগের তুলনায় বেশি উষ্ণ থাকে। স্থলভাগের ওপর বায়ুর উচ্চচাপ ও সমুদ্রের ওপর বায়ুর নিম্নচাপ সৃষ্টি হয়। ফলে রাতের বেলা স্থলভাগ থেকে সমুদ্রের দিকে বায়ু প্রবাহিত হতে থাকে। এই বায়ু হলো স্থলবায়ু (Land Breeze)। ভোররাতের দিকে এই বায়ুর গতিবেগ বেড়ে যায়।

সমুদ্রবায়ু - স্থলবায়ুর বিশেষত্ব

- এই বায়ুপ্রবাহ একটি দৈনন্দিন ঘটনা।
- প্রতিদিন একটা নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে প্রবাহিত হয়।
- সাধারণত এই দুই বায়ুর প্রভাব উপকূল থেকে প্রায় ১৫০ কিমি অঞ্চলের মধ্যে দেখা যায়।

নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজার চেষ্টা করো

- কোন বায়ু উপকূলবর্তী অঞ্চলে বেশি বৃষ্টিপাত ঘটায়?
- ভোরবেলা পালতোলা নৌকা কোন বায়ুর প্রভাবে সমুদ্রে বা নদীতে চলবে?
- বিকেলের দিকে সমুদ্র বা নদীর পাড়ে বসলে কোন দিক থেকে ঠান্ডা হাওয়া বইবে?

➢ দৈনিক তাপমাত্রার পার্থক্যের কারণে যেমন সমুদ্র ও স্থলবায়ুর সৃষ্টি হয় তেমনি দুটো বিপরীত ঋতুতে বায়ুর উষ্ণতা ও চাপের পার্থক্যই হলো মৌসুমি বায়ুর সৃষ্টির কারণ। গ্রীষ্মকালকে দিন আর শীতকালকে রাত ধরলে হলে এই দুই ঋতুর পার্থক্যের জন্যই মৌসুমি বায়ু প্রবাহিত হয়। তাই এই বায়ুকে সমুদ্রবায়ু ও স্থলবায়ুর বৃহৎ সংস্করণ বলে।

ভারতীয় উপমহাদেশ এবং দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কিছু অঞ্চলে মৌসুমি বায়ু প্রবাহিত হয়। এই অঞ্চলগুলো ভারত মাহাসাগরের উপকূলে অবস্থিত। গ্রীষ্মকালে মহাদেশের অভ্যন্তরভাগ সূর্যের তাপে দ্রুত উত্তপ্ত হয়ে উঠলে সেখানে নিম্নচাপ সৃষ্টি হয়। এইসময় ভারত মহাসাগরের জল তুলনায় শীতল থাকায় সেখানকার বায়ুতে উচ্চচাপ তৈরি হয়। ফলে গ্রীষ্মকালে জলীয়বাষ্পপূর্ণ বায়ু সমুদ্র থেকে স্থলভাগের দিকে প্রবাহিত হয়। এই বায়ু হলো গ্রীষ্মকালীন মৌসুমিবায়ু।

গ্রীষ্ম মৌসুমি

শীত মৌসুমি

শীতকালে মহাদেশের অভ্যন্তরভাগ তাড়াতাড়ি তাপ বিকিরণ করে শীতল হয়ে পড়ে এবং সেখানে বায়ুর উচ্চচাপ তৈরি হয়। এইসময় ভারত মহাসাগরের জল স্থলভাগের তুলনায় উষ্ণ থাকায় সেখানে বায়ুর নিম্নচাপ সৃষ্টি হয়। ফলে শীতকালে স্থলভাগ থেকে ঠান্ডা শুষ্ক বাতাস সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত হয়। এই বায়ু হলো শীতকালীন মৌসুমি বায়ু।

- শীতকালীন মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে বৃষ্টি প্রায় হয় না কেন?
- মৌসুমি বায়ুকে সাময়িক বায়ু বলার কারণ কী?

❍ আমরা জানি উচ্চতা বাড়ার সাথে সাথে উষ্ণতা কমে। তবে পর্বতের উঁচু অংশে অনেক সময় উপত্যকার তুলনায় বেশি জনবসতি গড়ে উঠতে দেখা যায়। কেন এমন হয় জানো?

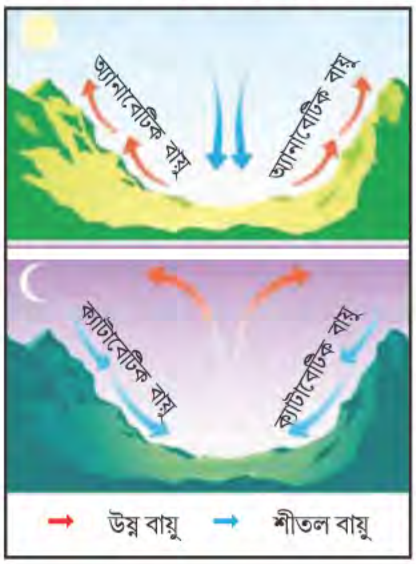

দিনের বেলা সূর্যের তাপে পর্বতের ঢালের ওপরের বায়ু যে পরিমাণ উষ্ণ হয়, উপত্যকার মাঝের অংশের বায়ু ততটা উষ্ণ হয় না। ফলে এই উষ্ণ ও হালকা বায়ু পর্বতের ঢাল বরাবর নিচ থেকে উপরের দিকে উঠতে থাকে। এই বায়ু হলো উপত্যকা বায়ু যার আরেক নাম অ্যানাবেটিক বায়ু (Anabatic Wind)। এই সময় উপত্যকায় শীতল ও উচ্চচাপযুক্ত বায়ু অবস্থান করে।

আবার রাত্রিবেলায় তাড়াতাড়ি তাপ বিকিরণ করে পর্বতের ঢালের উপরিস্থিত বায়ু শীতল হয়ে পড়ে। এই উচ্চচাপের ভারী বায়ু পর্বতের ঢাল বরাবর ওপর থেকে নীচের দিকে নামতে শুরু করে এবং উপত্যকায় অবস্থান করে। এই বায়ু হলো পার্বত্য বায়ু যার আরেক নাম ক্যাটাবেটিক বায়ু (Katabatic Wind)।

- হিমাচল প্রদেশের কুলু ও কাংড়া উপত্যকার মাঝের অংশের তুলনায় পর্বতের উঁচু ঢালে জনবসতি কিছুটা বেশি দেখা যায় কেন?

স্থানীয় বায়ু

পৃথিবীর নানা অঞ্চলে বছরের বিভিন্ন সময়ে স্থানীয় কারণে প্রবাহিত বায়ু হলো স্থানীয় বায়ু (Local Wind)। যে অঞ্চল থেকে এই বায়ু প্রবাহিত হয় সেখানকার স্থানীয় ভাষার কোনো নামে এই বায়ু পরিচিত। ভারতে প্রবাহিত স্থানীয় বায়ু হলো লু ও আঁধি। ভূমধ্যসাগর সন্নিহিত অঞ্চলে পৃথিবীর সবথেকে বেশি সংখ্যক স্থানীয় বায়ুর প্রবাহ এবং প্রভাব দেখা যায়। রকি পার্বত্য অঞ্চলের উষ্ণ বায়ু চিনুক, আড্রিয়াটিক সাগরের উপকূলবর্তী অঞ্চলের শীতল বায়ু বোরো, লিবিয়া মরুভূমির উষ্ণ ও ধুলিপূর্ণ বায়ু সিরক্কো স্থানীয় বায়ুর উদাহরণ।

আকস্মিক বায়ু

পৃথিবী-পৃষ্ঠের স্বল্প পরিসর স্থানে চাপের পার্থক্যের কারণে হঠাৎ করে অনিয়মিতভাবে প্রবাহিত বায়ু হলো আকস্মিক বায়ু (Variable Wind)।

➢ কোনো অল্প পরিসর জায়গায় বায়ুর চাপ হঠাৎ কমে গেলে কেন্দ্রে নিম্নচাপ তৈরি হয় এবং বাইরের দিকে তুলনামূলক উচ্চচাপ থাকে। এই অবস্থায় উচ্চচাপ অঞ্চল থেকে বায়ু ঐ নিম্নচাপ কেন্দ্রের দিকে প্রবল গতিতে কুন্ডলাকারে পাক খেতে খেতে ছুটে আসে। একেই বলে ঘূর্ণবাত (Cyclone)। উত্তর গোলার্ধে এই বায়ু ঘড়ির কাঁটার বিপরীতে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে ঘড়ির কাঁটার দিকে প্রবাহিত হয়। ঘূর্ণবাতের প্রভাবে বায়ুর গতিবেগ বেড়ে ঘণ্টায় প্রায় ১৬০ কিমি পর্যন্ত হয়। ক্রান্তীয় ও নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে ঘূর্ণবাত সৃষ্টি হতে দেখা যায়। ক্রান্তীয় অঞ্চলের ঘূর্ণবাত বিধ্বংসী প্রকৃতির। এর প্রভাবে ভীষণ ঝড়-বৃষ্টি হয়। নাতিশীতোষ্ণ ঘূর্ণবাতের ধ্বংস করার ক্ষমতা তুলনায় অনেকটাই কম। এর প্রভাবে দীর্ঘ সময় ধরে হালকা ঝিরঝিরে বৃষ্টি হয়।

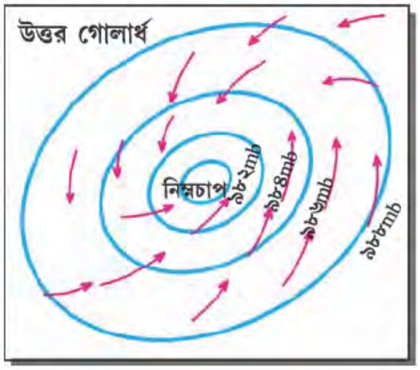

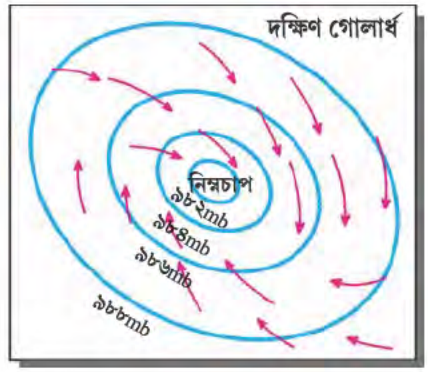

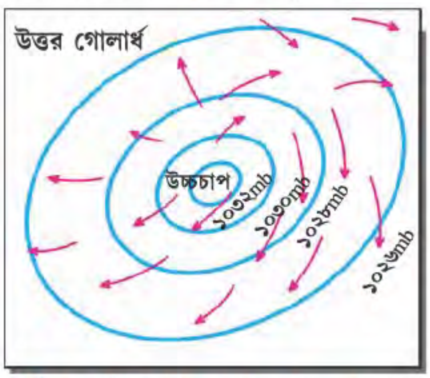

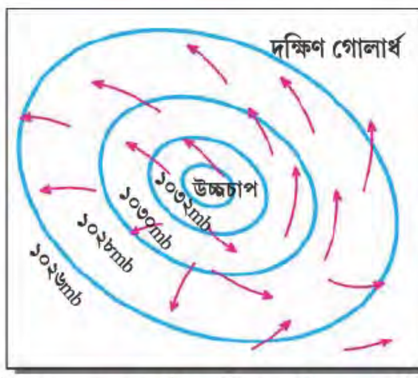

➢ কোনো জায়গায় বায়ুর উষ্ণতা হঠাৎ করে কমে গেলে বায়ুর চাপ বেড়ে যায়। তখন কেন্দ্রে থাকে উচ্চচাপ আর বাইরের দিকে সৃষ্টি হয় নিম্নচাপ। এই অবস্থায় বায়ু কেন্দ্র থেকে বাইরের দিকে বেরিয়ে যায়। যেহেতু এটি ঘূর্ণবাতের সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থা, তাই এর নাম প্রতীপ ঘূর্ণবাত (Anti Cyclone)। সাধারণত উচ্চ অক্ষাংশে এই প্রতীপ ঘূর্ণবাতের সৃষ্টি হয়। প্রতীপ ঘূর্ণবাতে বায়ুর গতিবেগ ঘূর্ণবাতের তুলনায় অনেকটাই কম। প্রতীপ ঘূর্ণবাত সাধারণত মেঘমুক্ত, শুষ্ক ও রোদ ঝলমলে আবহাওয়া নির্দেশ করে।

- ওপরের ছবি দুটো দেখে বলো উত্তর গোলার্ধ ও দক্ষিণ গোলার্ধে প্রতীপ ঘূর্ণবাতের বায়ুর অভিমুখ কোন দিকে?
- নীচের ছবি দুটো দেখে বলোতো কোনটা ঘূর্ণবাত আর কোনটা প্রতীপ ঘূর্ণবাতের প্রভাবকে বোঝাচ্ছে?

ঝড়ের ডায়েরি: পিলিন-পথে পাঁচ মূর্তি

পিছিয়েই যাচ্ছে বর্ষা, সঙ্গে ঠেলা নিম্নচাপ

তামিলনাড়ু-অন্ধ্রপ্রদেশ হয়ে নিম্নচাপের যাওয়ার কথা ছিল আরব সাগরের দিকে

কিন্তু উত্তর-পূর্ব দিক থেকে আসা হাওয়ার বাধায় তা চলে আসে অন্ধ্র উপকূলে

ফলে ওড়িশা, বাংলা হয়ে অসম পর্যন্ত তৈরি হয় নিম্নচাপ অক্ষরেখা

গতিবেগ

১৯৯৯
সুপার সাইক্লোন
ওড়িশা
২৬০কিমি/ঘণ্টা

২০০৫
হ্যারিকেন
ক্যাটরিনা
আমেরিকা
২৮০কিমি/ঘণ্টা

২০১৩
সাইক্লোন পিলিন
ওড়িশা
২১৫কিমি/ঘণ্টা

মৃত ১০ হাজার, পৃথিবীটা যেন ধ্বংস হয়ে গিয়েছে

ভরা ভাদ্রে কালবৈশাখী, জল থইথই মহানগর

- অক্টোবর মাসেও আকাশে কালো মেঘ দেখা যাচ্ছে! তোমার কি মনে হয় বর্ষার সময়কাল ক্রমশ পিছিয়ে যাচ্ছে?
- আয়লা, থানে, পিলিন/ফাইলিন, হেলেন, লহর, হাইয়ান— ঘূর্ণিঝড়ের নামকরণ কীভাবে হয় জানার চেষ্টা করো।
- আমাদের রাজ্য বা দেশের সাম্প্রতিক ঘূর্ণিঝড়ের তথ্য সংগ্রহ করে প্রতিবেদন তৈরি করো।

মেঘ-বৃষ্টি

আজ ছুটির দিন। জানলাটা খুলতেই শরতের আকাশটা চোখে পড়ল ইন্দ্রজিতের। নীল আকাশে মেঘগুলো পেঁজা তুলোর মতো ভাসছে। মেঘের নানারকম নকশা কল্পনা করতে করতে ইন্দ্রজিৎ মাঠের দিকে রওনা দিল। হাঁটতে হাঁটতে ওর মনে হলো আকাশে সবসময় তো একই রকম মেঘ দেখা যায় না! কখনও ঘন কালো মেঘে সারা আকাশ ঢেকে যায়। আবার কখনও পাতলা চাদরের মতো মেঘ আকাশে দেখা যায়।

মেঘেদের পরিবার

বেশি উচ্চতার মেঘ (গড় নিম্নতম উচ্চতা ২০,০০০ ফুট)

সিরাস

সিরাস— সাদা রঙের স্বচ্ছ এই মেঘ দেখতে অনেকটা হালকা পালকের মতো। এই মেঘ সাধারণত পরিষ্কার আবহাওয়াকে নির্দেশ করে। সারা আকাশ এই মেঘে ঢাকা থাকলেও তার মধ্য দিয়ে সূর্যকে দেখা যায়। এরা যখন একে অপরের সাথে মিশে বন্ধনী তৈরি করে, তখন আবহাওয়া খারাপ হয়ে পড়ে।

সিরোস্ট্র্যাটাস

সিরোস্ট্র্যাটাস—পাতলা সাদা চাদরের মতো এই মেঘে ঢাকা আকাশ দুধের মতো সাদা দেখায়। অনেক সময় এই মেঘ চাঁদ আর সূর্যের চারপাশে বলয়ের আকারে অবস্থান করে।

সিরোকিউমুলাস

সিরোকিউমুলাস—পেঁজা তুলোর মতো এই মেঘে ঢাকা আকাশ দেখতে অনেকটা ম্যাকারেল মাছের পিঠের মতো। তাই এই মেঘে আকাশ ছেয়ে গেলে তাকে ম্যাকারেল আকাশ (Mackerel Sky) বলে। সাধারণত এই মেঘ পরিষ্কার আবহাওয়াকে নির্দেশ করে।

মাঝারি উচ্চতার মেঘ(গড় উচ্চতা ৬,৫০০ ফুট — ২০,০০০ ফুট)

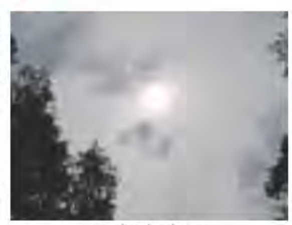

অল্টোস্ট্র্যাটাস

অল্টোস্ট্র্যাটাস—ধূসর থেকে নীল রঙের এই মেঘ দেখতে অনেকটা তন্তুর মতো। এই মেঘের মধ্যে দিয়ে সূর্যকে অনেকটা অনুজ্জ্বল দেখায়। সাধারণত এই মেঘ একটানা বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দেয়।

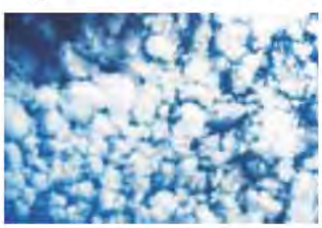

অল্টোকিউমুলাস

অল্টোকিউমুলাস—চ্যাপ্টা, গোলাকার, সাদা থেকে ধূসর রঙের এই মেঘ আকাশে ঢেউ-এর মতো অবস্থান করে। এর ফাঁকে ফাঁকে নীল আকাশ দেখা যায়।

নিম্ন উচ্চতার মেঘ (গড় সর্বোচ্চ উচ্চতা ৬,৫০০ ফুট)

স্ট্র্যাটোকিউমুলাস

স্ট্র্যাটোকিউমুলাস— এই মেঘ দেখতে অনেকটা স্তূপের মতো ও স্তরে স্তরে সাজানো থাকে। অনেক সময় দেখে মনে হয় স্তরগুলো যেন গড়িয়ে চলেছে। তাই এর আরেক নাম Bumpy Cloud।

স্ট্র্যাটাস

স্ট্র্যাটাস— সাদা থেকে ধূসর রঙের এই মেঘ সারা আকাশকে কুয়াশার মতো ঢেকে রাখে। পাহাড়ে উঁচু অংশে এই মেঘ জমলে পর্বতারোহী ও বিমান চালকদের পক্ষে খুব অসুবিধা হয়। এই মেঘে মাঝে মাঝে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হয়।

নিম্বোস্ট্র্যাটাস

নিম্বোস্ট্র্যাটাস—ঘন, পুরু, ধূসর থেকে কালো রঙের এই মেঘ খারাপ আবহাওয়াকে নির্দেশ করে। এই মেঘের কোনো নির্দিষ্ট আকার থাকে না, একটানা বৃষ্টিপাত হয়।

উল্লম্ব মেঘ (গড় নিম্নতম উচ্চতা ১,৬০০ ফুট)

কিউমুলাস

কিউমুলাস — পুরু, ঘন এই মেঘের উল্লম্ব বিস্তার দেখা যায়। উপরিভাগের আকার অনেকটা ফুলকপির মতো হলেও তলদেশ সমতল। এই মেঘের শীর্ষদেশ বেশ উঁচু, নিম্নাংশের রং কালো হলেও উপরিভাগের রং সাদা। সাধারণত পরিষ্কার আবহাওয়া নির্দেশ করে।

কিউমুলোনিম্বাস

কিউমুলোনিম্বাস — অনেকটা গম্বুজের মতো দেখতে এই মেঘ সাদা-ধূসর ও কালো রঙের হয়। সাধারণত ভূপৃষ্ঠ সংলগ্ন বায়ুস্তর থেকে প্রায় ১২০০০ ফুট পর্যন্ত এই মেঘের উল্লম্ব বিস্তার দেখা যায়। ওপরদিক চ্যাপ্টা ও তলদেশ প্রায় সমতল। কিউমুলোনিম্বাস মেঘে বজ্রপাতসহ ভীষণ ঝড় বৃষ্টি হয়। তাই এর আরেক নাম বজ্রমেঘ (Thunder Cloud)। অনেকসময় এই মেঘ থেকে শিলাবৃষ্টি হতেও দেখা যায়।

একনজরে মেঘেদের পুরো পরিবার

● **মেঘের সঙ্গে আলাপচারিতা :** যে সব মেঘেদের কথা তোমরা জানলে তাদের আকাশে কবে দেখতে পেলে, তারিখ দিয়ে খাতায় লিখে রাখো।

মেঘের সৃষ্টি

সূর্যের তাপে সমুদ্র, নদী, পুকুরের জল উত্তপ্ত হয়ে বাষ্পে পরিণত হয়ে বায়ুতে মেশে। এছাড়াও গাছপালার প্রস্বেদন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জলীয়বাষ্প বাতাসে যুক্ত হয়। এই জলীয়বাষ্পযুক্ত বায়ু সাধারণ বায়ু অপেক্ষা হালকা হয় এবং সহজে ওপরের দিকে উঠে প্রসারিত হয়। ওপরের শীতল বায়ুর সংস্পর্শে এসে এই জলীয়বাষ্পযুক্ত বাতাস তাড়াতাড়ি শীতল হয়। বায়ু যত শীতল হয় তার জলীয়বাষ্প ধারন ক্ষমতা তত কমে যায়। ধীরে ধীরে ঐ আর্দ্র বায়ুর তাপমাত্রা শিশিরাঙ্কে এসে পৌঁছায় এবং বায়ু সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে। এই সম্পৃক্ত বায়ু আরো শীতল হলে জলীয়বাষ্প ঘনীভূত হয়ে ছোটো ছোটো জলকণায় পরিণত হয়। এই জলকণা বায়ুতে ভাসমান ধূলিকণা, লবণকণা, নানাধরনের কঠিন কণিকাকে অবলম্বন করে মেঘ হিসাবে ভেসে বেড়ায়। সাধারণত মেঘের জলকণাগুলোর ব্যাস হয় ০.০২ মিমি। বায়ুমণ্ডলের ট্রপোস্ফিয়ারেই মেঘের সৃষ্টি হয়।

হাতে- কলমে

○ একটা কেটলি বা পাত্রে জল নিয়ে গ্যাস বা উনুনের ওপর বসানোর কিছুক্ষণ পর দেখা যাবে কেটলি বা পাত্রটার মুখ দিয়ে সাদা রঙের ধোঁয়া বের হচ্ছে।

এই ধোঁয়া আসলে কী?

○ একটা গ্লাসে কয়েক টুকরো বরফ রাখো। কিছুক্ষণ বাদে দেখবে গ্লাসের গায়ে বিন্দু বিন্দু জলকণা দেখা যাচ্ছে বা গ্লাসটা ধরলে হাতে জল লাগছে। কারণ গ্লাসের চারপাশের বাতাস ঠান্ডা গ্লাসের সংস্পর্শে এসে শীতল হয়ে ওঠে এবং জলীয়বাষ্প জলবিন্দুতে পরিণত হয়।

এই ঘটনা কোন প্রক্রিয়াকে নির্দেশ করে?

বিশেষ কথা

- জলের বাষ্পে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়া হলো **বাষ্পীভবন**।
- কোনো নির্দিষ্ট উষ্ণতায় নির্দিষ্ট পরিমাণ বায়ু যতটা পরিমাণ জলীয়বাষ্প ধারণ করতে পারে সেই পরিমাণ জলীয় বাষ্প থাকলে ওই বায়ু **সম্পৃক্তবায়ু**।
- যে তাপমাত্রায় বায়ু সম্পৃক্ত হয় তাই হলো ওই বায়ুর **শিশিরাঙ্ক**।
- জলীয়বাষ্পের জলকণায় পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়া হলো **ঘনীভবন**।

○ পাশের ছবির মতো একটা কাঁচের প্লেট ও জারের মধ্যে সমপরিমাণ জল নিয়ে খোলা জায়গায় রাখো। দু-তিন দিন বাদে জলের পরিমাণগত কী পার্থক্য দেখা যাবে এবং কেন?

নিজের হাতে তৈরি মেঘ!

বানাতে লাগবে— এক লিটারের প্লাস্টিকের বোতল, ফোটানো নয় এমন গরম জল, দেশলাই।

- বোতলে এমন ভাবে গরম জল ঢালো যাতে বোতলটির তলার অংশ জলপূর্ণ থাকে।

- একটা জ্বলন্ত দেশলাই কাঠি বোতলের মধ্যে ঢুকিয়ে দাও এবং লক্ষ রাখো যাতে পুরো বোতলটা ধোঁয়ায় ভরে যায়।
- এবার বোতলের মুখটা বন্ধ করে দাও।
- বোতলটাকে হাত দিয়ে বেশ কয়েকবার চাপ দাও।

চাপ ছেড়ে দিলে দেখা যাবে বোতলের মধ্যে তুমিই তৈরি করে ফেলেছ মেঘ!

অধঃক্ষেপণ

➢ পৃথিবীর অভিকর্ষের টানে বায়ুমণ্ডল থেকে জলকণা বা বরফকণা (তরল বা কঠিন অবস্থায়) ভূপৃষ্ঠে নেমে এলে তাকে বলে অধঃক্ষেপণ (Precipitation)।

আমাদের সবচেয়ে পরিচিত অধঃক্ষেপন হলো বৃষ্টিপাত। আকাশে ভেসে থাকা মেঘ হলো আসলে ধূলিকণাকে আশ্রয় করে থাকা অসংখ্য ছোটো ছোটো জলকণার সমষ্টি। এই মেঘ ক্রমশ ওপরের দিকে উঠতে শুরু করলে শীতল বায়ুর সংস্পর্শে আসে ও আরো ঘনীভূত হয়। এভাবে ছোটো ছোটো জলকণাগুলো পরস্পর যুক্ত হয়ে বড়ো জলকণায় পরিণত হয়। তুলনায় বড়ো জলকণাগুলো বেশি ভারী হওয়ায় বাতাসে ভেসে থাকতে পারে না। তখন পৃথিবীর অভিকর্ষের টানে বৃষ্টিরূপে ঝরে পড়ে। বৃষ্টিপাতের ক্ষেত্রে দুটো প্রক্রিয়া একসাথে কাজ করে—

- বাতাসের শীতল হাওয়া
- বাতাসে জলীয়বাষ্প যুক্ত হওয়া।

ভেবে বলো

- শীতল বায়ু থেকে কেন বৃষ্টিপাত হয়?
- সব মেঘ থেকে বৃষ্টি হয় না কেন?

○ বৃষ্টিপাতের রকমভেদ

পরিচলন বৃষ্টিপাত

যেসমস্ত অঞ্চলে সূর্যরশ্মি সারাবছর প্রায় লম্বভাবে পড়ে এবং যেখানে জলভাগের বিস্তার বেশি সেখানে বাষ্পীভবনের পরিমাণ বেশি হয়। এই সমস্ত অঞ্চলে বায়ুতে প্রচুর পরিমাণে জলীয়বাষ্প মেশে এবং এই উষ্ণ হালকা বাতাস ওপরের দিকে উঠে প্রসারিত হয়। ঊর্ধ্বগামী বায়ুর চাপ কম হওয়ায় উষ্ণতাও কমে যায়। কিন্তু সেই উষ্ণতায় বায়ুতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ একই থাকে। ঠান্ডা বাতাস কম জলীয়বাষ্প ধারন করতে পারে বলে বায়ুর আপেক্ষিক আর্দ্রতা (Relative Humidity) বেড়ে যায়। ক্রমশ বায়ু আরও শীতল হয়ে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে এবং ঘনীভবন প্রক্রিয়ায় জলীয়বাষ্প ছোটো ছোটো জলকণায় পরিণত হয়। এই জলকণা ধূলিকণাকে আশ্রয় করে তৈরি করে মেঘ (সাধারণত কিউমুলোনিম্বাস)। অবশেষে এই মেঘ আরও ঘনীভূত হলে জলকণাগুলো জলবিন্দুতে পরিণত হয়ে বৃষ্টি রূপে ভূ পৃষ্ঠে ঝরে পড়ে। —এই বৃষ্টি হলো পরিচলন বৃষ্টিপাত (Convectional Rainfall)। নিরক্ষীয় অঞ্চলে দুপুরের পর বা বিকেলের দিকে বজ্রবিদ্যুৎসহ মুষলধারে পরিচলন বৃষ্টিপাত হয়। এই বৃষ্টিপাত অল্প জায়গার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।

পরিচলন বৃষ্টিপাত

বিশেষ কথা

কোনো নির্দিষ্ট উষ্ণতায় নির্দিষ্ট পরিমাণ বায়ুতে যে পরিমাণ জলীয় বাষ্প আছে এবং সেই উষ্ণতায় ঐ বায়ুকে সম্পৃক্ত করার জন্য যে পরিমাণ জলীয়বাষ্প প্রয়োজন—এই দুই-এর অনুপাতই হলো **আপেক্ষিক আর্দ্রতা**। এই আর্দ্রতা শতকরা হিসাবে প্রকাশ করা হয়।

- ভেবে বলোতো আপেক্ষিক আর্দ্রতার সাথে উষ্ণতার সম্পর্ক কীরকম?
- কোনো স্থানের আপেক্ষিক আর্দ্রতা ১০০ শতাংশ বলতে কীবোঝায়?

উত্তর খোঁজার চেষ্টা করো

- পরিচলন বৃষ্টিপাতে কোন পদ্ধতিতে বায়ু উত্তপ্ত হয়?
- নিরক্ষীয় অঞ্চলে চিরহরিৎ গাছের অরণ্য সৃষ্টি হয়েছে কেন?
- এমন দুটো দেশের নাম করো যেখানে প্রায় সারা বছর পরিচলন বৃষ্টিপাত হয়?

শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টিপাত

সমুদ্রের দিক থেকে আসা জলীয়বাষ্পযুক্ত আর্দ্র বায়ুর প্রবাহ পথে আড়াআড়ি ভাবে কোনো পর্বত বা উচ্চভূমি অবস্থান করলে ঐ বায়ু পর্বত বা উচ্চভূমিতে বাধা পেয়ে ঐ পর্বত বা উচ্চভূমির ঢাল বেয়ে ওপরের দিকে উঠে যায়। ঊর্ধ্বগামী এই বায়ু ক্রমশ প্রসারিত হয় ও ঠান্ডা হয়। আরও ওপরে উঠলে এই বায়ু সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে এবং ঘনীভূত হয়ে বৃষ্টিপাত ঘটায়। এই বৃষ্টি হলো শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টিপাত (Orographic Rainfall)। পর্বতের যে ঢাল বরাবর বায়ু ওপরের দিকে ওঠে ও বৃষ্টিপাত ঘটায় সেই ঢাল হলো প্রতিবাত ঢাল (Windward Slope)। আর এর বিপরীতে যে ঢাল বরাবর বায়ু নীচের দিকে নামে, সেই ঢাল হলো অনুবাত ঢাল (Leeward Slope)।

শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টিপাত

প্রতিবাত ঢালে প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটানোর পর বায়ু যখন পর্বতের অনুবাত ঢালে পৌঁছায় তখন সেই বায়ুতে জলীয়বাষ্পের পরিমাণ যথেষ্ট কমে যায়। এছাড়া বায়ু যত নীচের দিকে ঢালের উষ্ণতর স্থানে নামতে শুরু করে বায়ুর উষ্ণতা তত বাড়তে থাকে। ফলে বায়ুর জলীয়বাষ্প ধারণের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ায় বায়ু অসম্পৃক্ত হয়ে পড়ে। এই কারণে অনুবাত ঢালে প্রতিবাত ঢাল অপেক্ষা বৃষ্টিপাত খুবই কম হয়। তাই পর্বতের অনুবাত ঢাল বৃষ্টিচ্ছায় অঞ্চল (Rainshadow Region) নামে পরিচিত।

- দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর আরব সাগরীয় শাখা পশ্চিমঘাট পর্বতে বাধা পেয়ে পর্বতের পশ্চিমঢালে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টিপাত ঘটায়। পর্বতের পূর্বঢালে অবস্থিত দাক্ষিণাত্য মালভূমির অংশবিশেষ কম বৃষ্টিপাতের কারণে বৃষ্টিচ্ছায় অঞ্চলে পরিণত হয়েছে।
- উত্তর-পূর্ব ভারতের মেঘালয় রাজ্যের খাসি পাহাড়ের দক্ষিণ ঢালে অবস্থিত চেরাপুঞ্জি আর উত্তর ঢালে অবস্থিত শিলং -এর মধ্যে দূরত্ব প্রায় ৫৬ কিমি। চেরাপুঞ্জিতে গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাত প্রায় ১১,৭৭৭মিমি। কিন্তু শিলং -এর বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ প্রায় ২,২০৭মিমি।

নামের বিশেষত্ব

‘শৈল’ কথার অর্থ পর্বত আর ‘উৎক্ষেপ’ হলো ওপরে ওঠা। পর্বত দ্বারা বাধা পেয়ে বায়ু উৎক্ষিপ্ত হয়ে বৃষ্টিপাত হওয়ায় এই বৃষ্টির নাম শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টিপাত।

- চেরাপুঞ্জি ও শিলং — এর মধ্যে দূরত্ব এত কম হওয়া সত্ত্বেও দুটো জায়গার মধ্যে বৃষ্টিপাতের পরিমাণগত তারতম্য হয় কেন?
- মৌসুমি বায়ুর কোন শাখার প্রভাবে চেরাপুঞ্জিতে বৃষ্টিপাত হয় এবং কেন?
- মুম্বইয়ের তুলনায় পুনেতে বৃষ্টিপাত কম হয় কেন?

ঘূর্ণ বৃষ্টিপাত

স্বল্প পরিসর কোনো স্থানে উষ্ণতা বেড়ে গেলে সেখানকার বায়ু গরম হয়ে ওপরের দিকে উঠে যায়। ফলে সেখানে বায়ুর চাপ কমে গিয়ে নিম্নচাপ কেন্দ্রের সৃষ্টি হয়। এই নিম্নচাপের চারিদিকে বায়ু অপেক্ষাকৃত শীতল হওয়ায় বায়ুর চাপ তুলনায় বেশি থাকে। উচ্চচাপের এই বায়ু প্রবল গতিতে নিম্নচাপের কেন্দ্রের দিকে কুন্ডলাকারে ছুটে আসায় ঘূর্ণিঝড়ের সৃষ্টি হয় এবং ক্রান্তীয় ঘূর্ণবাত তৈরি হয়। কেন্দ্রে প্রবেশের পর এই বায়ু উষ্ণ হয় এবং ঘুরতে ঘুরতে ওপরের দিকে ওঠে। এই কেন্দ্রাভিমুখী ঊর্ধ্বগামী বায়ু শীতল ও ঘনীভূত হয়ে বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টিপাত ঘটায়। এই ঘূর্ণবাত থেকে সৃষ্ট বৃষ্টিপাতের নাম ঘূর্ণবৃষ্টি (Cyclonic Rainfall)।

ঘূর্ণবাত ফাইলিনের উপগ্রহ চিত্র

➢ সাধারণত ক্রান্তীয় ঘূর্ণবাতের উৎপত্তি হয় দুই গোলার্ধের ৫°-২০° অক্ষাংশের মধ্যবর্তী অঞ্চলে। এই ঘূর্ণবাতের কেন্দ্রে বায়ুর চাপ সব থেকে কম থাকে, এই অংশের নাম ঘূর্ণবাতের চোখ (Eye of Cyclone)। সাধারণত ঘূর্ণবাতের কেন্দ্রে আকাশ পরিষ্কার থাকে এবং শান্ত আবহাওয়া দেখা যায়। এই ঘূর্ণবাত জলভাগের ওপর বেশি শক্তিশালী হয়, যত স্থলভাগের দিকে এগোয় ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ে। সাধারণত শরৎকালে এই ঘূর্ণবাতের প্রকোপ দেখা যায়।

ক্রান্তীয় ঘূর্ণবৃষ্টি

বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট হওয়া ঘূর্ণবাত ওড়িশা, অন্ধ্রপ্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের উপকূলবর্তী অঞ্চলে প্রচুর ঘূর্ণবৃষ্টি ঘটায়। ২০০৯ সালের ঘূর্ণবাত '**আয়লা**', ২০১৩ সালের ঘূর্ণবাত '**ফাইলিন**'— এর প্রভাবে ভারতের পূর্ব উপকূল তথা বাংলাদেশে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল।

➢ ক্রান্তীয় ঘূর্ণবাত বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন নামে পরিচিত। বঙ্গোপসাগরে সাইক্লোন, ক্যারিবিয়ান সাগরে হ্যারিকেন আবার পূর্ব চিন সাগরে ঘূর্ণিঝড় টাইফুন নামে পরিচিত।

- উত্তর-পূর্ব আয়নবায়ু ও দক্ষিণ-পূর্ব আয়নবায়ু যেখানে মিলিত হয় সেখানে এই ঘূর্ণবৃষ্টি হতে দেখা যায়।
- মৌসুমি বায়ু অধ্যুষিত দেশগুলোতে শরৎ আর হেমন্তকালে এই বৃষ্টি হয়।
- মধ্য ইউরোপের দেশগুলোতে শীতকালে এই ঘূর্ণবৃষ্টি হতে দেখা যায়।

নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের ঘূর্ণবাত

নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের কোনো স্থানে নিম্নচাপ তৈরি হলে ক্রান্তীয় অঞ্চলের জলীয়বাষ্পযুক্ত উষ্ণবায়ু এবং মেরু অঞ্চলের শীতল শুষ্ক বায়ু ঐ নিম্নচাপ কেন্দ্রের দিকে অনুভূমিক ভাবে ছুটে আসে। দুই বায়ু পরস্পর মুখোমুখি হলে তাদের মধ্যে আলোড়নের সৃষ্টি হয়। উষ্ণ বায়ু হালকা হওয়ায় ভারী শীতল বায়ুর ওপর ধীরে ধীরে উঠে যায়। এই উষ্ণ বায়ু জলীয়বাষ্পযুক্ত হওয়ায় শীতল বায়ুর সংস্পর্শে এসে ঘনীভূত হয় এবং বৃষ্টিপাত ঘটায়। নাতিশীতোষ্ণ ঘূর্ণবৃষ্টিতে ক্রান্তীয় অঞ্চলের মতো ঝড়ঝঞ্ঝা হয় না, ঝিরঝিরে বৃষ্টি অনেকক্ষণ ধরে চলে।

নাতিশীতোষ্ণ ঘূর্ণবৃষ্টি

- শীতকালে এই ধরনের বৃষ্টিপাত মধ্য অক্ষাংশের দেশগুলোতে হয়।

জানার চেষ্টা করো

- শরৎকালে পশ্চিমবঙ্গে কোন ঘূর্ণিঝড় হয় ?
- তোমার অঞ্চলে কোন ঋতুতে কী ধরনের বৃষ্টিপাত হয় সেগুলো সম্বন্ধে লেখো।
- আমাদের দেশে বর্ষাকালে সাধারণত কোন ধরনের বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে?

আরো কয়েকপ্রকার অধঃক্ষেপণ—

- খুব ছোটো জলকণা (০.৫ মিমি-এর কম ব্যাসযুক্ত) ভূপৃষ্ঠে ঝরে পড়লে তাকে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি (Drizzle) বলে।
- জলকণা ও তুষার কণার আংশিক মিশ্রিত রূপ হলো স্লিট (Sleet)।
- ঊর্ধ্বমুখী বায়ুর প্রভাবে অনেক সময় জলকণাগুলো অনেক উঁচুতে উঠে যায়। সেখানে জলকণাগুলো দ্রুত ঠান্ডা হয়ে বরফের টুকরোতে পরিণত হয়। বরফের টুকরো বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সাথে ভূপৃষ্ঠে ঝরে পড়ে। একেই বলে শিলাবৃষ্টি (Hailstorm)। শিলাবৃষ্টিতে ঘর-বাড়ি এবং ফসলের ক্ষয়ক্ষতি হয়। পশ্চিমবঙ্গে বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে মাঝে মাঝে শিলাবৃষ্টি হতে দেখা যায়।

শিলাবৃষ্টি

তুষারপাত

- সাধারণত শীতপ্রধান দেশে এবং উঁচু পার্বত্য অঞ্চলে জলীয়বাষ্পযুক্ত বায়ু হিমাঙ্কের থেকে কম উষ্ণতায় ঘনীভূত হলে জলকণার বদলে সরাসরি বরফ কণায় বা তুষারে পরিণত হয়। এই তুষার মাধ্যাকর্ষণের টানে ভূপৃষ্ঠে ঝড়ে পড়লে তাকে বলে তুষারপাত (Snowfall)।

জেনে রাখো

শিশির

শীতের রাতে ভূপৃষ্ঠ দ্রুত তাপ বিকিরণ করলে ভূপৃষ্ঠ সংলগ্ন বায়ুস্তর শীতল হয়ে পড়ে। ফলে ভূ পৃষ্ঠ সংলগ্ন জলীয়বাষ্প শীতল ও ঘনীভূত হয়ে ছোটো ছোটো জলবিন্দু তৈরি করে। এগুলো হলো **শিশির**। ঘাস, গাছের পাতা, ঘরের চালা ইত্যাদির ওপর শিশির জমা হয়। মেঘমুক্ত রাতে শিশির বেশি সৃষ্টি হয়।

- শীতকালে ভোরবেলায় ঘাসের ওপর দিয়ে খালি পায়ে হাঁটলে পা ভিজে যায় কেন?
- শুষ্ক অঞ্চলে শিশির কম পড়ে কেন?

কুয়াশা

ভূ পৃষ্ঠের কাছাকাছি জলীয় বাষ্পযুক্ত বায়ু ধূলিকণাকে আশ্রয় করে ঘনীভূত হলে ছোটো ছোটো জলকণার সৃষ্টি হয়। এই জলকণা ভূপৃষ্ঠের কিছুটা ওপরের বায়ুস্তরে অনেকটা ধোঁয়ার মতো **কুয়াশা** হয়ে ভাসতে থাকে। এর কারণে অনেকসময় কয়েক মিটার দূরত্বের মধ্যে থাকা বস্তুকেও দেখা যায় না। ভারতের দিল্লী শহরে শীতের শুরুতে কুয়াশায় দৃশ্যমানতা (visibility) কমে যায়।

- সাধারণত শীতকালে জলাশয়ের ওপর কুয়াশা বেশি দেখা যায় কেন?
- কুয়াশার কারণে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কী সমস্যার সৃষ্টি হয় বা হতে পারে ক্লাসে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করো।

➢ ভেবে বলোতো শিশির আর কুয়াশা অধঃক্ষেপণ নয় কেন?

- বৃষ্টিপাতের পরিমাণ মাপা হয় রেনগজ (Raingauge) যন্ত্রের সাহায্যে।
- পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ আলাদা। পৃথিবীর যেসব জায়গায় বৃষ্টিপাতের গড় পরিমাণ এক সেই সব স্থানকে মানচিত্রে সমবর্ষণরেখা (Isohyet) দ্বারা যুক্ত করা হয়।

- বায়ুতে জলীয়বাষ্পের পরিমাণ বিভিন্ন জায়গায় আলাদা হয় কেন?
- শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টিপাতের একটি মডেল তৈরি করে প্রতিবাত ও অনুবাত ঢাল চিহ্নিত করো।

৬ জলবায়ু অঞ্চল

- কোনো অঞ্চলের অক্ষাংশগত অবস্থানের ওপর তার জলবায়ু অনেকাংশে নির্ভর করে। ভূমির উচ্চতা, সমুদ্র থেকে দূরত্ব, বায়ুপ্রবাহ, সমুদ্রস্রোত জলবায়ুকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রণ করে।

- সমুদ্র সমতল থেকে যত উপরে ওঠা যায় বায়ুর উষ্ণতা তত কমে যায়। পৃথিবীর অধিকাংশ পার্বত্য অঞ্চলে উচ্চতার সাথে সাথে জলবায়ু ও স্বাভাবিক উদ্ভিদ অঞ্চল বদলায়।

এবার হিয়াদের স্কুলের সামার ক্যাম্প হয়েছিল হিমাচল প্রদেশের কুলুতে। ওদের বাসটা যতই উপরে উঠেছিল ততই আশেপাশের ভূমিরূপ, স্বাভাবিক উদ্ভিদ— সবই বদলে যাচ্ছিল। সমতলের শাল-সেগুনের জঙ্গল ছেড়ে ক্রমশই পাহাড়ের পাইন, লার্চ, পপলার-এর বন। আরও ওপরে, রোটাং পাস্-এ তো শুধুই ছোটো ছোটো ঘাস আর বরফ!

ভূমির উচ্চতার সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক উদ্ভিদ এবং সেইসঙ্গে জলবায়ুর পরিবর্তনও হয়।

➢ তোমরা কোথাও বেড়াতে গেলে, সেই অঞ্চলের স্বাভাবিক উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য, উচ্চতা, অবস্থানের পার্থক্যে তার বিন্যাসের পরিবর্তন লক্ষ করে অঞ্চলটার জলবায়ুর প্রকৃতি বোঝার চেষ্টা করে দেখো।

- পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে উষ্ণতা-বৃষ্টিপাত এক এক রকম। ফলে আবহাওয়ার সামগ্রিক ধরনও আলাদা হয়। নিরক্ষরেখার কাছাকাছি অঞ্চলে সারাবছর ধরেই প্রচণ্ড গরম আর প্রচুর বৃষ্টি। এই উষ্ণ আর্দ্র জলবায়ু উদ্ভিদের দ্রুত বৃদ্ধির জন্য অত্যন্ত অনুকূল। ফলে বিশাল অঞ্চলজুড়ে ঘন গভীর চিরসবুজ অরণ্য (নিরক্ষীয় বৃষ্টি অরণ্য) সৃষ্টি হয়েছে। আবার ক্রান্তীয় অঞ্চলে কোথাও বৃষ্টির অভাবে ছোটো ছোটো ঘাস-এর তৃণভূমি (সাভানা) আবার কোথাও রুক্ষ মরুভূমি। উপক্রান্তীয় অঞ্চলে উষ্ণ ও শীতল সরলবর্গীয় গাছের অরণ্য; আবার মেরুবৃত্ত অঞ্চলের তুন্দ্রা জলবায়ুতে শুধু ছোটো ঘাস আর গুল্ম জন্মায়, কারণ প্রায় সারাবছরই এখানে উষ্ণতা হিমাঙ্কের নীচে থাকে।

নিরক্ষীয় চিরসবুজ

ক্রান্তীয় পর্ণমোচী

ভূমধ্যসাগরীয়

সাভানা

মরু

● কোনো একটি জলবায়ু অঞ্চলে (Climate Zone) জলবায়ুর উপাদান মূলত উষ্ণতা ও বৃষ্টিপাত-এর বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি সমধর্মী হয়। বিভিন্ন জলবায়ু অঞ্চলে মৃত্তিকা, স্বাভাবিক উদ্ভিদ, জীববৈচিত্র্য — এমনকি মানুষের জীবনযাত্রায় তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্য দেখা যায়।

আমারা মানচিত্রে কোনো জলবায়ু অঞ্চলকে অন্য জলবায়ু অঞ্চল থেকে সূক্ষ্ম রেখার মাধ্যমে আলাদা করলেও দুটো জলবায়ু অঞ্চলের মধ্যে সাধারণত একটা পরিবর্তনশীল অঞ্চল (Transitional Zone) থাকে। যেখানে একটা অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য ধীরে ধীরে অপর অঞ্চলে মিশে যায়।

পৃথিবীর প্রধান প্রধান জলবায়ু অঞ্চল

মঞ্জিশ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। আজ ওর Wild life Photographer মামার আসার কথা। পৃথিবীর নানা জায়গায় ঘুরে মামার বিভিন্ন অঞ্চলের গাছপালা, প্রাণীজগৎ ও মানুষের ছবি তোলেন। তাদের কেউ থাকে সাহারার উষ্ণমরুতে, কেউ গভীর নিরক্ষীয় জঙ্গলে, আবার কেউ থাকে বরফে ঢাকা মেরুপ্রদেশে।

— দূর, অচেনা দেশের এই সব মানুষের জীবনধারা আমাদের থেকে কত আলাদা!— অবাক বিস্ময়ে সে ভাবে আর রোমাঞ্চিত হয়।

● তোমরা তোমাদের নিজেদের অঞ্চলের পরিবেশের গাছপালা, প্রাণীজগৎ পর্যবেক্ষণ করো। প্রাকৃতিক পরিবেশের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য, বিন্যাস, বৈচিত্র্য সম্পর্কে প্রতিবেদন লেখো। তোমার প্রতিবেশীদের জীবনযাত্রা (খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, জীবিকা) সংক্রান্ত সমীক্ষা পত্র তৈরি করো।

➢ লক্ষ করে দেখো— তোমার অঞ্চলে মানুষের জীবনযাত্রায় পরিবেশ এবং জলবায়ুর কী প্রভাব আছে?

● 'জীবনযাত্রায় জলবায়ু নিয়ন্ত্রণ'—এই প্রসঙ্গে পক্ষে ও বিপক্ষে মতামত তৈরি করে শ্রেণিকক্ষে তাৎক্ষণিক বক্তৃতা ও বিতর্ক সভার আয়োজন করতে পারো।

উষ্ণ আর্দ্র জলবায়ু

নিরক্ষীয় জলবায়ু অঞ্চল

নিরক্ষীয় উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ু অঞ্চলে সারা বছর অত্যধিক উষ্ণতা আর প্রচুর বৃষ্টিপাতের কারণে গভীর অরণ্য সৃষ্টি হয়েছে। এইকারণে এই অঞ্চলকে 'নিরক্ষীয় বৃষ্টি অরণ্য অঞ্চল' (Equatorial Rain Forest Region) বলা হয়।

অবস্থান : নিরক্ষরেখার দুই পাশে সাধারণত ৫°-১০° উত্তর ও দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যে অবস্থিত অঞ্চলে এই জলবায়ু দেখা যায়।

আফ্রিকার কঙ্গো বা জাইরে নদীর অববাহিকা; দক্ষিণ আমেরিকার আমাজন নদী অববাহিকা; দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইনস; ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ; শ্রীলঙ্কার দক্ষিণ অংশ; কলম্বিয়ার পশ্চিম উপকূল; মাদাগাস্কারের পূর্বাংশ; মধ্য আমেরিকার পানামা, কোস্টারিকা, ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জের কিছু অঞ্চল এই জলবায়ুর অন্তর্গত।

নিরক্ষীয় বৃষ্টি অরণ্য অঞ্চল

জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য

উষ্ণতা - এই অঞ্চলে সারাবছর সূর্যরশ্মি লম্বভাবে পড়ে। ফলে উষ্ণতা সবসময়ই বেশি (বার্ষিক গড় উষ্ণতা ২৭° সে.)। বার্ষিক উষ্ণতা থাকে ২৫° সে. থেকে ৩০° সে.। বার্ষিক উষ্ণতার প্রসর হয় মাত্র ২° সে. থেকে ৩° সে.। সেইসঙ্গে বাতাসে আর্দ্রতাও বেশি থাকে। তবে রাতে উষ্ণতা বেশ কমে যায় (২৫° সে), তাই নিরক্ষীয় অঞ্চলে রাত্রি ক্রান্তীয় শীতকাল (Winters of tropics) নামে পরিচিত। সারাবছর ধরে দিন ও রাতের পরিমাণ প্রায় সমান থাকে (১২ ঘন্টা)। এত কম বার্ষিক উষ্ণতার প্রসর পৃথিবীর আর কোনো জলবায়ু অঞ্চলে দেখা যায় না।

বৃষ্টিপাত - সারাবছর বেশি উষ্ণতার কারণে এই অঞ্চলে গভীর নিম্নচাপ অবস্থান করে। এই অঞ্চলে স্থলভাগের থেকে জলভাগের পরিমাণ বেশি হওয়ায় প্রচুর জলীয়বাষ্প বাতাসে মেশে। এই উষ্ণ আর্দ্র বাতাস উর্ধ্বাকাশে উঠে শীতল ও ঘনীভূত হয়ে পরিচলন প্রক্রিয়ায় (Convectional rain) প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটায় (বার্ষিক ২০০ সেমি.-২৫০ সেমি.)। মোট বৃষ্টিপাতের দিনসংখ্যা বছরে ২৫০ থেকে ৩০০ হয়। প্রায় প্রতিদিন সকালে আকাশ পরিষ্কার থাকে। বিকেলের দিকে ৩-৪টের সময় ঘন কিউমুলোনিম্বাস মেঘে আকাশ ঢেকে যায়। বজ্র বিদ্যুৎসহ প্রবল ঝড়বৃষ্টি হয়। তাই একে 4 O'clock rain বলে। আবার রাত্রিবেলা আকাশ মেঘমুক্ত হয়ে তাপমাত্রা কিছুটা কমে যায়। এই জলবায়ু অঞ্চল নিরক্ষীয় নিম্নচাপ বলয় অর্থাৎ আন্তঃক্রান্তীয় অভিসরণ অঞ্চল (ITCZ) দ্বারা প্রভাবিত।

জীববৈচিত্র্য

স্বাভাবিক উদ্ভিদ — এই অরণ্যে সারা বছর গাছে সবুজ পাতা থাকে, ফুল ফোটে, ফল ধরে, তাই চিরসবুজ অরণ্য (Evergreen forest) বলা হয়। ব্রাজিলের আমাজন নদী অববাহিকায় এই ক্রান্তীয় অরণ্য 'সেলভা' নামে পরিচিত। এই অরণ্যে রবার, রোজউড, ব্রাজিল নাট, আয়রন উড, বাঁশ গাছ দেখা যায়। জাইরে (কঙ্গো) নদী অববাহিকার নিরক্ষীয় অরণ্যে মেহগনি, রবার, পাম, কোকো, সিঙ্কোনা গাছের প্রাধান্য। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নিরক্ষীয় অরণ্যে শাল, সেগুন, আবলুস, রবার গাছ দেখা যায়। উপকূল অঞ্চলে প্রচুর নারকেল, তালগাছ জন্মায়।

র‍্যাফ্লেশিয়া | অর্কিড

নিরক্ষীয় অরণ্যের স্তর বিন্যাস

এই অরণ্যে নানা প্রজাতির গাছ পাশাপাশি জন্মায়। ব্রাজিলের বৃষ্টি অরণ্যে ২ বর্গকিমি অঞ্চলে গড়ে প্রায় ৩০০ প্রজাতির গাছ দেখা যায়। পৃথিবীর আর কোনো অরণ্যে এত প্রজাতির গাছ দেখা যায় না। গাছগুলোর কাঠ শক্ত ও ভারী, গুঁড়ি খুব লম্বা, মোটা আর পাতাগুলো বেশ চওড়া হয়। গাছগুলো এমন ঠাসাঠাসিভাবে থাকে, যে অরণ্যের ওপর চাঁদোয়ার (Canopy) মতো ঢেকে যায়। এর মধ্য দিয়ে সূর্যের আলো অরণ্যের তলদেশে পৌঁছতে পারে না। ফলে স্যাঁতসেঁতে, অন্ধকার তলদেশে নানা লতা, গুল্ম, পরগাছা গজিয়ে দুর্গম হয়ে ওঠে।

বন্যপ্রাণ — ঘন ও দুর্ভেদ্য অরণ্যে, গাছে চড়তে পারে এমন পশুপাখি, জীবজন্তুর আধিক্য। বাঁদর, গরিলা, শিম্পাঞ্জি, ওরাংওটাং, বিভিন্নরকম সাপ, পাখি, বিষাক্ত কীটপতঙ্গ দেখা যায়। অরণ্যের তলদেশে হরিণ, গন্ডার, হাতি, জেব্রা ও নদী, জলাশয়ে প্রচুর কুমির, জলহস্তী রয়েছে।

পিগমি

রেড ইন্ডিয়ান

বান্টু

আর্থ-সামাজিক পরিবেশ ও জীবনযাত্রা

অধিবাসী ও জীবনযাত্রা — উষ্ণ আর্দ্র অস্বাস্থ্যকর জলবায়ু, বিপদসংকুল বন্যপরিবেশে জনবসতি বিরল। জাইরে ও আমাজন অববাহিকার তুলনায় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নিরক্ষীয় অঞ্চলে লোকবসতি বেশি। জাইরে অববাহিকার পিগমি, উচ্চ আমাজন অববাহিকার রেড ইন্ডিয়ান ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সেমাঙ ও অন্যান্য উপজাতির মানুষরা এই অঞ্চলের প্রধান অধিবাসী। বনের ফলমূল, বনজসম্পদ সংগ্রহ ও পশুশিকার অধিবাসীদের প্রধান জীবিকা।

বর্তমানে অরণ্যের কাছাকাছি অঞ্চলে আদিম প্রথায়, স্থানান্তর কৃষির মাধ্যমে ভুট্টা, মিষ্টি আলু, ওল, কলার চাষ হচ্ছে। কোথাও কোথাও স্থায়ীভাবে কৃষিকাজ করার প্রক্রিয়া ও শুরু হয়েছে।

- অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীতে উপনিবেশ স্থাপন করে ইউরোপীয় বণিকরা এই অঞ্চলের বিভিন্ন জায়গায় 'বাগিচা কৃষি' শুরু করেছিল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মালয়, জাভা, সুমাত্রায় রবার চাষ; পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে আখ, কলার চাষ; আফ্রিকার গিনি উপকূলে কোকো ও তাল (পাম) জাতীয় গাছের তেল উৎপাদন করে অধিবাসীরা জীবিকা নির্বাহ করে।

খনিজ সম্পদ, শিল্প— মালয়-এ টিন, সুমাত্রা, জাভা, বোর্নিও-য় প্রচুর খনিজ তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস পাওয়া যায়। প্রয়োজনীয় কাঁচামালের অভাবে ভারী শিল্প গড়ে ওঠেনি। তবে স্থানীয় কৃষিজ, বনজ ও খনিজ দ্রব্যের ওপর নির্ভর করে কিছু শিল্প গড়ে উঠেছে।

সাম্প্রতিক অবস্থা— অস্বাস্থ্যকর জলবায়ু, দুর্গম জঙ্গল, বিষাক্ত কীটপতঙ্গের উপদ্রব, ম্যালেরিয়া-কালাজ্বরের প্রাদুর্ভাব — সবই এখানকার অর্থনৈতিক উন্নতির অন্তরায়। কিন্তু বর্তমানে অতিরিক্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে এই অঞ্চলে নতুন জনবসতি গড়ে উঠছে। ক্রমাগত চাহিদায়, বসতি, কৃষি, শিল্প, পরিবহন-এর প্রয়োজনে প্রতিদিন বিরাট এলাকার বৃষ্টি অরণ্য ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। ১৯৭০ সালে ট্রান্স-আমাজন হাইওয়ের মাধ্যমে এই অঞ্চল বহির্বিশ্বের সঙ্গে যুক্ত হয়। সেই সঙ্গে জীববৈচিত্র্য এবং পরিবেশের অবক্ষয় ত্বরান্বিত হয়।

ব্রাজিলের আমাজন অববাহিকার অরণ্যের বিনাশ

গ্রীষ্মপ্রধান জলবায়ু

মৌসুমি জলবায়ু অঞ্চল

আরবি শব্দ 'মৌসিম' এর অর্থ 'ঋতু'। মৌসুমি জলবায়ু অঞ্চলে ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জলবায়ুর বৈশিষ্ট্যও পরিবর্তিত হয়।

অবস্থান: উত্তর এবং দক্ষিণ গোলার্ধে ১০° থেকে ৩০° অক্ষাংশে মহাদেশের পূর্বে অবস্থিত দেশগুলোতে মৌসুমি জলবায়ু দেখা যায়। এশিয়ার ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, মায়ানমার, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, তাইওয়ান, কাম্পুচিয়া, দক্ষিণ চিন এবং ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের কিছু অংশে মৌসুমি জলবায়ুর প্রভাব দেখা যায়।

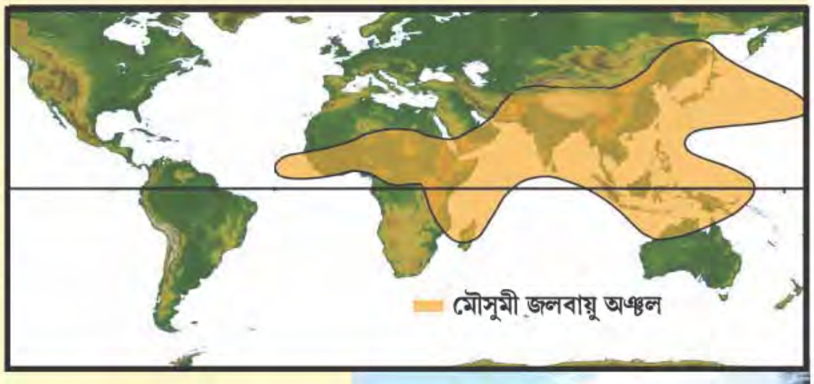

এছাড়াও পূর্ব আফ্রিকার সোমালি, মাদাগাস্কার; উত্তর অস্ট্রেলিয়ার কুইন্সল্যান্ডের কিছু অঞ্চলে এই জলবায়ু অনুভূত হয়।

জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য

শীত গ্রীষ্মে বিপরীতমুখী বায়ুপ্রবাহ, উষ্ণ-আর্দ্র গ্রীষ্মকাল, শুষ্ক শীতকাল মৌসুমি জলবায়ুর প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই জলবায়ু অঞ্চলে অবস্থিত দেশগুলোতে প্রধান চারটে ঋতু লক্ষ করা যায়।

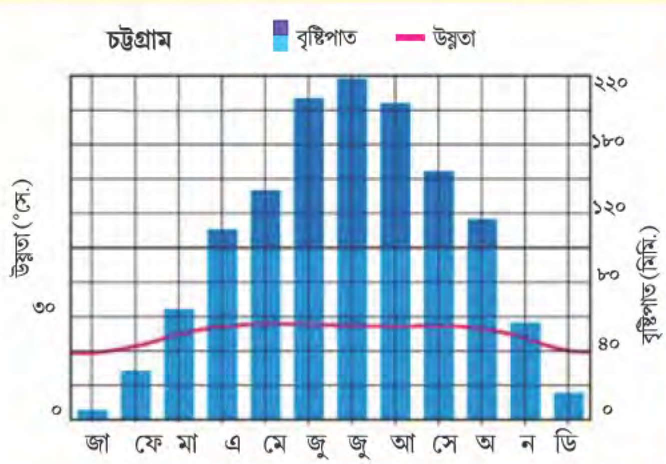

শীতকাল (নভেম্বর- জানুয়ারি) : গড় তাপমাত্রা সাধারণত ২৫°সে.। উত্তর-পূর্ব আয়ন বায়ু, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় 'উত্তর-পূর্ব মৌসুমি বায়ু' রূপে প্রবাহিত হয়। এর প্রভাবে সারা ভারতে বৃষ্টি না হলেও করমণ্ডল উপকূল, আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ এবং শ্রীলঙ্কায় বৃষ্টি হয়। পশ্চিমী ঝঞ্ঝার জন্য উত্তর পশ্চিম ভারত এবং পাকিস্তানের কিছু অংশে তুষারপাত হয়।

প্রাক্-মৌসুমি গ্রীষ্মকাল (মার্চ-মে) : গ্রীষ্মকালীন গড় তাপমাত্রা ৩০° সে.। তবে তাপমাত্রা ৩৮°সে.-এর বেশি হয়। অত্যধিক উষ্ণতার কারণে স্থলভাগের ওপর নিম্নচাপ তৈরি হয়। মার্চ-এপ্রিল মাসে বাংলাদেশ, অসম, মায়ানমারে কিছুটা বৃষ্টি হয়।

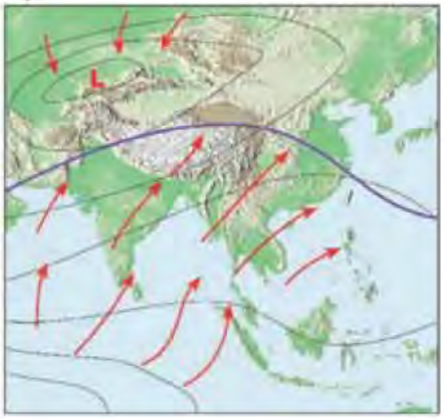

বর্ষাকাল (জুন-সেপ্টেম্বর) : আরবসাগর ও বঙ্গোপোসাগর থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু ভারতীয় উপমহাদেশে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই আকস্মিক ও প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত শুরু হয়। একে মৌসুমি বায়ুর বিস্ফোরণ (Burst of Monsoon) বলা হয়। এই সময় বাতাসে সর্বাধিক জলীয়বাষ্প থাকে। বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ২০০-৩০০ সেমি। মৌসিনরামে বছরে গড়ে ১২০০ সেমি বৃষ্টিপাত হয়। তবে মৌসুমি বৃষ্টি খুবই অনিশ্চিত। ফলে খরা ও বন্যা হওয়ার প্রবণতা থাকে।

খরা

বন্যা

শরৎকাল (সেপ্টেম্বর- অক্টোবর) : মৌসুমি বায়ুর প্রত্যাবর্তনের সাথে সাথে আবহাওয়া ধীরে ধীরে শীতকালীন অবস্থার দিকে পরিবর্তিত হয়। বঙ্গোপোসাগরে গভীর নিম্নচাপ তৈরি হলে বজ্রবিদ্যুৎ সহ ঝড় ও বৃষ্টি হয়।

জীববৈচিত্র্য

স্বাভাবিক উদ্ভিদ : নিরক্ষীয় জলবায়ুর মতো গভীর চিরসবুজ অরণ্য এই জলবায়ুতে দেখা যায় না। প্রধানত পর্ণমোচী (শুষ্ক শীতকালে গাছের পাতা ঝরে যায়) প্রকৃতির উদ্ভিদের প্রাধান্য হলেও বৃষ্টিপাতের তারতম্য অনুসারে বনভূমির প্রকৃতি পরিবর্তিত হয়।

যেসব অঞ্চলে বার্ষিক বৃষ্টিপাত খুব বেশি (২০০ সেমি), সেখানে শুষ্ক ঋতুতেও মাটি ভেজা থাকায় মেহগনি, শিশু, গর্জন-এর চিরসবুজ বনভূমি সৃষ্টি হয়।

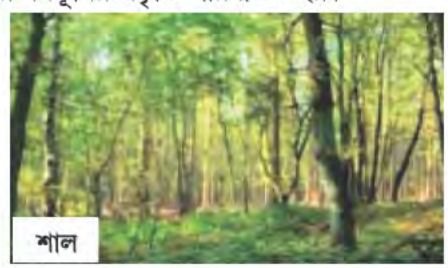
শাল

মাঝারি বৃষ্টিপাতযুক্ত (বার্ষিক ১০০-২০০ সেমি) অঞ্চলে শাল, সেগুন, শিমুল, পলাশ, শিরিষ, মহুয়া, আম, কাঁঠাল জাতীয় পর্ণমোচী বৃক্ষের মিশ্র বনভূমি দেখা যায়।

ম্যানগ্রোভ অরণ্য

শুষ্ক অঞ্চলে (বার্ষিক বৃষ্টিপাত ৫০-১০০ সেমি) ফণীমনসা, বাবলা, ক্যাকটাস জাতীয় কাঁটাগাছের ঝোপঝাড় দেখা যায়। উপকূল অঞ্চলে সুন্দরী, গরান, গেঁওয়া গাছের ম্যানগ্রোভ অরণ্য দেখা যায়।

বণ্যপ্রাণ : হাতি, গন্ডার, চিতা, হরিণ, নেকড়ে, ভাল্লুক, বানর,শিয়াল, হায়না, সাপ ছাড়াও বিশেষ অঞ্চলে বাঘ (সুন্দরবন), সিংহ (গুজরাটের গির অরন্য) উপকূলের নদী মোহনায় কুমীর, নদী ও জলাশয়ে প্রচুর মাছ পাওয়া যায়।

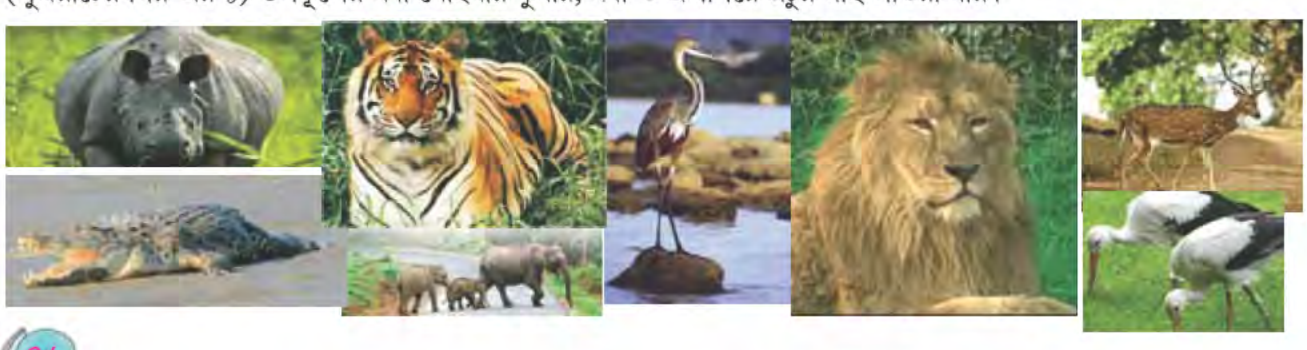

আর্থ-সামাজিক পরিবেশ ও জীবনযাত্রা

কৃষিকাজ : মৌসুমি জলবায়ু অঞ্চল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধান ও পাট উৎপাদক অঞ্চল। অনুকূল জলবায়ু, উর্বর মাটির জন্য এই অঞ্চল কৃষিকাজে অত্যন্ত উপযুক্ত। ধান, পাট, গম আখ, তুলা, তৈলবীজ, চা, কফি, রবার-এই অঞ্চলের প্রধান ফসল। এছাড়া আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু, কলা, আনারস, পেয়ারা প্রভৃতি ফল উৎপাদনেও এই অঞ্চল গুরুত্বপূর্ণ।

খনিজসম্পদ ও শিল্প : এই জলবায়ু অঞ্চল খনিজসম্পদে সমৃদ্ধ। কয়লা, লোহা, তামা, ম্যাঙ্গানিজ, বক্সাইট, খনিজতেল প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। বড়ো শিল্পের মধ্যে পাট শিল্প, কার্পাসশিল্প, চা শিল্প, লৌহ-ইস্পাত শিল্প প্রধান।

পরিবহন ব্যবস্থা : মৌসুমি জলবায়ু অঞ্চলের অধিকাংশ ভূপ্রকৃতি সমতল। তাই সড়ক, রেল, জলপথ ও আকাশপথ সব ধরনের পরিবহন ব্যবস্থা উন্নত।

জনবসতি : অনুকূল জলবায়ু, উর্বর মাটি, সমৃদ্ধ কৃষিকাজ,উন্নত পরিবহনব্যবস্থার কারণে মৌসুমি জলবায়ু অঞ্চল পৃথিবীর সর্বাধিক জনবহুল অঞ্চল। দিল্লি, কলকাতা, মুম্বই, চেন্নাই, সাংহাই, ঢাকা, রেঙ্গুন, ব্যাংকক, নম্‌পেন-এর মতো বড়ো বড়ো জনবহুল শহর রয়েছে এই অঞ্চলে।

ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা : অনুকূল জলবায়ু, কৃষিজ, বনজ ও খনিজ সম্পদের প্রাচুর্য থাকায় এই অঞ্চলে উন্নত পরিকাঠামো, প্রযুক্তি, আধুনিক শিল্পস্থাপনের মাধ্যমে দ্রুত অর্থনৈতিক বিকাশের উজ্জ্বল সম্ভাবনা আছে।

কলকাতা

দিল্লি

ব্যাংকক

নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু

ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু অঞ্চল

উষ্ণ নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের বিশিষ্ট জলবায়ু অঞ্চল হলো ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু অঞ্চল। শুধুমাত্র ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী দেশগুলো ছাড়াও প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীর যে সমস্ত অঞ্চলে ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী দেশগুলোর মতো জলবায়ু দেখা যায় তাকেও ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু অঞ্চল বলা হয়।

ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু অঞ্চল

অবস্থান : উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধে ৩০°-৪০° অক্ষাংশের মধ্যে অবস্থিত মহাদেশের পশ্চিমদিকে এই জলবায়ু দেখা যায়।

ইউরোপের ফ্রান্স, ইতালি, স্পেন, গ্রিস, পোর্তুগাল, আলবেনিয়া, যুগোশ্লোভিয়া; এশিয়ার তুরস্ক, ইসরায়েল, সিরিয়া, লেবানন এবং আফ্রিকার মিশর, মরক্কো, লিবিয়া, আলজিরিয়া, টিউনেশিয়া — এই ১৬টি দেশে ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুর সর্বাধিক প্রভাব দেখা যায়।

এছাড়া উত্তর আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া, দক্ষিণ আমেরিকার চিলি, দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউন, অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পূর্বে এই জলবায়ু দেখা যায়।

জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য

পোর্তুগাল

সারাবছর মৃদুভাবাপন্ন নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু, শুষ্ক গ্রীষ্মকাল এবং শীতকালীন বৃষ্টিপাত ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুর প্রধান্য বৈশিষ্ট্য।

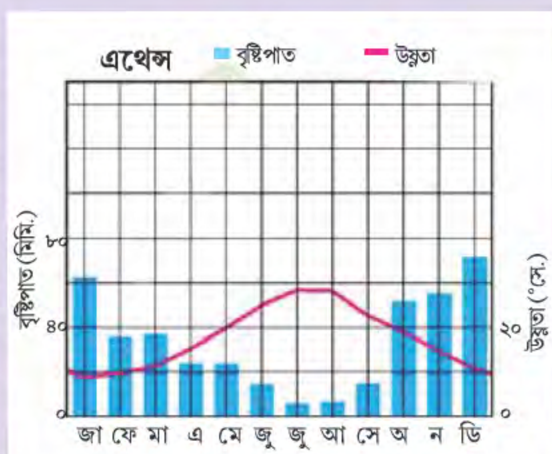

উষ্ণতা : গ্রীষ্মকালীন উষ্ণতা ২১° -২৭° সে, তবে শীতকালে তা কমে ৫°-২৭° সে. হয়। অর্থাৎ বার্ষিক তাপমাত্রার প্রসর থাকে ১৭° সে। গ্রীষ্মকালে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে উচ্চচাপ বলয় অবস্থান করে। ফলে স্থলভাগ থেকে শুষ্ক আয়ন বায়ু সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত হয়। একারণে গ্রীষ্ককালে বৃষ্টি হয় না। আকাশ মেঘমুক্ত, রোদ ঝলমলে থাকায় রাতে তাপমাত্রা কমে যায়।

বৃষ্টিপাত : শীতকালে এই অঞ্চল থেকে উচ্চচাপ বলয় সরে গেলে আটলান্টিক মহাসাগর থেকে প্রবাহিত জলীয়বাষ্পপূর্ণ পশ্চিমাবায়ু এই অঞ্চলে বৃষ্টিপাত ঘটায়। বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ২৫সেমি -১৫০ সেমি। অ্যাড্রিয়াটিক উপসাগরের পূর্ব উপকূলে বৃষ্টির পরিমাণ সবথেকে বেশি হয়। উপকূল থেকে ভিতরের দিকে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ক্রমশ কমতে থাকে। শীতকালে বৃষ্টিপাত হয় বলে, এই অঞ্চলকে 'শীতকালীন বৃষ্টিপাতের দেশ' বলে।

এই অঞ্চলে তুষারপাত বিশেষ হয় না তবে ভূমধ্যসাগরের উত্তর উপকূল অঞ্চলে, ক্যালিফোর্নিয়ার মধ্যভাগে অল্প তুষারপাত হয়।

জীববৈচিত্র্য

স্বাভাবিক উদ্ভিদ : শুষ্ক গ্রীষ্ম এবং আর্দ্র শীতকালের কারণে এই জলবায়ু অঞ্চলে চিরসবুজ গাছ এবং গুল্মজাতীয় গাছের মিশ্র বনভূমি সৃষ্টি হয়েছে। শুষ্ক গ্রীষ্মকালে বাষ্পীভবন আটকাতে গাছের পাতা পুরু ও কাণ্ড শক্ত হয়। বড়ো বড়ো পাতা, পুরু ছালযুক্ত গাছগুলো শীতকালের বৃষ্টির জল সঞ্চয় করে রাখে। প্রধানত তিন ধরনের স্বাভাবিক উদ্ভিদের সমাবেশ এখানে দেখা যায় —

সরলবর্গীয় উদ্ভিদ

গুল্ম

১.সরলবর্গীয় উদ্ভিদ — পাইন, ফার, সিডার ।

২.চিরসবুজ উদ্ভিদ — ওক, কর্ক, ইউক্যালিপ্টাস, রোজউড।

৩.গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ — ম্যাপল, লরেল, রোজমেরি, ল্যাভেন্ডার।

জলপাই গাছ ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুর অন্যতম প্রধান উদ্ভিদ। এই জলবায়ু অঞ্চলে পৃথিবীর সবথেকে বেশি জলপাই গাছ রয়েছে।

প্রাণীজগৎ ও পশুপালন— বৃষ্টিহীন শুষ্ক গ্রীষ্মকাল ও আর্দ্র শীতকালের কারণে এখানে তৃণভূমির পরিমাণ কম। তাই ঘোড়া বা গবাদি পশুর তুলনায় গাধা, ভেড়া, ছাগল, খচ্চর বেশি পালিত হয়। উষ্ণ মরুর কাছাকাছি অঞ্চলে মুরগি, উট বেশি পালিত হয়।

জাগুয়ার

খরগোশ

পশুপালন

আর্থ-সামাজিক পরিবেশ ও জীবনযাত্রা

কৃষিকাজ : নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু, মাঝারি বৃষ্টিপাত এই অঞ্চলকে কৃষিকাজে অত্যন্ত সমৃদ্ধ করেছে। প্রধান উৎপাদিত ফসল গম। এছাড়া যব, তুলা, ভুট্টা, ধান, তামাক সবজি উৎপাদিত হয়। তুঁত গাছের প্রাচুর্য এই অঞ্চলে রেশম শিল্প গড়ে তুলেছে।

ঝলমলে, মনোরম আবহাওয়ায় এই অঞ্চলে প্রচুর মূল্যবান ফল, যেমন —আঙুর, জলপাই, আপেল, ন্যাসপাতি, কমলালেবু, পিচ, খুবানি, আখরোট, বাদাম, কুল, ডুমুর ও নানা ধরনের লেবু প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত হয়। একারণে এই অঞ্চলকে 'ফলের ঝুড়ি' বলা হয়।

জলপাই বাগান

খনিজসম্পদ ও শিল্প : এই অঞ্চল খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ নয়। ক্যালিফোর্নিয়ায় খনিজ তেল, ফ্রান্সে বক্সাইট, ইতালিতে মার্বেল, গন্ধক; স্পেনে লোহা পাওয়া যায়।

অর্থনৈতিকভাবে এই অঞ্চল উন্নত। কৃষিকাজ, ফলের চাষ এবং ফলভিত্তিক বিভিন্ন শিল্প, রপ্তানি ব্যবসা বাণিজ্য প্রধান জীবিকা । ইতালি, ফ্রান্সে আঙুর থেকে উৎকৃষ্ট মদ, জলপাই থেকে অলিভ অয়েল তৈরির শিল্প প্রসিদ্ধ। এগুলো সারা পৃথিবীতে রপ্তানি করা হয়। অন্যান্য কৃষিজ শিল্পের মধ্যে কাঁচা ফল, শুকনো ফল, ফলজাত দ্রব্য (জ্যাম, জেলি, আচার), ময়দা শিল্প প্রভৃতি প্রধান।

মনোরম, রোদঝলমলে আবহাওয়ার জন্য ক্যালিফোর্নিয়ার হলিউডে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র শিল্প কেন্দ্র গড়ে উঠেছে।

জনবসতি — মনোরম, স্বাস্থ্যকর জলবায়ু, উন্নত অর্থনৈতিক পরিকাঠামো, জীবিকা নির্বাহের সহজ সুযোগের কারণে এই অঞ্চল জনবহুল এবং অধিবাসীরা অর্থনৈতিক দিক থেকে যথেষ্ট সমৃদ্ধ। এই অঞ্চলেই অতীতে গ্রিক, মিশরীয় ও রোমান সভ্যতা বিকশিত হয়েছিল।

ক্যালিফোর্নিয়ার লস্ অ্যাঞ্জেলস, সান ফ্রান্সিসকো, ইতালির রোম, নেপলস্, দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউন, অস্ট্রেলিয়ার অ্যাডিলেড, পোর্তুগালের লিসবন এই অঞ্চলের প্রধান নগর, বন্দর ও শিল্পকেন্দ্র।

কেপটাউন

ভেনিস

লস্ অ্যাঞ্জেলস

সান ফ্রান্সিসকো

- লক্ষ করো ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুর কিছু বৈশিষ্ট্য আমাদের দেশের মৌসুমি জলবায়ুর বৈশিষ্ট্যের ঠিক বিপরীত। এই দুই ধরনের জলবায়ুর তুলনা করো।

মৌসুমি জলবায়ু	ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু
• মৌসুমি বায়ু দ্বারা প্রভাবিত।	• .... বায়ু দ্বারা প্রভাবিত।
• গ্রীষ্মকাল উষ্ণ ও ....।	• গ্রীষ্মকাল উষ্ণ ও ....।
• শীতকাল শুষ্ক ও শীতল।	• শীতকাল .... ও ....।
• আর্দ্র .... বায়ুর প্রভাবে বৃষ্টিপাত হয়।	• আর্দ্র .... বায়ুর প্রভাবে বৃষ্টিপাত হয়।
• ঋতুভেদে মৌসুমি বায়ু প্রবাহিত হয়।	• ঋতুভেদে .... ও ....প্রবাহিত হয়।

ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে একই অক্ষাংশে শীতকালে আর্দ্র পশ্চিমা বায়ুর প্রভাবে বৃষ্টি হয়। গ্রীষ্মকালে শুষ্ক আয়ন বায়ু প্রবাহিত হয় বলে বৃষ্টিপাত হয় না।

সূর্যের উত্তরায়ণ-দক্ষিণায়নের সঙ্গে চাপবলয়গুলোর স্থান পরিবর্তন— এর সাথে ওপরের বিষয়টার কী কার্যকারণ সম্পর্ক আছে?

শীতল জলবায়ু

তুন্দ্রা জলবায়ু অঞ্চল

সুমেরু এবং কুমরেু বৃত্ত অঞ্চলের বিশেষ ধরনের শীতল জলবায়ু হলো তুন্দ্রা জলবায়ু। গ্রীষ্মকালে বরফগলে এই জলবায়ু অঞ্চলে কিছু শৈবাল জন্মায়। এই শৈবালের নাম থেকেই 'তুন্দ্রা' জলবায়ুর নামকরণ।

অবস্থান : সুমেরুবৃত্ত ও কুমেরুবৃত্তের নিকটবর্তী উত্তর আমেরিকার কানাডার উত্তরাংশ, আলাস্কা, ইউরেশিয়ার উত্তরাংশ, ইউরোপের নরওয়ে, সুইডেন, ফিনল্যান্ড, গ্রিনল্যান্ড-এর সংকীর্ণ উপকূল অংশে ও এশিয়ার সাইবেরিয়ায় তুন্দ্রা জলবায়ু দেখা যায়।

দক্ষিণ গোলার্ধে আন্টার্কটিকা মহাদেশের কিছু অঞ্চলেও এই জলবায়ু দেখা যায়।

জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য

স্বল্পস্থায়ী শীতল গ্রীষ্মকাল আর দীর্ঘস্থায়ী হিমশীতল শীতকাল এই জলবায়ু প্রধান বৈশিষ্ট্য।

শীতকালীন জলবায়ু : বছরের অধিকাংশ সময় (৮-৯ মাস) শীতকাল। এইসময় তাপমাত্রা ২০° সে থেকে ৪০° সে এ নেমে যায়। সাইবেরিয়ার 'ভারখয়ানস্ক' (উত্তর গোলার্ধের শীতলতম স্থান)-এ জানুয়ারি মাসে গড় তাপমাত্রাথাকে —৫০.৬° সে.। ভয়ংকর শীতে সমস্ত অঞ্চল তুষারে ঢাকা পড়ে যায়। মাঝে মাঝে তুষারপাত, তুষারঝড় চলতে থাকে।

এই সময় আকাশে সূর্যকে প্রায় দেখাই যায় না। একটানা অন্ধকার রাতে মাঝে মাঝে ২-৩ ঘণ্টার জন্য ম্লান রংমধনুর মতো আলোর ছটা (সুমেরু ও কুমেরু প্রভা) দেখা যায়।

গ্রীষ্মকালীন জলবায়ু : দু সপ্তাহব্যাপী বসন্তের পর তুন্দ্রা অঞ্চলে ২-৩ মাসের জন্য স্বল্পস্থায়ী গ্রীষ্মকাল আসে। এইসময় গড় তাপমাত্রা হয় ১০° সে.। আকাশে সূর্য খুব অল্পসময়ের জন্য অস্ত যায়। একটানা ২২-২৩ ঘণ্টা দিনের আলো থাকলেও তির্যক সূর্যরশ্মির জন্য উষ্ণতা বেশি বাড়তে পারে না।

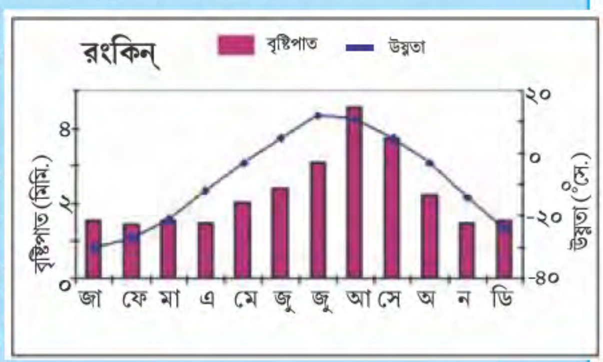

নরওয়ের উত্তরে হ্যামারফেস্ট বন্দর (৭০°৩০´উঃ) ও আশপাশের অঞ্চলে স্থানীয় সময় অনুযায়ী গভীর রাতেও আকাশে সূর্য দেখা যায়। এই অঞ্চলকে 'নিশীথ সূর্যের দেশ' বলে। গ্রীষ্মকালে আকাশ কুয়াশায় ঢাকা থাকে। ২০-৩০ সেমি বৃষ্টি হয়।

জীববৈচিত্র্য

স্বাভাবিক উদ্ভিদ : বছরের বেশিরভাগ সময় তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নীচে থাকায় এই অঞ্চলে কোনো বড়ো গাছ জন্মাতে পারে না।

লাইকেন

মস

ফুল

তিমি

মেরু শিয়াল

মেরু ভাল্লুক

ক্যারিবু

আর্থ-সামাজিক পরিবেশ ও জীবনযাত্রা

অধিবাসীদের জীবনযাত্রা — অত্যন্ত প্রতিকূল জলবায়ু, কষ্টকর জীবনযাত্রার জন্য তুন্দ্রা অঞ্চল জনবিরল। একমাত্র আদিম অধিবাসীরা প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করে বসবাস করে।

১. গ্রিনল্যান্ড, কানাডা ও আলাস্কার উত্তরাংশে এস্কিমো, রেড ইন্ডিয়ান;

২. ইউরেশিয়ার সাইবেরিয়ায় স্যামোয়েদ, ইয়াকুত;

৩. ল্যাপল্যান্ডে ল্যাপ্, ফিনল্যান্ড ফিন উপজাতির মানুষ বসবাস করে।

তীব্র শীতে কৃষিকাজ হয় না, তাই এখানকার অধিবাসীরা যাযাবর জীবনযাপন করে। শীতকালে একরকম গোলাকার বরফের ঘরে (ইগলু) বাস করে। গ্রীষ্মকালে বরফ গলে গেলে সিলমাছের চামড়ায় তৈরি তাঁবুতে (টিউপিক)

এস্কিমো

বাস করে। যাতায়াতের জন্য বরফের ওপর চাকাহীন শ্লেজগাড়ি আর জলে সিল মাছের চামড়ায় তৈরি কায়াক নৌকা ব্যবহার করে। পশুর চামড়া দিয়ে পোশাক আর হাড় দিয়ে শিকারের বর্শা, সূচ তৈরি করে। খাদ্যের জন্য সিল, ভাল্লুক, বলগা হরিণ, মেরু শিয়াল শিকার করে, সমুদ্রের মাছ ধরে। হরিণের দুধ, বেরি ফল এদের প্রিয় খাদ্য।

সাম্প্রতিক পরিবর্তন

বর্তমানে এই অঞ্চলে বেশকিছু খনিজের সন্ধান পাওয়া গেছে যেমন স্পিটস্‌বার্গে কয়লা, সুইডেনের কিরুনা অঞ্চলে আকরিক লোহা, ইউক্রেন ও আলাস্কায় সোনা, খনিজ তেল। ফলে বেশ কিছু শিল্প গড়ে উঠেছে। রেলপথ ও জলপথে এই অঞ্চলের সঙ্গে বহির্বিশ্বের যোগাযোগ বাড়ছে। সাইবেরিয়ার মারমিনস্ক বন্দর থেকে সেন্ট পিটার্সবার্গ পর্যন্ত রেলপথ নির্মিত হয়েছে। উত্তর আমেরিকার আলাস্কা হাইওয়ে তুন্দ্রা অঞ্চলকে অন্যান্য অংশের সঙ্গে যুক্ত করেছে। কিছু অঞ্চলকে বরফমুক্ত করে অথবা গ্রিনহাউসে উন্নত প্রযুক্তিতে চাষবাস করা হচ্ছে। অধিবাসীরা পশুর লোম, চামড়ার বিনিময়ে — চা, কফি, তামাক ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য আমদানি করছে।

বর্তমানে এই অঞ্চলের প্রভূত উন্নতি ঘটছে এবং অধিবাসীরাও ধীরে ধীরে আধুনিক জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হয়ে উঠছে।

হাতে কলমে

• ভারতের কোথায় কোথায় ক্রান্তীয় চিরসবুজ এবং পর্ণমোচী অরণ্য দেখা যায়?

• নিরক্ষীয় বৃষ্টি অরণ্যসহ পৃথিবীর অন্যান্য অরণ্যের ছবি সংগ্রহ করো ঐ অরণ্যের জীববৈচিত্র্য সম্পর্কে তথ্য ও ছবি সংগ্রহ করে কোলাজ তৈরি করো।

মগজাস্ত্র

শীত, গ্রীষ্মে স্থলভাগ ও জলভাগের উষ্ণতা ও বায়ুচাপের তারতম্যের সঙ্গে মৌসুমি বায়ুর উৎপত্তির কি কোনো সম্পর্ক আছে? (সূত্র- জলভাগের তুলনায় স্থলভাগ দ্রুত উত্তপ্ত হয় ও দ্রুত তাপ বিকিরণ করে ঠান্ডা হয়। জলভাগ স্থলভাগের তুলনায় অনেক বেশি সময় ধরে তাপ ধরে রাখতে পারে।)

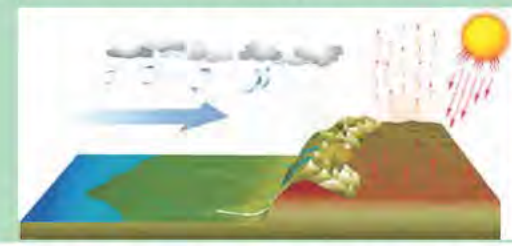

• চারটে বিশেষ জলবায়ু অঞ্চলের প্রাকৃতিক ও আর্থসামাজিক পরিবেশের কার্যকারণ সম্পর্ক সম্বন্ধে তোমার বিশ্লেষণ লিখে ফেলো।

	নিরক্ষীয় জলবায়ু অঞ্চল	মৌসুমি জলবায়ু অঞ্চল	ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু অঞ্চল	তুন্দ্রা জলবায়ু অঞ্চল
প্রাকৃতিক ও আর্থসামাজিক পরিবেশের কার্যকারণ সম্পর্ক				

• কোন জলবায়ু অঞ্চল আর্থ-সামাজিক দিক থেকে সবথেকে এগিয়ে আর কোন জলবায়ু অঞ্চল সবথেকে পিছিয়ে বলে তোমার মনে হয়? এই উন্নতি/অনুন্নতির কারণ হিসাবে তোমার মতামত লিখে ফেলো।

	উন্নতির কারণ	অনুন্নতির কারণ
	জলবায়ু অঞ্চলের নাম	জলবায়ু অঞ্চলের নাম
জলবায়ুর প্রভাব		
অন্যান্য কারণ		

৭ মানুষের কার্যাবলি ও পরিবেশের অবনমন

চারিদিকে পাহাড় ঘেরা নদীর ধারে কর্মযজ্ঞ চলছে। ইঞ্জিনিয়ার, শ্রমিক সবাই ব্যস্ত। জলাধার তৈরি হবে।

দুম! দুম! ডিনামাইট ফাটছে। পাহাড় ভেঙে সমতলের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য রাস্তা তৈরি হবে।

বাদলবাবু বড়ো চাষি। শহরে চাল, সবজি সরবরাহ করেন। উৎপাদন বাড়াতে তাঁকে প্রচুর রাসায়নিক সার, কীটনাশক ছড়াতে হয়।

তুলিদের বাড়ির ছাদ থেকে দেখা যায় দূরের শিল্পাঞ্চলটা। ওখানে কাজ করে প্রচুর লোকজন আর উৎপাদিত হয় নানান দ্রব্য।

ওপরের বিষয়গুলি পড়ে তোমার কী মনে হচ্ছে?

মানুষের কাজকর্ম নানান ধরনের। তাই না? আর এইসব কাজের মধ্যে কোনোটা প্রকৃতির সাথে সরাসরি যুক্ত, কোনোটা প্রযুক্তির ওপর বেশি নির্ভরশীল, আবার কোনো কাজের ধরন সেবামূলক। মানুষের এইসব কাজগুলিকে শ্রেণিবিভাগ করে ফেলা যাক। নিজেদের মধ্যে আলোচনা করো আর কাজগুলিকে তাদের ধরন অনুযায়ী নীচের তালিকায় লিখে ফেলো।

বিভিন্ন কাজের ক্ষেত্র

প্রকৃতি নির্ভর	প্রযুক্তি নির্ভর	সেবা মূলক

এবার ভেবে বলো এইসব কাজ পরিবেশকে কী ভাবে প্রভাবিত করে?

সভ্যতার বিবর্তন ও পরিবেশে তার প্রভাব

পৃথিবীতে আবির্ভাবের পর থেকেই মানুষ নানা ধরনের কাজকর্ম করে চলেছে। সভ্যতার প্রথম পর্যায়ে মানুষ ছিল যাযাবর, গুহাবাসী। এইসময় মানুষের চাহিদা ছিল সামান্য। ফলমূল সংগ্রহ, পশুশিকার, আত্মরক্ষা করেই মানুষের সময় কাটত। তখন তার জীবনযাত্রা সম্পূর্ণভাবে প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল ছিল। এরপর সে আগুনের ব্যবহার শিখল, চাষ করতে জানল আর প্রকৃতিকে ধীরে ধীরে নিজের প্রয়োজনে পরিবর্তন করতে লাগল। চাকার আবিষ্কার সভ্যতাকে গতি প্রদান করল। নতুন দেশ আবিষ্কারের নেশায় সাহসীরা বেড়িয়ে পড়ল অজানার সন্ধানে। এই সময় পর্যন্ত পরিবেশের যে সামান্য ক্ষতি হতো তা নিজে থেকেই পূরণ হয়ে যেত।

প্রাকৃতিক পরিবেশের বিভিন্ন ভৌত ও জৈব প্রক্রিয়াগুলি এমনভাবে কাজ করে যাতে পরিবেশের কোনো অংশে ক্ষতি বা পরিবর্তন হলে তা নিজে থেকেই পূরণ হয়ে যায়। একে **হোমিওস্ট্যাটিক ব্যবস্থা** (Homeostatic mechanism) বলে।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ড তথা ইউরোপের শিল্প বিপ্লব ছিল সভ্যতার অগ্রগতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এর পর থেকে শিল্প, চিকিৎসা, বিজ্ঞান, প্রযুক্তির দ্রুত উন্নতি হতে লাগল। বাড়তে থাকল জনসংখ্যা। বসবাস, কৃষি আর শিল্পের প্রয়োজনে ধ্বংস হতে লাগল অরণ্য। গড়ে উঠতে লাগল রাস্তাঘাট, কলকারখানা, শহর-নগর। নির্বিচারে ব্যবহার হতে থাকল প্রাকৃতিক, খনিজ ও শক্তি সম্পদ (জল, মাটি, অরণ্য, কয়লা, খনিজ তৈল, লোহা, তামা ইত্যাদি)। বিংশ শতাব্দীতে দুটি বিশ্বযুদ্ধ, সামরিক অস্ত্র পরীক্ষা, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষা, অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রভাবে পরিবেশের যে বিপুল পরিবর্তন হচ্ছে তা বর্তমানে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। এর ক্ষতিকর প্রভাব সমস্ত জীবকুলের ওপর নেমে আসছে।

সম্পদের যথেচ্ছ ব্যবহার

পরিবেশ দূষণ

বিশ্বযুদ্ধ, সন্ত্রাসবাদ, সামরিক পরীক্ষা

অরণ্যচ্ছেদন

পরিবহনের বৃদ্ধি

অপরিকল্পিত উন্নয়ন

তাপমাত্রা বৃদ্ধি ও জলবায়ু পরিবর্তন

জনসংখ্যা বৃদ্ধি

পরিবেশের অবনমন কী?

পরিবেশের অবনমন হলো পরিবেশের গুণমান হ্রাস পাওয়া। পরিবেশের এই গুণমানের হ্রাসের ফলে জল, বায়ু, মৃত্তিকা প্রভৃতি প্রাকৃতিক সম্পদ তথা জীবজগৎ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, বাস্তুতন্ত্র ব্যাহত হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে জীব প্রজাতি সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয়। পরিবেশের একটি নির্দিষ্ট সহন ক্ষমতা আছে। বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট কারণে পরিবেশের গুণমান হ্রাস পেয়ে এমন এক অবস্থার সৃষ্টি হয় যে তার ভারসাম্য ও কার্যকরী ক্ষমতা ভেঙে পড়ে। হোমিওস্ট্যাটিক ব্যবস্থার মাধ্যমে পরিবেশ আর সহজে পূর্বাবস্থায় ফিরে আসতে পারে না। যেমন—অতিরিক্ত পরিমাণে অরণ্য বিনাশের ফলে ভূমিক্ষয়, বন্যা, জীববৈচিত্র্য হ্রাস, মরুভূমির প্রসারের মাধ্যমে পরিবেশের সামগ্রিক অবনমন ঘটে।

পরিবেশ দূষণ আর পরিবেশের অবনমন কি এক?

পরিবেশ দূষণ আর অবনমন এই দুটি বিষয়ই পরিবেশের গুণমান হ্রাসের সঙ্গে যুক্ত। তাই অনেকসময় এই দুটি বিষয়কে এক করে দেখা হয়। কিন্তু বিষয় দুটি কিছুটা আলাদা। দূষণ হলো প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট কার্যের ফলে সৃষ্ট পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের দূষিত হওয়া। আর পরিবেশের সামগ্রিক গুণমানের হ্রাস হলো পরিবেশের অবনমন। প্রকৃতপক্ষে পরিবেশ দূষণ পরিবেশের অবনমনকে ত্বরান্বিত করে। যেমন—ভৌমজলে আর্সেনিক মিশলে জল দূষিত হয়। দীর্ঘদিন ধরে এই অবস্থা চলতে থাকলে ভৌমজলের গুণমান হ্রাস পাবে। যার ফলে ভবিষ্যতে পানীয় জলের সংকট, ভূমি অবক্ষয় প্রভৃতি সমস্যা ব্যাপকভাবে দেখা দেবে।

নীচের বিষয়গুলির মধ্যে কোনটি পরিবেশের অবনমন আর কোনটি দূষণের সাথে যুক্ত তা চিহ্নিত করো।
জীব বৈচিত্র্য হ্রাস, মরুভূমির প্রসার, অরণ্য বিনাশ, ঝুম চাষ, পুকুরে মাছ মরে যাওয়া, ভোপালের গ্যাস দুর্ঘটনা, বিমানবন্দরে ধোঁয়াশা, বন্য প্রাণীদের খাদ্য সংকট, নদী বাঁধ ও জলাধার নির্মাণ, সুন্দরবনে আয়লার প্রভাব, মাছের বাজারে দুর্গন্ধ।
তোমার এলাকায় পরিবেশ দূষণ/অবনমনের যে বিষয়গুলি তুমি দেখতে পাও তা শ্রেণিতে আলোচনা করো।

১। বিমল থাকে ওড়িশার গোপালপুরে সমুদ্রের কাছের একটি গ্রামে। ভয়ংকর সাইক্লোন 'ফাইলিনের' তাণ্ডবে ওদের এখন ভীষণ দুরবস্থা। চারিদিকে বাড়িঘর, গাছপালা ভেঙে পড়েছে, সমুদ্রের জল রাস্তা, চাষের জমির ওপর বইছে। গোরু, ছাগলের মৃতদেহ পচে জলে ভাসছে। বিমলদের আস্তানা আপাতত গ্রামের পাকা স্কুল বাড়ি।

২। ময়লা জমা করার মাঠটা শ্রীলেখাদের পাড়া থেকে বেশ কিছুটা দূরে। সারা শহরের আবর্জনা ওখানেই ফেলে নোংরা ফেলার গাড়িগুলো। গৃহস্থালির নোংরা, শিল্পবর্জ্য, হাসপাতালের বর্জ্য-কি জমা নেই ওখানে! দীর্ঘকাল ধরে নোংরা জমে জমে পাহাড়ের মতো হয়ে গেছে। এরফলে আশেপাশের চাষের জমি, জলাশয় ও মানুষের প্রভূত ক্ষতি হচ্ছে।

এবারে বলো পরিবেশ অবনমনের যে দুটি চিত্র আমরা দেখতে পেলাম তাদের জন্য কোন কারণটি দায়ী—

☐ প্রাকৃতিক ☐ মনুষ্যসৃষ্ট

তাহলে আমরা দেখতে পেলাম পরিবেশের অবনমন ঘটে দুভাবে —

ক) **প্রাকৃতিক** — ঝড়, বন্যা, খরা, ভূমিকম্প, অগ্ন্যুৎপাত, সুনামি, ধ্বস প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে ভূপ্রাকৃতিক পরিবেশের পরিবর্তন হয়। একই সঙ্গে প্রাকৃতিক পরিবেশের অবনমন ঘটে। যার প্রভাবে মানুষ তথা বিভিন্ন প্রাণী, উদ্ভিদ, আনুবীক্ষণিক জীবের স্বাভাবিক জীবনচক্র ব্যাহত হয়। ভূপৃষ্ঠের গঠন পরিবর্তিত হয়, রাস্তাঘাট, বাড়িঘর, সম্পত্তি ধ্বংস হয়, জীবনহানি ঘটে। জীববৈচিত্র্য আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হয়।

খ) **মনুষ্যসৃষ্ট** — আধুনিক কৃষি, শিল্প, পরিবহন, নানান উন্নয়ন কার্যকলাপ পরিবেশের স্বাভাবিক চক্রকে ব্যাহত করে। অবৈজ্ঞানিক কৃষি উৎপাদন, শিল্প বর্জ্য, অপরিকল্পিত নগরায়ণ, নদীর স্বাভাবিক গতি রোধ করে জলাধার নির্মাণ, বৃক্ষচ্ছেদন পরিবেশের নানান সমস্যা সৃষ্টি করে আর অবনমন ঘটায়। ধস, বন্যা, ভূমিকম্প, খরা প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ও আজ মানুষের কার্যকলাপের ফলে ঘটছে।

তবে একটা বিষয় বোঝা দরকার যে প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে সৃষ্ট অবনমনগুলি মানুষের জীবনে প্রভাব ফেলে ঠিকই কিন্তু প্রকৃতি ও মানুষ সেই ক্ষতিকে অনেকটা পূরণ করে ফেলতে পারে। অপরদিকে মানুষের বিভিন্ন কার্যের (শিল্পায়ন, কৃষিতে রাসায়নিক সার ও প্রযুক্তির ব্যবহার, পরিবহন, উন্নয়ন) বিরূপ প্রভাবে পরিবেশের অবনমন আজ অপূরণীয় অবস্থায় চলে গেছে।

কয়েকটি উন্নয়ন পরিকল্পনা ও তাদের প্রভাব

	আধুনিক কৃষি পদ্ধতি	নগরায়ন	তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র	বহুমুখী নদী পরিকল্পনা
উদ্দেশ্য	কৃষি উৎপাদন বাড়ানো	মানুষের বাসস্থান ও উন্নত আধুনিক জীবনযাত্রা প্রদান	বিদ্যুৎ উৎপাদন	জলসেচ, জল বিদ্যুৎ উৎপাদন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ
প্রভাব	উৎপাদন বাড়ানোর জন্য ব্যবহৃত বিভিন্ন রাসায়নিক সার, কীটনাশক মাটি ও জলদূষণ ঘটায়। এই দূষিত জল মাটির মধ্যে প্রবেশ করে পুকুর, নদী, জলাশয়ে মেশে। মাছসহ বিভিন্ন জলজ প্রাণীর মৃত্যু ঘটায়। অবৈজ্ঞানিক কৃষি পদ্ধতি জমির উর্বরতা হ্রাস করে।	ভূগর্ভস্থ জলের পরিমাণ কমায়। বায়ু, শব্দ দূষণ সৃষ্টি করে। এলাকায় জল জমার সমস্যা বাড়ায়। তৃতীয় বিশ্বের বড়ো শহরগুলো মূলত অপরিকল্পিত পুরোনো শহরকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। ফলে যানজট, জলনিকাশি, বসতি সমস্যা প্রকট ভাবে দেখা যায়।	পোড়ানো জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে বায়ুতে প্রচুর কার্বন ডাই-অক্সাইড যুক্ত হয়। বায়ুমণ্ডলে তাপমাত্রা বাড়ে, বিকিরণ ও তাপে-র সমতা বিঘ্নিত হয়। তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের বর্জ্য, ছাই পাশের এলাকার জমিতে জমা হয়। উর্বরতা হ্রাস করে।	বিশাল জলাধার নীচের শিলাস্তরে চাপ দেয়। ভূস্তরে দুর্বল অংশে ভূমিকম্প ঘটে (মহারাষ্ট্রের কয়না, ১৯৬৭)। বিস্তীর্ণ এলাকার স্বাভাবিক উদ্ভিদের বিনাশ ঘটে। নদীর ধারণ অববাহিকার অবনমন ঘটে। জলাধার তৈরির সময় প্রচুর মানুষ উদ্বাস্তু হয়। জমিতে অতিরিক্ত পলি সঞ্চারের ফলে চাষের জমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

তোমরা কি জানো আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহার্য অনেক জিনিস পরিবেশের অবনমনে সহায়তা করে। ক্লাসে আলোচনা করে সেইসব বিষয়গুলির একটি তালিকা তৈরি করো। সেগুলি কীভাবে পরিবেশের অবনমন ঘটায় তা শিক্ষক/শিক্ষিকার সাহায্যে লিখে ফেলো।

পরিবেশ অবনমনের ফলে কী ঘটে

ভোপালের গ্যাস দুর্ঘটনার (১৯৮৪ সাল) কথা তোমরা নিশ্চয়ই জানো। ইউনিয়ন কার্বাইডের রাসায়নিক ও কীটনাশক কারখানার ট্যাঙ্ক ফুটো হয়ে বেরিয়ে এসেছিল বিষাক্ত MIC (মিথাইল আইসো সায়নাইড) গ্যাস। মারা গিয়েছিল প্রায় ৪০০০ মানুষ ও অসংখ্য পশুপাখি। প্রায় ২ লক্ষের বেশি লোক কোনো না কোনোভাবে এই গ্যাসের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। এখনও এর প্রভাবে ভুগে চলেছে ওই অঞ্চলের মানুষ। ইউক্রেনের চের্নোবিল (১৯৮৬ সাল) আর জাপানের ফুকুসিমার (২০১১ সাল) পরমাণু দুর্ঘটনা আধুনিক প্রযুক্তির ক্ষতিকর দিকের কথা আমাদেরকে স্মরণ করায়। এবার দেখে নেওয়া যাক মানুষের কাজের ফলে কী কী ধরনের বিপর্যয় ও পরিবেশের অবনমন ঘটে —

পরিবেশ অবনমনের ফল

ভূমিকম্প

জলদূষণ ও জলাভাব

খরা

জীববৈচিত্র্য হ্রাস

বায়ুদূষণ

রাসায়নিক দুর্ঘটনা

মুদ্রাস্ফীতি,
চাহিদা-যোগানের
ভারসাম্য হ্রাস

বিশ্ব উষ্ণায়ন ও
জলবায়ুর পরিবর্তন

প্রাকৃতিক সম্পদের হ্রাস

বন্যা

আগের পৃষ্ঠার ছবিগুলো দেখে তোমার মনে কী প্রতিক্রিয়া হচ্ছে? মানুষের কী কী কাজের ফলে এগুলি ঘটে! আলোচনা করে লিখে ফেলো।

কী হবে ভবিষ্যৎ মানব সমাজের? এই অবনমন নিয়ন্ত্রণের উপায়ই বা কী?

প্রকৃতিকে নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহার করতে করতে আমরা তাকে প্রায় ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছি। মানব সভ্যতা দাঁড়িয়ে রয়েছে সমূহ বিপদের মুখে। লাগাম ছাড়া উন্নয়ন আর পরিবেশ অবনমনের গতি বন্ধ করতে না পারলে ভবিষ্যতে মানব সভ্যতার অস্তিত্ব বিপন্ন হবে।

সচেতন মানুষরা কিন্তু একেবারেই চুপ করে বসে নেই। পরিবেশ বিজ্ঞানীরা প্রতিনিয়ত আলোচনা আন্দোলন করে মানুষকে সচেতন করে চলেছেন। পরিবেশের সুরক্ষার জন্য বেশ কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে—

- পরিবেশ অবনমনের অন্যতম প্রধান কারণ হলো শিক্ষার অভাব ও দারিদ্র্য। উন্নয়নশীল দেশগুলিকে পরিকল্পিত ভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি বাড়াতে হবে। মানুষকে শিক্ষিত, সচেতন করতে হবে।
- উন্নয়নের ক্ষেত্রে পরিবেশ বান্ধব শক্তির বেশি ব্যবহার করতে হবে (সৌরশক্তি, বায়ুশক্তি, জলবিদ্যুৎ ইত্যাদি)।
- সম্পদের পুনর্ব্যবহার করতে হবে এবং পুনর্ব্যবহারযোগ্য দ্রব্যের ক্রয় প্রবণতা বাড়াতে হবে।
- মাথাপিছু প্রাকৃতিক শক্তির ব্যবহারের পরিমাণ কমাতে হবে। উন্নয়নের ক্ষেত্রে জল, বাতাস, মাটি, অরণ্য পরিষ্কার রাখা এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে।
- জনসংখ্যা আর দেশের সম্পদের মধ্যে যাতে ভারসাম্য থাকে তা লক্ষ রাখা প্রয়োজন।
- সরকারি পরিকল্পনা গ্রহণের আগে তার পরিবেশগত প্রভাব চিহ্নিত করা দরকার। উন্নয়ন পরিকল্পনা (রাস্তা তৈরি, নদী পরিকল্পনা, নগর পরিকল্পনা, বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন, শিল্প কারখানা স্থাপন) যাতে পরিবেশের ক্ষতি না করে সেদিকে নজর রাখতে হবে।
- জীবমণ্ডলের বৈচিত্র্য যাতে নষ্ট না হয় সেদিকে সজাগ হতে হবে। বিভিন্ন প্রাণী, উদ্ভিদকে তার নিজস্ব পরিবেশে বাঁচার সুযোগ মানুষকেই করে দিতে হবে।
- সর্বোপরি দেশের সরকারকে পরিবেশ বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে। পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য কঠোর নীতি প্রণয়ন করতে হবে।

১৯৯২ সালে ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরোতে পরিবেশ ও উন্নয়ন বিষয়ে এক সম্মেলন হয়েছিল। **'আর্থ সামিট' (Earth Summit)** নামে পরিচিত এই সম্মেলনে ১৭৮ টি দেশ ও প্রায় ৩০ হাজারের বেশি মানুষ অংশগ্রহণ করেছিল।

উন্নয়নও করতে হবে আবার পরিবেশকেও বাঁচাতে হবে

স্থিতিশীল উন্নয়ন হলো এমন এক ধরনের উন্নয়নের পদ্ধতি যার উদ্দেশ্য বর্তমানে প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও উন্নয়নের সাথে সাথে ভবিষ্যতের মানব সমাজের উন্নয়নের অগ্রগতি অব্যাহত রাখা।

মানব সভ্যতা পিছিয়ে থাকতে পারে না। উন্নয়নের প্রয়োজনে কৃষিতে প্রযুক্তি আনতে হবে, শিল্প গড়তে হবে, রাস্তা করতে হবে, বসবাসের জন্য শহর তৈরি হবে। কিন্তু যে পদ্ধতিতে উন্নয়ন হচ্ছে তাতে পরিবেশের ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে। তাবলে উন্নয়নকে তো আর বন্ধ করে দেওয়া যায় না। উন্নয়ন ও পরিবেশ সংরক্ষণ— দুটোই করতে হবে। সুতরাং এমন একধরনের পদ্ধতিতে উন্নয়নের কথা ভাবতে হবে যা পরিবেশ বান্ধব। এর জন্য পরিবেশ বিজ্ঞানীরা যে বিশেষ ধরনের উন্নয়নের কথা বলেছেন তা হলো স্থিতিশীল উন্নয়ন (Sustainable development)।

পরিবেশ অবনমন ও ভারত

আমাদের দেশ ভারত একটি দ্রুত উন্নয়নশীল দেশ। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে চলছে শিল্পায়ন, রাস্তা নির্মাণ, নগরায়ণ, সম্পদ আহরণ, বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণের কাজ। কিন্তু এই উন্নয়নের সাথে সাথে ঘটে চলেছে পরিবেশের অবনমন ও বিপর্যয়।

- সাম্প্রতিক ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের একটি রিপোর্ট অনুসারে ভারতে পরিবেশ অবনমনের জন্য প্রতিবছরে ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৮০ বিলিয়ান ডলার (প্রায় ৪,৮০,০০০ কোটি টাকা)।
- পরিবেশের অবনমন বিষয়ে ১৩২ টি দেশের একটি সার্ভে রিপোর্টে দেখা গেছে ভারতের স্থান হলো ১২৬ তম। আর মানুষের ওপর বায়ুদূষণের ক্ষতিকর প্রভাবের ক্ষেত্রে ভারত সবচেয়ে শেষে রয়েছে।
- WHO (World Health Organisation) রিপোর্ট অনুসারে G-20 দেশগুলির সবচেয়ে দূষিত ২০টি শহরের মধ্যে ১৩টি ভারতে অবস্থিত।

ভারতের পরিবেশের প্রধান সমস্যাগুলি হলো — অরণ্য ও কৃষিভূমির অবনমন, সম্পদের অপব্যবহার, জনসাধারণের স্বাস্থ্যের অবনমন, অপরিকল্পিত উন্নয়ন, দারিদ্র্য, জীববৈচিত্র্য হ্রাস।

চিপকো আন্দোলন

১৯৭৩ সালে উত্তরাখণ্ডের গাড়োয়াল অঞ্চলের অধিবাসীরা অরণ্যকে রক্ষা করার জন্য এক অনন্য অহিংস আন্দোলন শুরু করেছিল। বনবিভাগের ঠিকাদাররা গাছ কাটতে এলে অধিবাসীরা গাছকে জড়িয়ে ধরে কাটার হাত থেকে বাঁচিয়েছিল। এই আন্দোলন চিপকো (হিন্দিতে 'চিপক যাও' বা চিপকোর মানে হলো জড়িয়ে ধরা) নামে বিখ্যাত।

- আরো অনেক পরিবেশ আন্দোলন হয়েছে ভারতে। এই পরিবেশ আন্দোলনগুলি সম্পর্কে জানার চেষ্টা করো।
- সুন্দরলাল বহুগুনা, বাবা আমতে, মেধা পাটেকর কোন কোন পরিবেশ আন্দোলনের সঙ্গো জড়িত?
- 'গঙ্গা অ্যাকশন প্ল্যান' কী? জেনে নাও শিক্ষক/শিক্ষিকার কাছ থেকে।

পরিবেশের অবনমন : সাম্প্রতিক উদাহরণ

সবুজ বিপ্লবের সাফল্য সবথেকে বেশি দেখা গেছে পাঞ্জাব-হরিয়ানার গম বলয়ে। কিন্তু বর্তমানে নেতিবাচক ফলশ্রুতি হিসাবে এখানে পরিবেশের অবনমন ঘটেছে। অতিরিক্ত পরিমাণে রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহারে এখানকার পরিবেশ তথা জীবজগৎ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, মাটিতে লবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া অধিক পরিমাণে উচ্চফলনশীল বীজের ব্যবহারের ফলে তাৎপর্যপূর্ণ জিনগত ত্রুটি ত্বরান্বিত হয়েছে।

পূর্ব কলকাতার জলাভূমিতে পরিবেশের যথেষ্ট অবনমন বর্তমানে চোখে পড়ছে। জলাভূমি বুজিয়ে দিয়ে জায়গায় জায়গায় অনেক বহুতল বাড়ি তৈরি হয়েছে। ফলে জলতল কমেছে, জলে ও মাটিতে লবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। বৃক্ষচ্ছেদন আর চাষের জমিতে বসতি নির্মাণের ফলে বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য নষ্ট হয়েছে। এছাড়া শহরের আবর্জনা সঞ্চয়ের ফলে এখানকার জল, মাটি ও বায়ু যথেষ্ট পরিমাণে দূষিত হয়েছে।

ক্ষুদ্রভাবে হলেও আমরা কী করতে পারি

- নিজের স্কুল, বাড়ির চারদিক পরিষ্কার রাখো। স্কুল, বাড়ি, রাস্তার ধারে গাছ লাগাও। এলাকায় সবুজায়নের আন্দোলন গড়ে তোলো।
- বিদ্যুৎ, জল প্রভৃতির ব্যবহারের ক্ষেত্রে সচেতন হও। দেখো এইসব সম্পদের যাতে অপচয় না হয়।
- রেফ্রিজারেটর, এসি প্রভৃতি ইলেকট্রনিক যন্ত্র ও ক্রিম, সেন্ট প্রভৃতি প্রসাধনী সামগ্রী যতটা সম্ভব কম ব্যবহার করো। খনিজ তেল ও কাঠ পোড়ানো কম করো।
- বাড়ির বর্জ্য পদার্থের পরিমাণ কমাতে হবে। প্লাসটিক, নাইলন প্রভৃতি পদার্থের ব্যবহার বন্ধ করতে হবে।
- মাঝে মাঝে স্কুল, নিজের এলাকায় পরিবেশ সচেতনতামূলক বিতর্ক, আলোচনাসভা, মিছিলের আয়োজন করে মানুষের সচেতনতা বাড়াতে হবে।

টুকরো খবর

বিশ্ব-জলবায়ুর পরিবর্তনে বড় ধাক্কা ভারতেও

অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ

সমুদ্র অমঙ্গল যে যে কারণে

যত্রতত্র ঘরবাড়ি, আবর্জনা, শোধ নিয়েছে প্রকৃতি

পরিবেশে পর্যটনের থাবা, দেশান্তরী হতে পারে বাঘ

মানুষের তৈরি বিপর্যয়ে শেষ ৫০০০ প্রাণ

জেনেশুনে বিষ...

সবুজ অর্থনীতির পথ খুঁজছে বিশ্ব

ভারতের প্রতিবেশী দেশসমূহ ও তাদের সঙ্গে সম্পর্ক

তোমাদের বাড়ির আশেপাশে যারা থাকে তারা তোমাদের প্রতিবেশী। প্রতিবেশীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখার কারণগুলো চটপট ভেবে ফেলো তো —

কোনো দেশের আশেপাশের দেশগুলোকে সেই দেশের প্রতিবেশী দেশ বলে। মানচিত্র দেখে ভারতের প্রতিবেশী দেশগুলোর নামগুলো জেনে নাও।

নীচের প্রশ্নগুলো দিয়ে ক্লাসে সবাই মিলে দলে ভাগ হয়ে কুইজ খেলো —

- ভারতের প্রতিবেশী দেশের সংখ্যা ক'টি?
- প্রতিবেশী দেশগুলো কোনটি ভারতের কোন দিকে আছে?
- কোন কোন প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে ভারতের স্থলভাগের সীমানা রয়েছে?
- কোন প্রতিবেশী দেশের তিনদিক ঘিরে রয়েছে ভারতের সীমানা?
- সম্পূর্ণ স্থলবেষ্টিত ভারতের দুটি প্রতিবেশী দেশের নাম বলো।
- আরবসাগরকে স্পর্শ করে রয়েছে এমন একটি প্রতিবেশী দেশের নাম করো।
- এমন দুটি প্রতিবেশী দেশের নাম করো যাদের সমুদ্র বন্দর নেই।
- কলকাতা বন্দরের ওপর কোন দুটি প্রতিবেশী দেশ বিশ্ব বাণিজ্যের জন্য নির্ভরশীল?
- ভারত তার কোন কোন প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে সম্পূর্ণ জলপথে বাণিজ্য করে?
- আমাদের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ কোন তিনটি প্রতিবেশী দেশের সীমান্তে অবস্থিত?
- ভারত ও শ্রীলঙ্কা কোন প্রণালী দ্বারা বিচ্ছিন্ন?
- ভারতের এমন দুটি রাজ্যের নাম করো যা তিনটি প্রতিবেশী দেশের সীমান্তকে স্পর্শ করে আছে?

হিমালয় পর্বতের দক্ষিণে ভারত ও তার প্রতিবেশীদেশ যেমন নেপাল, ভুটান, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান, মায়ানমার, চিন, আফগানিস্তান প্রভৃতির সামাজিক মিল খুব বেশি। এদের মধ্যে ভারতের অবস্থান একেবারে মাঝখানে, আর আয়তন ও জনসংখ্যার বিচারে ভারত বৃহত্তম। এককথায় এই অঞ্চলের প্রধান কেন্দ্রবিন্দুই হলো ভারত। তাই এই অঞ্চলকে **ভারতীয় উপমহাদেশ** বলে।

এতক্ষণে নিশ্চয়ই ভেবে ফেলেছ যে তোমরা তোমাদের প্রতিবেশীদের সাথে কেন সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলবে। ভারত ও তার প্রতিবেশী দেশ মিলে শান্তি, স্থায়িত্ব ও অর্থনৈতিক প্রগতির উদ্দেশ্যে SAARC (South Asian Association for Regional Co-operation) তৈরি করেছে। ১৯৮৫ সালে ভারত, বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান, মালদ্বীপ ও আফগানিস্তান এই ৮টি দেশ SAARC সংস্থা গঠন করেছে। এর সদর দপ্তর নেপালের রাজধানী কাঠমাণ্ডুতে। ভারত ও তার প্রতিবেশী দেশগুলোর মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রাখার অন্যতম প্রধান কারণ হলো পণ্যদ্রব্য আদান-প্রদান বা বাণিজ্যিক লেনদেন।

কয়েকটি প্রতিবেশী দেশের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

এক নজরে নেপাল

- উচ্চতম শৃঙ্গ : মাউন্ট এভারেস্ট (৮,৮৪৮ মি)
- প্রধান নদী : কালিগণ্ডক
- রাজধানী : কাঠমাণ্ডু
- প্রধান ভাষা : নেপালি
- প্রধান কৃষিজ ফসল : ধান, গম, পাট, ভুট্টা, জোয়ার, আখ, কার্পাস, কমলালেবু
- প্রধান শিল্প : কাগজ, পাট, সুতিবস্ত্র, চিনি, চর্ম, দেশলাই
- প্রধান প্রধান শহর : পোখরা, বিরাটনগর, জনকপুর

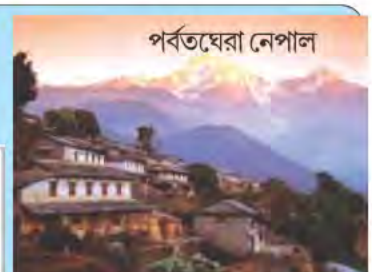
পর্বতঘেরা নেপাল

মাউন্ট এভারেস্ট

নেপালের পর্যটন শিল্প

পোখরা

পর্যটন নেপালের বৃহত্তম শিল্প ও বিদেশি মুদ্রা আহরণের বৃহত্তম উৎস। পৃথিবীর দশটা উঁচু পর্বতশৃঙ্গের মধ্যে আটটা নেপালে অবস্থিত। সারা পৃথিবীর পর্বতারোহীরা নেপালে পর্বতারোহণ করতে আসেন। পৃথিবীর উচ্চতম পর্বতশৃঙ্গ মাউন্ট এভারেস্ট নেপালে রয়েছে যা পর্বতারোহীদের বিশেষ আকর্ষণ। কাঠমাণ্ডু, নাগারকোট, পোখরা, লুম্বিনী, অন্নপূর্ণা প্রভৃতি নেপালের দর্শনীয় স্থান।

এক নজরে ভুটান

থিম্পু

- উচ্চতম শৃঙ্গ : কুলাকাংড়ি (৭৫৫৪ মি)
- প্রধান নদী : মানস
- রাজধানী : থিম্পু
- প্রধান ভাষা : জাংখা
- প্রধান কৃষিজ ফসল : গম, যব, ভুট্টা, বার্লি, আপেল, বড়ো এলাচ, কমলালেবু
- প্রধান শিল্প : সিমেন্ট, কাঠ, জ্যাম-জেলি, পানীয় প্রস্তুত
- প্রধান প্রধান শহর : ফুন্টশোলিং, পারো, পুনাখা

বজ্রপাতসহ প্রবল বৃষ্টি হয় বলে ভুটানকে বজ্রপাতের দেশ বলে।

ভুটানের ফল প্রক্রিয়াকরণ শিল্প

আপেল, কমলালেবু, আনারস প্রভৃতি ভুটানের প্রধান উৎপাদিত ফল। এই সমস্ত ফল থেকে আচার, জ্যাম, জেলি, স্কোয়াশ তৈরিতে ভুটান পৃথিবী বিখ্যাত।

এক নজরে বাংলাদেশ

ঢাকা

- উচ্চতম শৃঙ্গ : কেওক্রাডং (১২৩০ মি)
- প্রধান নদী : মেঘনা
- রাজধানী : ঢাকা
- প্রধান ভাষা : বাংলা
- প্রধান কৃষিজ ফসল : ধান, পাট, ভুট্টা, গম, জোয়ার, কার্পাস, চা, আখ
- প্রধান শিল্প : পাট, কাগজ, চিনি, বস্ত্র, সিমেন্ট, তাঁত ও মৃৎশিল্প
- প্রধান প্রধান শহর : চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট, খুলনা

মেঘনা নদী

বাংলাদেশের কৃষিভিত্তিক শিল্প

কাঁচা পাট

বাংলাদেশ একটি কৃষি প্রধান দেশ। বাংলাদেশে বহু কৃষিজ ও বনজ শিল্প গড়ে উঠেছে। পাট বাংলাদেশের প্রধান শিল্প। প্রায় ৮০ টির কাছাকাছি পাটকল ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, খুলনা, চট্টগ্রামসহ বিভিন্ন শহরে গড়ে উঠেছে। চা শিল্পে বাংলাদেশ অগ্রণী ভূমিকা নেয়। এছাড়া কাগজ, চিনি, রাসায়নিক সার, সিমেন্ট, জাহাজ মেরামতি প্রভৃতি শিল্প গড়ে উঠেছে। বাংলাদেশ কুটির শিল্পে বেশ উন্নত। টাঙ্গাইলের তাঁতের কাপড়, ঢাকার মসলিন জগৎ বিখ্যাত। খনিজ সম্পদ ও শক্তি সম্পদের অভাবের কারণে বাংলাদেশে খনিজ ভিত্তিক শিল্প গড়ে ওঠেনি।

এক নজরে মায়ানমার

ইয়াংগন

- উচ্চতম শৃঙ্গ : কাকাবোরাজি (৫৫৮১ মি)
- প্রধান নদী : ইরাবতী
- রাজধানী : নেপাইদাউ
- প্রধান ভাষা : বর্মি
- প্রধান কৃষিজ ফসল : ধান, ভুট্টা, জোয়ার, যব, তামাক, তৈলবীজ
- প্রধান শিল্প : চিনি, পাট, রেশম
- প্রধান প্রধান শহর : ইয়াংগন, মান্দালয়, মৌলমেন

সোয়েড্যাগন প্যাগোডা

মায়ানমারের খনিজ ও বনজ সম্পদ

সেগুন (বার্মাটিক)

মায়ানমার খনিজ সম্পদে বেশ সমৃদ্ধ। ইরাবতী ও চিন্দুইন নদী অববাহিকায় খনিজ তেল পাওয়া যায়। এছাড়া টিন, সিসা, দস্তা, টাংস্টেন ও মূল্যবান পাথর উত্তোলনে মায়ানমার বিখ্যাত। মূল্যবান রত্ন হিসেবে পদ্মরাগমণির খ্যাতি পৃথিবী জোড়া। মায়ানমারে নানা ধরনের অরণ্য দেখা যায়। গর্জন, চাপলাশ, মেহগনির মতো চিরসবুজ বৃক্ষ; অর্জুন, শাল, সেগুনের মতো পর্ণমোচী বৃক্ষ আবার ঢেউ খেলানো তৃণভূমিও লক্ষ করা যায়।

এক নজরে শ্রীলঙ্কা

কলম্বো

- উচ্চতম শৃঙ্গ : পেড্রোতালাগালা (২৫২৭ মি)
- প্রধান নদী : মহাবলীগঙ্গা
- রাজধানী : শ্রীজয়বর্ধনেপুরা কোট্টে
- প্রধান ভাষা : সিংহলী
- প্রধান কৃষিজ ফসল : ধান, চা, আখ, ভুট্টা, তৈলবীজ, নারকেল ও প্রচুর মশলা
- প্রধান শিল্প : চা, কাগজ, বস্ত্র
- প্রধান প্রধান শহর : কলম্বো, জাফনা, কান্ডি, রত্নপুরা

শ্রীলঙ্কার পর্যটন

শ্রীলঙ্কার কৃষিজ ও খনিজ সম্পদ

শ্রীলঙ্কার আদিবাসীদের প্রধান জীবিকা কৃষিকাজ। বছরে দুবার বর্ষাকাল আসে বলে এখানে প্রচুর পরিমাণে ধান চাষ করা হয়। শ্রীলঙ্কার প্রধান অর্থকরী ফসল হলো নারকেল। উপকূলের ধারে প্রচুর নারকেল গাছের চাষ হয়। এছাড়া তৈলবীজ, তুলো, সিঙ্কোনাও এদেশের অর্থকরী ফসল। চা উৎপাদনে ও রপ্তানিতে শ্রীলঙ্কা পৃথিবীতে বিশিষ্ট স্থান দখল করে। রবার চাষে শ্রীলঙ্কা বিখ্যাত। দারুচিনি, লবঙ্গ, গোলমরিচ প্রভৃতি মশলা উৎপাদনে শ্রীলঙ্কা উল্লেখযোগ্য। খুব বেশি দারুচিনি উৎপাদনের জন্য শ্রীলঙ্কাকে অনেকে 'দারুচিনির দ্বীপ' বলে। খনিজ সম্পদ উত্তোলনে শ্রীলঙ্কা উল্লেখযোগ্য। গ্রাফাইট উৎপাদনে শ্রীলঙ্কা পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে। এছাড়া নীলকান্তমণি, পদ্মরাগমণি, বৈদুর্যমণি প্রভৃতি মূল্যবান রত্ন শ্রীলঙ্কায় পাওয়া যায়।

এক নজরে পাকিস্তান

- উচ্চতম শৃঙ্গ : তিরিচমির (৭৬৯০ মি)
- প্রধান নদী : সিন্ধু
- রাজধানী : ইসলামাবাদ
- প্রধান ভাষা : উর্দু
- প্রধান কৃষিজ ফসল : ধান, গম, আখ, ভুট্টা, তৈলবীজ, তুলা, ডাল
- প্রধান শিল্প : সিমেন্ট, চিনি, বস্ত্র, চর্ম, পশম ও পশমজাত দ্রব্য
- প্রধান প্রধান শহর : করাচি, লাহোর, পেশোয়ার

ইসলামাবাদ

পাকিস্তানের জলসেচ ও কৃষিকাজ

বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কম হওয়া সত্ত্বেও পাকিস্তান কৃষিকাজে বেশ উন্নত। পাকিস্তানের কৃষিকাজ মূলত জলসেচের ওপর নির্ভরশীল। পাকিস্তানের জলসেচ প্রধানত খালের মাধ্যমে হয়ে থাকে। সিন্ধু ও তার উপনদীগুলোতে বাঁধ দিয়ে জলাধার তৈরি করা হয়েছে। জলধারগুলো থেকে একাধিক সেচ খাল কাটা হয়েছে। পাকিস্তানের বেশিরভাগ জলসেচ এইভাবে করা হয়। তবে পশ্চিমের শুষ্ক অঞ্চলে মাটির নীচে সুড়ঙ্গ কেটে কৃষিক্ষেত্রে জল নিয়ে যাওয়ার প্রথা আছে, যার নাম ক্যারেজ প্রথা।

সেচ খাল

অন্যান্য অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও জলসেচের সুবিধা থাকায় পাকিস্তান কৃষিকাজে উন্নত। গম, ধান, জোয়ার, বাজরা প্রভৃতি খাদ্যফসল; তুলো, আখ ও বিভিন্ন ফল যেমন আপেল, বেদানা, খেজুর, পিচ প্রভৃতি পাকিস্তানের প্রধান কৃষি দ্রব্য।

ভারত থেকে প্রতিবেশী দেশগুলিতে যে যে দ্রব্য সামগ্রী রপ্তানি করা হয় এবং ভারতের প্রয়োজনে প্রতিবেশী দেশগুলি থেকে যে যে দ্রব্য সামগ্রী আমদানি করা হয় তার তালিকা দেওয়া হলো।

প্রতিবেশী দেশ	ভারতের রপ্তানি দ্রব্য	ভারতের আমদানি দ্রব্য
নেপাল	পেট্রোপণ্য, গাড়ি ও গাড়ির যন্ত্রাংশ, তুলো, রাসায়নিক সার, পোশাক।	কাঁচাপাট, তৈলবীজ, ডাল, চামড়া, কার্পেট।
ভুটান	কাগজ, ওষুধ, কয়লা, ইস্পাত, চিনি, নুন, যন্ত্রপাতি।	বড়ো এলাচ, বিভিন্ন ফল, জ্যাম, জেলি, পশম ও পশমজাত দ্রব্য।
বাংলাদেশ	মোটরগাড়ি, ওষুধ, চিনি, যন্ত্রপাতি, কয়লা, ইস্পাত, শস্যবীজ, ইমারতি দ্রব্য।	কাঁচাপাট, কাগজ, তামাক, সুপারি, চামড়া, ইলিশ মাছ, প্রাকৃতিক গ্যাস।
মায়ানমার	ইস্পাত, কয়লা, পাটজাত দ্রব্য, সুতিবস্ত্র, রাসায়নিক দ্রব্য, পরিবহনের সরঞ্জাম।	সেগুন ও শালকাঠ, রুপা, টিন, টাংস্টেন, মূল্যবান পাথর।
শ্রীলঙ্কা	চিনি, ইস্পাত, কয়লা, পাটজাত দ্রব্য, বস্ত্র, ওষুধ।	লবঙ্গ, দারুচিনি, গ্রাফাইট, চামড়া, মূল্যবান রত্ন, নারকেল জাত দ্রব্য।
পাকিস্তান	ইস্পাত, কয়লা, আকরিক লোহা, চা, ওষুধ, যন্ত্রপাতি।	উন্নত কার্পাস, শুকনো ফল, কার্পেট, চামড়া।

উত্তর আমেরিকা

পৃথিবীর বিখ্যাত গিরিখাত
গ্রান্ড ক্যানিয়ন

অত্যাধুনিক শহর

পৃথিবীর বিখ্যাত
জলপ্রপাত নায়গ্রা

পৃথিবীর বৃহত্তম দ্বীপ
গ্রিনল্যান্ড

পৃথিবীর বৃহত্তম সুপেয়
জলের হ্রদ সুপিরিয়র

পৃথিবীর ব্যস্ততম বিমান
বন্দর আটলান্টা

- পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধে ত্রিভুজাকৃতির এই মহাদেশ পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম মহাদেশ।
- আয়তনে ভারতের প্রায় ছয় গুণ।
- ১৫০১ খ্রি. আমেরিগো ভেসপুচি নামে এক পোর্তুগিজ নাবিক এই মহাদেশটি আবিষ্কার করেন।

আমেরিকা অভিযান

আজ থেকে প্রায় ৫০০ বছর আগে উত্তর আমেরিকা মহাদেশটির কথা মানুষের কাছে অজানা ছিল। ১৪০০ এবং ১৫০০ খ্রিস্টাব্দে ইউরোপীয় অধিবাসীগণ নতুন নতুন দেশ আবিষ্কারের নেশায় পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে অভিযান শুরু করে। ১৪৯২ খ্রিস্টাব্দে ইতালির নাবিক **ক্রিস্টোফার কলম্বাস** ইউরোপ থেকে ভারতে আসার জলপথ আবিষ্কার করতে গিয়ে বর্তমান উত্তর আমেরিকা মহাদেশের পূর্বদিকের দ্বীপপুঞ্জে উপস্থিত হয়ে ওই দ্বীপগুলিকেই 'ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ' বলে মনে করেন। পরবর্তীকালে ১৫০১ খ্রিস্টাব্দে **আমেরিগো ভেসপুচি** নামে আর এক পোর্তুগিজ নাবিক কলম্বাসের পথ অনুসরণ করে উত্তর আমেরিকা মহাদেশের মূল ভূখণ্ডে এসে উপস্থিত হন। তিনি তখন অনুভব করেন এটা ভারতবর্ষ নয়, এটা একটা অজানা ভূখণ্ড। তিনি তার নিজের নাম অনুসারেই এই মহাদেশের নামকরণ করেন আমেরিকা মহাদেশ।

একনজরে
উত্তর আমেরিকা

- **অবস্থান :** মহাদেশটি দক্ষিণে ৭° উত্তর অক্ষাংশ থেকে উত্তরে ৮৪° উত্তর অক্ষাংশ পর্যন্ত এবং পূর্ব দিকে ২০° পশ্চিম দ্রাঘিমা থেকে পশ্চিমে ১৭৩° পশ্চিম দ্রাঘিমা পর্যন্ত বিস্তৃত।
- **সীমা :** মহাদেশটির চারপাশ লক্ষ করলে দেখতে পাবে প্রায় সবদিকেই সাগর-মহাসাগর দিয়ে ঘেরা। যেমন উত্তরে উত্তর মহাসাগর, পূর্বে আটলান্টিক মহাসাগর এবং দক্ষিণ ও পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগর রয়েছে।
- উত্তর আমেরিকা মহাদেশটির উত্তরে অবস্থিত বেরিং প্রণালী মহাদেশটিকে এশিয়া মহাদেশ থেকে পৃথক করেছে। আর দক্ষিণে অবস্থিত পানামা খাল মহাদেশটিকে দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশ থেকে পৃথক করেছে।
- **প্রধান নদী :** মিসিসিপি-মিসৌরি (৬,২৭০ কিমি)।
- **উচ্চতম শৃঙ্গ :** ম্যাককিনলে (৬,১৯৫ মি)।
- **দেশের সংখ্যা :** ২৩ টি।
- **বিখ্যাত শহর :** ওয়াশিংটন ডিসি, নিউইয়র্ক, ক্যালিফোর্নিয়া, মেক্সিকো সিটি, শিকাগো, টরেন্টো।

পানামা যোজক ও পানামা খাল :

দুটি মহাদেশকে একসঙ্গে যুক্ত করে যে সংকীর্ণ ভূখণ্ড তা হলো যোজক। উত্তর আমেরিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের মাঝে অবস্থিত সংকীর্ণ ভূখণ্ডটি হলো পানামা যোজক।

১৯১৪ সালে পানামা যোজকটিকে কেটে পানামা খালপথ তৈরি করা হয়। এর ফলে উত্তর আমেরিকার পূর্ব উপকূল ও ইউরোপের সঙ্গে দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম উপকূলের নৌ-যোগাযোগ অনেক সহজ হয়েছে।

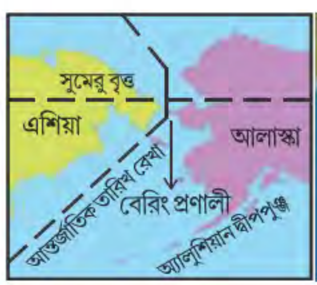

- পৃথিবীর মানচিত্রে আর কোথায় কোথায় যোজক দেখা যায় তা খুঁজে তালিকা তৈরি করো।
- উত্তর আমেরিকাকে নবীন বিশ্ব বলার কারণ কী?

উত্তর আমেরিকা
রাজনৈতিক
কিমি ৩০০ ০ ৩০০ ৬০০ ৯০০ কিমি
এশিয়া
আর্কটিক সাগর
বেরিং প্রণালী
আলাস্কা
পর্কুপাইন
গ্রিনল্যান্ড
ডেনমার্ক প্রণালী
ডেভিস প্রণালী
বাফিন দ্বীপ
ভিক্টোরিয়া দ্বীপ
গ্রেটবিয়ার হ্রদ
উত্তর পশ্চিম অঞ্চল
গ্রেটস্লেভ হ্রদ
কা না ডা
হাডসন প্রণালী
ল্যাব্রাডর সাগর
বেলে আইল প্রণালী
হাডসন উপসাগর
নিউফাউন্ডল্যান্ড
আলবের্তা
ব্রিটিশ কলম্বিয়া
কুইবেক
সাসকাটচেওয়ান
অন্টারিও
উইনিপেগ
অটোয়া
ওয়াশিংটন
মন্টানা
উইসকনসিন
স্যাডবেরি
পেনসিলভেনিয়া
ডেট্রয়েট
নিউইয়র্ক
নেভাদা
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র
শিকাগো
নিউ জার্সি
ওয়াশিংটন ডি সি
সানফ্রানসিসকো
কলোরাডো
কানসাস
ক্যালিফোর্নিয়া
কেনটাকি
লস এঞ্জেলেস
ওকলাহোমা
আরিজোনা
উত্তর আটলান্টিক মহাসাগর
আলাবামা
জর্জিয়া
টেক্সাস
ফ্লোরিডা
প্রশান্ত মহাসাগর
ক্যালিফোর্নিয়া উপসাগর
মেক্সিকো
হাভানা
ফ্লোরিডা প্রণালী
ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্র
মেক্সিকো উপসাগর
কিউবা
হাইতি
জামাইকা
মেক্সিকো সিটি
গুয়াতেমালা
হন্ডুরাস
ক্যারিবিয়ান সাগর
নিকারাগুয়া
এল সালভাডর
কোস্টারিকা
পানামা
দঃ আমেরিকা
৭০° উ:
৮০° উ:
৬০° উ:
৫০° উ:
৪০° উ:
৩০° উ:
২০° উ:
১১০° প:
১০০° প:
৯০° প:

উত্তর আমেরিকার প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য

ভূপ্রাকৃতিক বৈচিত্র্য

ভূপ্রকৃতির তারতম্যের ভিত্তিতে উত্তর আমেরিকা মহাদেশকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়—

➢ **পশ্চিমের পার্বত্য অঞ্চল বা কর্ডিলেরা**—এই অঞ্চলটি উত্তর আমেরিকা মহাদেশের পশ্চিম প্রান্তে প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূল বরাবর উত্তরে বেরিং প্রণালী থেকে শুরু করে দক্ষিণে পানামা খাল পর্যন্ত বিস্তৃত। এই কর্ডিলেরা আরও দক্ষিণ দিকে আন্দিজ নামে দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশে প্রসারিত হয়েছে। এই পার্বত্য অঞ্চলটি হিমালয় পার্বত্য অঞ্চলের মতই নবীন ভঙ্গিল পর্বত। প্রশান্ত মহাসাগরীয় পাত ও উত্তর আমেরিকা মহাদেশীয় পাতের অভিসারী সীমানা বরাবর সংঘর্ষের ফলে এই নবীন ভঙ্গিল পর্বতের সৃষ্টি হয়েছে। এর মধ্যভাগ চওড়া ও দু-প্রান্ত ক্রমশ সরু হয়ে গেছে। এখানকার প্রধান প্রধান পর্বতশ্রেণিগুলি হলো— কোস্ট রেঞ্জ, আলাস্কা রেঞ্জ ও ব্রুকস রেঞ্জ। এদের মধ্যে আলাস্কা রেঞ্জের মাউন্ট ম্যাককিনলে (৬১৯৫ মি) এই পার্বত্য অঞ্চল তথা উত্তর আমেরিকা মহাদেশের উচ্চতম শৃঙ্গ। পশ্চিমের এই পার্বত্য অঞ্চলে প্রধানত যেসব নদীগুলি প্রবাহিত হয়েছে তা হলো - ইউকন, কলোরাডো, কলম্বিয়া, ফ্রেজার ইত্যাদি। এই নদীগুলো প্রবাহপথে অনেক উপত্যকা, অবনমিত অঞ্চল ও গিরিখাত সৃষ্টি করে পশ্চিমদিকে প্রবাহিত হয়ে প্রশান্ত মহাসাগরে মিলিত হয়েছে।

মাউন্ট ম্যাককিনলে

মৃত্যু উপত্যকা

মৃত্যু উপত্যকা—পশ্চিমের পার্বত্য অঞ্চলের ক্যালিফোর্নিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব অংশের এই উপত্যকা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৯০ মিটার নিচু। তাই এই অঞ্চলে প্রাপ্ত সামান্য জলের লবণতা এত বেশি যে এখানে কোনো জীব বেঁচে থাকতে পারে না। এই গভীর উপত্যকা মৃত্যু উপত্যকা নামে পরিচিত। এই উপত্যকা উত্তর আমেরিকার উষ্ণতম (৫৬° সে) স্থান এবং পশ্চিম গোলার্ধের নিম্নতম স্থান।

কর্ডিলেরা—শব্দটির অর্থ হলো শৃঙ্খল। উত্তর আমেরিকা মহাদেশের পশ্চিমে পার্বত্য অঞ্চলে কতকগুলো সমান্তরাল নবীন ভঙ্গিল পর্বতমালা নিয়ে এই কর্ডিলেরার সৃষ্টি হয়েছে।

➢ **মধ্যভাগের সমভূমি অঞ্চল** — পশ্চিমের পার্বত্য অঞ্চল ও পূর্বভাগের উচ্চভূমি অঞ্চলের মাঝখানে উত্তরে সুমেরু থেকে দক্ষিণে মেক্সিকো উপসাগর পর্যন্ত এক বিশাল অঞ্চল জুড়ে এই সমভূমি অবস্থান করছে। এইজন্য এই সমভূমি অঞ্চল বৃহৎ সমভূমি বা Great plain নামে পরিচিত। মধ্যভাগের সমভূমি অঞ্চল প্রধানত ম্যাকেঞ্জি, সেন্ট লরেন্স, মিসিসিপি-মিসৌরি প্রভৃতি নদীগুলোর অববাহিকার অন্তর্গত। এই অঞ্চলটি পুরোপুরি সমতল নয়, কোথাও মাঝে মাঝে পাহাড়, টিলা ও নিম্ন মালভূমি আছে। সব মিলিয়ে অঞ্চলটিকে তরঙ্গায়িত বলা যায়। এই সমভূমির উত্তর দিকে হাডসন উপসাগরকে বেষ্টন করে ক্যানাডিয়ান শিল্ড অবস্থান করছে। এটি পৃথিবীর প্রাচীনতম ভূখণ্ডের অংশবিশেষ। দীর্ঘদিন ধরে হিমবাহের ক্ষয়কার্যের ফলে এই অঞ্চলটি একটি সমপ্রায়ভূমিতে পরিণত হয়েছে। এই সমপ্রায়ভূমি

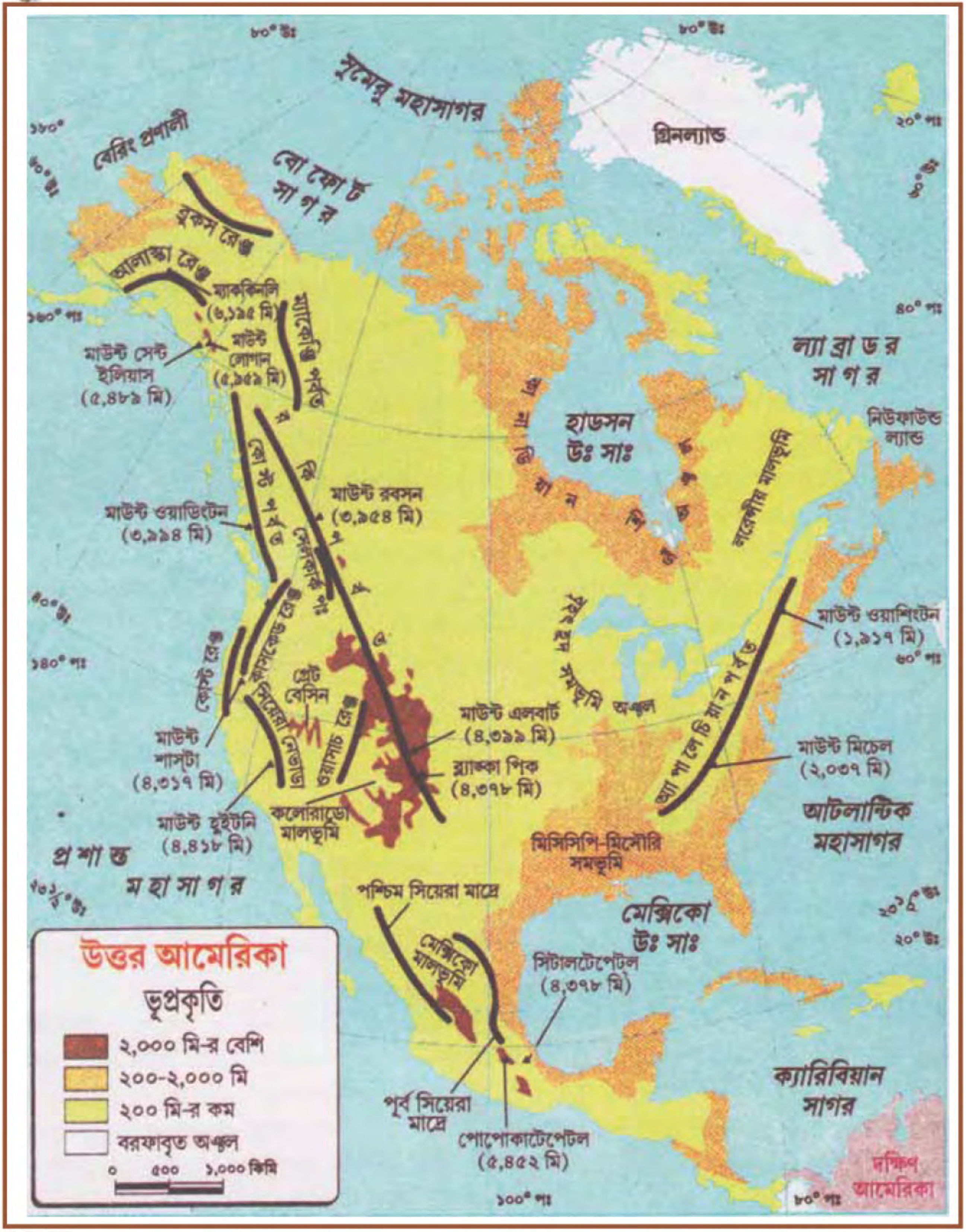
উত্তর আমেরিকা
ভূপ্রকৃতি
২,০০০ মি-র বেশি
২০০-২,০০০ মি
২০০ মি-র কম
বরফাবৃত অঞ্চল
০ ৫০০ ১,০০০ কিমি
সুমেরু মহাসাগর
বেরিং প্রণালী
বো ফো র্ট সা গ র
গ্রিনল্যান্ড
ব্রুকস রেঞ্জ
আলাস্কা রেঞ্জ
ম্যাককিনলি (৬,১৯৫ মি)
মাউন্ট লোগান (৫,৯৫৯ মি)
মাউন্ট সেন্ট ইলিয়াস (৫,৪৮৯ মি)
ম্যাকেঞ্জি পর্বত
ল্যা ব্রা ড র সা গ র
হাডসন উঃ সাঃ
নিউফাউন্ড ল্যান্ড
লরেন্সীয় মালভূমি
মাউন্ট রবসন (৩,৯৫৪ মি)
মাউন্ট ওয়াডিংটন (৩,৯৯৪ মি)
কো স্ট পর্বত
মাউন্ট ওয়াশিংটন (১,৯১৭ মি)
কোস্ট রেঞ্জ
ক্যাসকেড রেঞ্জ
গ্রেট বেসিন
সিয়েরা নেভাডা
ওয়াসাচ রেঞ্জ
মাউন্ট এলবার্ট (৪,৩৯৯ মি)
ব্ল্যাঙ্কা পিক (৪,৩৭৮ মি)
মাউন্ট শাস্টা (৪,৩১৭ মি)
মাউন্ট হুইটনি (৪,৪১৮ মি)
কলোরাডো মালভূমি
মাউন্ট মিচেল (২,০৩৭ মি)
অ্যা পা লে চি য়া ন পর্বত
আটলান্টিক মহাসাগর
মিসিসিপি-মিসৌরি সমভূমি
প্র শা ন্ত ম হা সা গ র
পশ্চিম সিয়েরা মাদ্রে
মেক্সিকো উঃ সাঃ
মেক্সিকো মালভূমি
সিটালটেপেটল (৪,৩৭৮ মি)
পূর্ব সিয়েরা মাদ্রে
পোপোকাটেপেটল (৫,৪৫২ মি)
ক্যারিবিয়ান সাগর
দক্ষিণ আমেরিকা

কোথাও কোথাও ক্ষয়কার্যের ফলে অবনমিত হয়ে হ্রদ সৃষ্টি করেছে। এদের মধ্যে উইনিপেগ, গ্রেট বিয়ার, আথাবাস্কা, গ্রেট স্লেভ ইত্যাদি হ্রদ বিখ্যাত। এই সমভূমি অঞ্চলের দক্ষিণ-পূর্ব অংশেও হিমবাহের ক্ষয়কার্যের ফলে পাঁচটি বৃহৎ হ্রদের সৃষ্টি হয়েছে। যেমন - সুপিরিয়র (পৃথিবীর বৃহত্তম মিষ্টি জলের হ্রদ), মিশিগান, হুরন, ইরি ও অন্টারিও। এই পাঁচটি হ্রদকে একত্রে পঞ্চহ্রদও বলা হয়। ভূমিরূপের বৈচিত্র্য অনুসারে এই বিশাল সমভূমি অঞ্চলকে চারটি ভাগে ভাগ করা যায়—

প্রেইরি সমভূমি

সেন্ট লরেন্স নদীর অববাহিকার সমভূমি— পূর্বের উচ্চভূমি অঞ্চল ও ক্যানাডিয়ান শিল্ড অঞ্চলের মধ্যবর্তী অংশ।

হ্রদ অঞ্চলের সমভূমি— পঞ্চ হ্রদের (সুপিরিয়র, মিশিগান, হুরন, ইরি, অন্টারিও) দক্ষিণ তীরের এলাকা এর অন্তর্গত।

প্রেইরি সমভূমি— মধ্যভাগের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে এই সমভূমি অবস্থিত। এখানকার সমভূমি মূলত তৃণাঞ্চল তাই একে প্রেইরি তৃণভূমিও বলা হয়।

মিসিসিপি-মিসৌরির অববাহিকার সমভূমি— পূর্বদিকের উচ্চভূমি ও পশ্চিমের পার্বত্য অঞ্চলের মধবর্তী অংশ। এই সমভূমির দক্ষিণে পাখির পায়ের মতো মিসিসিপি-মিসৌরি নদীর বদ্বীপ সৃষ্টি হয়েছে।

➢ **কানাডীয় বা লরেন্সীয় উচ্চভূমি —** মহাদেশের উত্তরে হাডসন উপসাগরকে কেন্দ্র করে এই সুবিস্তীর্ণ উচ্চভূমি অবস্থিত। এই উচ্চভূমিকে কানাডীয় শিল্ডও বলা হয়। অতি প্রাচীন শিলা দ্বারা এই শিল্ড অঞ্চল গঠিত। বহু বছর ধরে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে অঞ্চলটি উচ্চভূমি বা মালভূমির আকার ধারণ করেছে। এই উচ্চভূমিকে লরেন্সীয় মালভূমিও বলা হয়।

➢ **পূর্বদিকের উচ্চভূমি —** উত্তরে ল্যাব্রাডর থেকে দক্ষিণে আলাবামা পর্যন্ত উত্তর আমেরিকা মহাদেশের সমগ্র পূর্ব ভাগ পূর্বের উচ্চভূমি অঞ্চলের অন্তর্গত। সমগ্র উচ্চভূমি অঞ্চলটি তিনটি উচ্চভূমি নিয়ে গঠিত। যেমন— উত্তরের ল্যাব্রাডর মালভূমি, মধ্যভাগের নিউ ইংল্যান্ড উচ্চভূমি এবং সবার দক্ষিণে অ্যাপালেশিয়ান পার্বত্য অঞ্চল। অ্যাপালেশিয়ান পার্বত্য অঞ্চলটি প্রকৃতপক্ষে একটি প্রাচীন ভঙ্গিল পর্বতমালা। দীর্ঘদিন ধরে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে বর্তমানে এটি একটি উচ্চভূমিতে পরিণত হয়েছে। এই পার্বত্য অঞ্চলের বেশিরভাগ স্থানই ২০০০ মিটারেরও কম উঁচু। অ্যাপালেশিয়ানের ব্লু রিজ পর্বতের মাউন্ট মিশেল (২০৩৭ মিটার) এই উচ্চভূমি অঞ্চলের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ। এই অঞ্চলের সেন্ট লরেন্স নদীর অববাহিকা অ্যাপালেশিয়ান পার্বত্য অঞ্চল ও লরেন্সীয় মালভূমিকে পৃথক করেছে।

অ্যাপালেশিয়ান পার্বত্য অঞ্চল

উত্তর আমেরিকার প্রধান নদনদী সমূহের পরিচয়

নদনদীর নাম	উৎস	মোহনা	উপনদীর নাম	বিশেষ বৈশিষ্ট্য
সেন্ট লরেন্স (১১২০ কিমি)	অন্টারিও হ্রদ	আটলান্টিক মহাসাগর	অটোয়া এবং সেন্টমুরসি	পরিবহনে এই নদীর গুরুত্ব খুব বেশি। নায়গ্রা জলপ্রপাত এই নদীর ওপর সৃষ্ট।
মিসিসিপি-মিসৌরি	সুপিরিয়র হ্রদের পশ্চিমের পর্বত	মেক্সিকো উপসাগর	মিসৌরি, আরকানসাস, রেড	উত্তর আমেরিকার দীর্ঘতম নদী।
কলোরাডো (২৩০০ কিমি)	রকি পার্বত্য অঞ্চল	ক্যালিফোর্নিয়া উপসাগর	ইউকন, ফ্রেজার, কলম্বিয়া	সেচ ও জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য বাঁধ ও জলাধার নির্মাণ করা হয়েছে। গ্র্যান্ড ক্যানিয়ান এই নদীর অববাহিকায় দেখা যায়।
ম্যাকেঞ্জি (৪২০০ কিমি)	আথাবাস্কা হ্রদ	উত্তর সাগর	পিস, লিয়ার্ড, লি	শীতকালে নৌ পরিবহনযোগ্য নয় কিন্তু গ্রীষ্মকালে এই নদীতে নৌকা ও স্টিমার চালানো যায়।
কলম্বিয়া (১৯৫৪ কিমি)	সেলকির্ক পর্বত	প্রশান্ত মহাসাগর	স্নেক , স্পোকেন	বন্যা নিয়ন্ত্রণ , সেচ ও জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য অনেকগুলো বাঁধ ও জলাধার নির্মাণ করা হয়েছে।

গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন—

কলোরাডো নদীর সুদীর্ঘ পথ মরুভূমি অঞ্চলের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। সাধারণত মরু অঞ্চলে নদী নীচের দিকে বেশি ক্ষয় করে। তাই নদী উপত্যকা খুব গভীর হয়। এই কলোরাডো নদীর শুষ্ক প্রবাহপথেই সুগভীর গিরিখাত গ্র্যান্ড ক্যানিয়নের সৃষ্টি হয়েছে। এর দৈর্ঘ্য প্রায় ৪৪৬ কিলোমিটার। কোনো কোনো অংশে এর গভীরতা ১৬০০ মিটারেরও বেশি।

আরও জেনে নাও

- মিসিসিপি নদীর প্রধান উপনদী মিসৌরি।
- টেনেসি নদীর ওপর বিশ্বের বৃহত্তম 'নদী উপত্যকা পরিকল্পনা' গড়ে উঠেছে।
- মরুপ্রায় ক্যালিফোর্নিয়া উপত্যকাকে কৃষিপ্রধান অঞ্চলে রূপান্তরিত করেছে কলোরাডো নদী।

- শীতকালে উত্তর আমেরিকার উত্তরের নদীগুলো নৌপরিবহনযোগ্য নয় কেন?

জলবায়ু

উত্তর আমেরিকা মহাদেশটির আকৃতি অনেকটা ওলটানো ত্রিভুজের মতো। মহাদেশটির উত্তরের অংশ বেশি চওড়া। মধ্যভাগের অঞ্চলগুলো সমুদ্র থেকে বহু দূরে অবস্থিত হওয়ায় এখানকার জলবায়ু মহাদেশীয় বা চরম প্রকৃতির। আবার দক্ষিণ দিকের অংশ সরু। এই অংশ সমুদ্রের কাছাকাছি অবস্থিত হওয়ায় জলবায়ু সামুদ্রিক বা সমভাবাপন্ন প্রকৃতির।

মানচিত্র দেখে এই মহাদেশের সমভাবাপন্ন ও চরম প্রকৃতির জলবায়ুযুক্ত শহরগুলির নামের তালিকা তৈরি করো।

আকৃতি ছাড়া অন্যান্য কারণেও এই মহাদেশের জলবায়ুর বৈচিত্র্য দেখা যায়।

জলবায়ুর বৈচিত্র্যের কারণ

অক্ষাংশগত অবস্থান

উত্তর আমেরিকার বেশিরভাগ অংশই ৩০°-৬০° উত্তর অক্ষাংশের মধ্যে অবস্থিত হওয়ায় মহাদেশটির অধিকাংশই নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ুর অন্তর্গত। দক্ষিণে মেক্সিকোর ওপর দিয়ে কর্কটক্রান্তি রেখা বিস্তৃত হওয়ায় মেক্সিকো, মধ্য আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জের বিভিন্ন স্থানে ক্রান্তীয় জলবায়ু দেখা যায়। আবার মহাদেশটির উত্তরাংশ সুমেরু বৃত্তের মধ্যে পড়ায় এই অঞ্চলে তুন্দ্রা ও শীতল মেরু জলবায়ু দেখা যায়।

উত্তর আমেরিকা মহাদেশের জলবায়ুর ওপর অক্ষাংশের প্রভাব নিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করো।

সমুদ্রস্রোত

শীতল লাব্রাডর স্রোতের প্রভাবে উত্তর আমেরিকা মহাদেশের উত্তর-পূর্ব উপকূলভাগ বছরের বেশিরভাগ সময় বরফাবৃত থাকে। আবার শীতল ক্যালিফোর্নিয়া স্রোতের প্রভাবে মহাদেশটির দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে ক্যালিফোর্নিয়া উপকূলভাগ বেশ ঠান্ডা থাকে। মহাদেশটির দক্ষিণ-পূর্বে প্রবাহিত উষ্ণ উপসাগরীয় স্রোতের প্রভাবে ওই অঞ্চলের উপকূলভাগের জলবায়ু উষ্ণ থাকে।

সমুদ্রস্রোত কোথাও শীতল আবার কোথাও উষ্ণ হয় কেন?

বায়ুপ্রবাহ

বসন্তের শুরুতে রকি পর্বতের পূর্বঢাল বরাবর চিনুক নামে এক উষ্ণ স্থানীয় বায়ু প্রবাহিত হয়। এই বায়ুর জলীয়-বাষ্প ধারণের ক্ষমতা বেড়ে যাওয়ায় ওই অঞ্চলে বৃষ্টিপাত কম হয়। যার জন্য বড়ো গাছপালার বদলে ঘাস ও ঝোপঝাড় জাতীয় উদ্ভিদ দেখা যায়। এই অঞ্চল প্রেইরি তৃণভূমি নামে পরিচিত।

রকি পর্বতের পূর্বঢালে বসন্তের শুরুতে শুষ্ক আবহাওয়া সৃষ্টি হয় কেন?

পর্বতের অবস্থান

মহাদেশটির পূর্বদিকে অ্যাপালেশিয়ান পার্বত্য অঞ্চল এবং পশ্চিম দিকে কর্ডিলেরা উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত হওয়ায় মধ্যভাগে সমুদ্রের প্রভাব খুব কম। এছাড়া মহাদেশটির উত্তর দিক থেকে হিম শীতল মেরুবায়ু প্রবেশ করে বিনা বাধায় বহুদূর পর্যন্ত প্রবাহিত হয়। আবার দক্ষিণে মেক্সিকো উপসাগর দিক থেকে জলীয়বাষ্পপূর্ণ বায়ুও বাধাহীনভাবে প্রবাহিত হয়।

ক্রান্তীয় অঞ্চলে অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও মিসিসিপি-মিসৌরি নদীর জল বরফে পরিণত হয়ে যায় কেন?

জলবায়ু ও স্বাভাবিক উদ্ভিদের সম্পর্ক

জলবায়ু ও স্বাভাবিক উদ্ভিদের প্রকৃতি	অবস্থান	জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য	স্বাভাবিক উদ্ভিদ	স্বাভাবিক উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য
তুন্দ্রা জলবায়ু ও তুন্দ্রা স্বাভাবিক উদ্ভিদ	উত্তর আমেরিকা মহাদেশের উত্তরাংশ, পশ্চিমে আলাস্কা থেকে ল্যাব্রাডর পর্যন্ত এবং গ্রিনল্যান্ডে।	বছরে ৮-৯ মাস শীতকাল। এই সময় মাঝে মাঝে তুষারপাত ও তুষারঝড় হয়। কেবলমাত্র গ্রীষ্মকালেই নাতিশীতোষ্ণ ঘূর্ণবাতের জন্য সামান্য বৃষ্টি হয়।	মস্, লাইকেন, বার্চ, উইলো, জুনিপার, অলডার।	অধিকাংশ উদ্ভিদ শৈবাল ও গুল্মজাতীয় গ্রীষ্মকালে বরফমুক্ত অঞ্চলে বাহারি ফুলের গাছ দেখা যায়। বরফমুক্ত স্থানে বার্চ, উইলো, জুনিপার প্রভৃতি গাছের ঝোপ দেখা যায়। এদের ঝোপ তুন্দ্রা বলা হয়।
তৈগা জলবায়ু ও সরলবর্গীয় অরণ্য	তুন্দ্রা অঞ্চলের দক্ষিণে কানাডার ব্রিটিশ কলম্বিয়া থেকে নিউফাউন্ডল্যান্ড পর্যন্ত।	স্বল্পস্থায়ী গ্রীষ্মকালে অল্প বৃষ্টিপাত হয়, শীতকালীন প্রবল তুষারপাত এই জলবায়ুর অন্যতম বৈশিষ্ট্য।	পাইন, ফার, স্প্রুস, লার্চ।	গাছগুলি শঙ্কু আকৃতির এবং গাঢ় সবুজ রঙের। সরলবর্গীয় গাছের কাঠ নরম হওয়ার জন্য একে নরম কাঠের অরণ্য বলা হয়। এই অঞ্চল থেকেই পৃথিবীর সর্বাধিক নরম কাঠ আহরণ করা হয়।
লরেন্সীয় জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ মিশ্র অরণ্য	সরলবর্গীয় অরণ্যাঞ্চলের দক্ষিণ-পূর্বে উত্তরে হ্রদঅঞ্চল থেকে শুরু করে সমগ্র পূর্বের উচ্চভূমি অঞ্চল, মিসিসিপি মিসৌরি সমভূমি এবং পূর্ব উপকূলভাগ।	গ্রীষ্মকালের জলবায়ু মৃদু কিন্তু দক্ষিণাংশে যথেষ্ট উষ্ণ। দক্ষিণ-পশ্চিম পশ্চিমা বায়ুর প্রভাবে প্রায় সারাবছরই বৃষ্টিপাত হয়। শীতল ল্যাব্রাডর স্রোতের প্রভাবে শীতকালে উপকূলভাগ বেশ শীতল থাকে।	ওক, ম্যাপল, এলম, অ্যাশ, প্রভৃতি পর্ণমোচী উদ্ভিদ এবং পাইন, ফার জাতীয় সরলবর্গীয় উদ্ভিদ।	এই অরণ্যাঞ্চলে নাতিশীতোষ্ণ ও পর্ণমোচী, সরলবর্গীয় উদ্ভিদের সংমিশ্রণ ঘটে। তাই একে মিশ্র অরণ্য বলা হয়। শরৎকালে গাছগুলির পাতা লাল, হলদে বা কমলা হয়ে যায় এবং তারপর এগুলি ঝরে পড়ে তাই শরৎকালকে এখানে Fall বলা হয়।
শীতল নাতিশীতোষ্ণ মহাদেশীয় জলবায়ু ও নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমি	মহাদেশের প্রায় মধ্যভাগ বরাবর — রকি পার্বত্য অঞ্চল ও বৃহৎ হ্রদ অঞ্চলের মধ্যভাগ।	মহাদেশের অভ্যন্তরে অবস্থিত হওয়ায় জলবায়ু চরমভাবাপন্ন। এর আর এক নাম প্রেইরি জলবায়ু। গ্রীষ্মকাল যথেষ্ট উষ্ণ, শীতকালে উষ্ণতা হিমাঙ্কের নীচে থাকে।	আলফা-আলফা, চাপড়া, শিষ্ প্রভৃতি তৃণজাতীয় উদ্ভিদ।	তৃণই প্রধান স্বাভাবিক উদ্ভিদ। তবে যেখানে একটু বেশি জল পাওয়া যায় সেখানে বার্চ, উইলো গাছ দেখা যায়। পশ্চিম থেকে পূর্বে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ক্রমশ বেড়ে যাওয়ায় তৃণের দৈর্ঘ্য বাড়তে থাকে।
ক্রান্তীয় উষ্ণ-আর্দ্র জলবায়ু ও ক্রান্তীয় আর্দ্র অরণ্য	মধ্য আমেরিকার দেশসমূহ, ফ্লোরিডার দক্ষিণাংশ ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ।	নিরক্ষীয় জলবায়ুর মতো সারাবছরই বৃষ্টিপাত হয়। তাই জলবায়ু উষ্ণ-আর্দ্র মাঝে মাঝে ক্রান্তীয় ঘূর্ণবাত - (হ্যারিকেন) প্রাদুর্ভাব দেখা যায়।	মেহগনি, পাম, আবলুস, রবার, কোকো, প্রভৃতি চিরহরিৎ উদ্ভিদ।	বিভিন্ন প্রজাতির গাছ অত্যন্ত ঘনভাবে জন্মায়। গাছগুলির পাতা একত্রে মিশে গিয়ে বৃহৎ চাঁদোয়া (large canopy) তৈরি করে। এই চিরসবুজ গাছগুলির কাঠ অত্যন্ত শক্ত প্রকৃতির হয়। গাছগুলি খরা প্রতিরোধী হওয়ায় উষ্ণ-শুষ্ক গ্রীষ্মকালে ভালোভাবে বেঁচে থাকে।
ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু ও ভূমধ্যসাগরীয় অরণ্য	মহাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশের ক্যালিফোর্নিয়া উপকূল অঞ্চল।	সারাবছরই রোদঝলমলে সমভাবাপন্ন জলবায়ু। দক্ষিণ-পশ্চিম পশ্চিমাবায়ুর প্রভাবে শীতকালে বৃষ্টিপাত হয়। তবে গ্রীষ্মকাল শুষ্ক থাকে।	অলিভ, জলপাই, কর্ক, ওক, উইলো এবং আঙুর, কমলালেবু প্রভৃতি ফলের গাছ।	গাছগুলির পাতা ও কাণ্ড পুরু মোমজাতীয় আবরণে ঢাকা। গ্রীষ্মকাল শুষ্ক হওয়ায় গাছের শিকড় বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।
উষ্ণ মরু জলবায়ু ও মরু উদ্ভিদ	পশ্চিমে ক্যালিফোর্নিয়া থেকে পূর্বে মেক্সিকো পর্যন্ত, সোনেরান মরুভূমি	গ্রীষ্মকাল দীর্ঘস্থায়ী ও প্রচণ্ড উষ্ণ ও শুষ্ক প্রকৃতির। অত্যল্প বৃষ্টিপাতের কারণে বিভিন্ন অঞ্চল জুড়ে মরুভূমির সৃষ্টি হয়েছে (সোনেরান)।	অ্যাকাসিয়া, বাবলা, ফণীমনসা, জোসুয়া প্রভৃতি।	বৃষ্টিপাতের অভাবে অধিকাংশ গাছই ঝোপ-গুল্ম জাতীয় হয়। অত্যন্ত শুষ্ক জলবায়ুর সঙ্গে অভিযোজিত হওয়ার জন্য এদের মূল সুদীর্ঘ হয়। শুষ্ক ঋতুতে পাতাগুলি কাঁটায় পরিণত হয়।

প্রেইরি তৃণভূমি:

উত্তর আমেরিকা মহাদেশের মধ্যভাগের সমভূমি অঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে এই তৃণভূমির অবস্থান। বসন্তকালে বরফ গলে যাওয়ায় এই তৃণভূমির বিস্তীর্ণ তৃণক্ষেত্রে হে, ক্লোভার, আলফা আলফা তৃণ ও ভুট্টা জন্মায়। তাই এই তৃণভূমি পশুচারণক্ষেত্র হিসাবে বিখ্যাত। পশুজাত দ্রব্য যেমন দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য সংরক্ষণের জন্য এখানে উন্নতমানের হিমাগার গড়ে উঠেছে। এই কারণে এই অঞ্চল দুগ্ধশিল্পে উন্নত। সমগ্র প্রেইরি অঞ্চল জুড়ে প্রচুর পরিমাণে গম উৎপন্ন হয়। এই অঞ্চলের উত্তরাংশে উষ্ণ চিনুক বায়ুর প্রভাবে বরফ গলে গেলে শীতের শেষে বসন্তকালে গম চাষ করা হয়। এই অংশ বসন্তকালীন গম বলয় নামে পরিচিত। এখানকার ডাকোটা রাজ্যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সর্বাধিক গম উৎপন্ন হয়। বসন্তকালীন গম বলয়ের দক্ষিণে শীতকালে গম চাষ করা হয়। সমগ্র অঞ্চলটিতে বিভিন্ন ঋতুতে প্রচুর পরিমাণে গম উৎপন্ন হয় বলে এই অঞ্চলের আরেক নাম 'পৃথিবীর রুটির ঝুড়ি' (Bread Basket of the World)।

উত্তর আমেরিকার হ্রদ অঞ্চল

উত্তর আমেরিকা মহাদেশের পূর্বাংশে সুপিরিয়র, মিশিগান, হুরন, ইরি ও অন্টারিও এই বৃহৎ পাঁচটি হ্রদের তীরবর্তী অঞ্চল হ্রদ অঞ্চল নামে পরিচিত। অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাগতভাবে ৪১° উত্তর থেকে ৫০° উত্তর অক্ষাংশ এবং ৭৫° পশ্চিম থেকে ৯৩° পশ্চিম দ্রাঘিমাংশের মধ্যে হ্রদ অঞ্চল অবস্থিত।

ভূপ্রকৃতি ও নদনদী :

বেশিরভাগ অংশের ভূমি সমতল হলেও কিছু কিছু স্থান তরঙ্গায়িত। পাঁচটি বৃহৎ হ্রদই প্রায় কাছাকাছি অবস্থিত। এদের মধ্যে আয়তনে সুপিরিয়র পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম হলেও পৃথিবীর বৃহত্তম স্বাদু জলের হ্রদ। এই অঞ্চলে সেন্টলরেন্স, মিসিসিপি-মিসৌরি, ওহিও হলো উল্লেখযোগ্য নদনদী। এদের মধ্যে সেন্টলরেন্স নদীটি পাঁচটি হ্রদকে যুক্ত করেছে। এই নদীর ওপরই ইরি ও অন্টারিও হ্রদের মাঝে পৃথিবীর বিখ্যাত নায়গ্রা জলপ্রপাত সৃষ্টি হয়েছে।

হ্রদ সৃষ্টির কথা—হাডসন উপসাগরকে কেন্দ্র করে পৃথিবীর প্রাচীনতম ভূখণ্ড ক্যানাডিয়ান শিল্ড অবস্থিত। হিমযুগে এই অঞ্চলটি বরফের আস্তরণ দ্বারা আবৃত ছিল। এই বরফাবৃত এলাকার বিস্তার ছিল হাডসন উপসাগর থেকে আরও দূর পর্যন্ত (বর্তমানে বৃহৎ হ্রদ অঞ্চলগুলি পর্যন্ত)। দীর্ঘদিন ক্ষয়কার্য চলার ফলে পরবর্তীকালে এই বিশাল বরফাবৃত অঞ্চল অনেকগুলো অববাহিকায় পরিণত হয়। ক্রমশ ওই অববাহিকাই হ্রদে পরিণত হয়েছে।

জলবায়ু ও স্বাভাবিক উদ্ভিদ :

এই হ্রদ অঞ্চলের জলবায়ু শীতল নাতিশীতোষ্ণ প্রকৃতির। শীতকালে প্রবল শৈত্যপ্রবাহের কারণে এই অঞ্চলের তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নীচে নেমে যায়। নদী ও হ্রদগুলো বরফে ঢাকা থাকে। তবে গ্রীষ্মকালে এখানকার জলবায়ু বেশ মনোরম, গড় তাপমাত্রা থাকে প্রায় ১৬° সেন্টিগ্রেড। এই সময়ই বেশি বৃষ্টিপাত হয়। বার্ষিক বৃষ্টিপাতের গড় ৭০ সেমি - ৮০ সেমি। এইরকম জলবায়ুর জন্য এখানে বেশিরভাগ জায়গায় ওক, এলম, বিচ, ম্যাপল, পপলার, চেস্টনাট প্রভৃতি পর্ণমোচী জাতীয় স্বাভাবিক উদ্ভিদের অরণ্য সৃষ্টি হয়েছে।

খনিজ সম্পদ ও শিল্প :

খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ এই অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে কয়লা, আকরিক লৌহ, খনিজ তৈল, চুনাপাথর, ম্যাঙ্গানিজ, দস্তা, খনিজ লবণ ও জিপসাম পাওয়া যায়, যা এই অঞ্চলের শিল্পোন্নতির প্রধান কারণ। প্রধান খনিজ সম্পদ উত্তোলক অঞ্চলগুলি হলো—

কয়লা — ইলিনয় ও ইন্ডিয়ানা রাজ্য।

আকরিক লৌহ—মেসাবি (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তম আকরিক লৌহের খনি), ভারমেলিয়ান, মারকোয়েট।

খনিজ তৈল—মিশিগান, ওহিও এবং অন্টারিও হ্রদ অঞ্চল।

উপরোক্ত কারণগুলির সহযোগিতায় হ্রদ অঞ্চল পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পাঞ্চলে পরিণত হয়েছে। এখানকার প্রধান প্রধান শিল্পগুলি হলো —

শিল্পের নাম	গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র
লৌহ ও ইস্পাত শিল্প (হ্রদ অঞ্চলের প্রধান শিল্প)	শিকাগো-গ্যারি (বৃহৎ লৌহ ও ইস্পাত কেন্দ্র), বাফেলো, ক্লিভল্যান্ড, ইরি, ডুলুথ, মিলওয়াকি।
ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প	ডেট্রয়েট (বৃহৎ মোটরগাড়ি নির্মাণকেন্দ্র), শিকাগো, টলেডো, ক্লিভল্যান্ড
রাসায়নিক শিল্প	শিকাগো, ডুলুথ, ডেট্রয়েট, পিটসবার্গ, মিশিগান
খনিজ তৈল শোধন ও পেট্রো রসায়ন শিল্প	শিকাগো, বাফেলো, ক্লিভল্যান্ড
মাংস শিল্প	শিকাগো (পৃথিবীর কসাইখানা)
ময়দা শিল্প	বাফেলো (পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ময়দা উৎপাদন কেন্দ্র)
রবার শিল্প	অ্যাক্রন (পৃথিবীর রবার রাজধানী), ইন্ডিয়ানাপোলিস

- হ্রদ অঞ্চলের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে খনিজসম্পদের অবদান কী?

- হ্রদ অঞ্চল পৃথিবীর অন্যতম শিল্পোন্নত অঞ্চলে পরিণত হয়েছে কীভাবে?
- হ্রদ অঞ্চলের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে পরিবহন ব্যবস্থার ভূমিকা লেখো।

কৃষিকাজ :

হ্রদ অঞ্চল কৃষিকার্যে বেশ উন্নত। এখানে প্রধানত শস্যাবর্তন পদ্ধতিতে (একই জমিতে বারবার একই ফসলের চাষ না করে বিভিন্ন ফসলের চাষ পর্যায়ক্রমে করা হলো শস্যাবর্তন) চাষবাস করা হয়। এখানকার উৎপন্ন ফসলগুলি হলো ভুট্টা, যব, গম, ওট, রাই, বিট। এছাড়া হ্রদ অঞ্চলের তীরবর্তী ঢালু জমিতে আঙুর, আপেল ও পিচ প্রভৃতি ফলের চাষ করা হয়। হ্রদ অঞ্চলের দক্ষিণ দিকের বিখ্যাত ভুট্টা বলয়ে পশুখাদ্য হিসাবে ভুট্টার চাষ করা হয়। ভুট্টা বলয়ের উত্তরাংশের তৃণভূমিতে হে, ক্লোভার প্রভৃতি ঘাসও পশুখাদ্য হিসাবে চাষ করা হয়। অঞ্চলটির মধ্যভাগের উচ্চভূমি পৃথিবীর সর্বাধিক ভুট্টা উৎপাদক অঞ্চল হিসাবে পরিচিত। এগুলির মধ্যে ভুট্টা উৎপাদনে এই অঞ্চল বিশ্বে প্রথম স্থান অধিকার করে। এই ভুট্টা বলয়ের উত্তরাংশে বিশেষত পশুখাদ্যের জন্য বিভিন্ন ধরনের ঘাসের চাষ করা হয়।

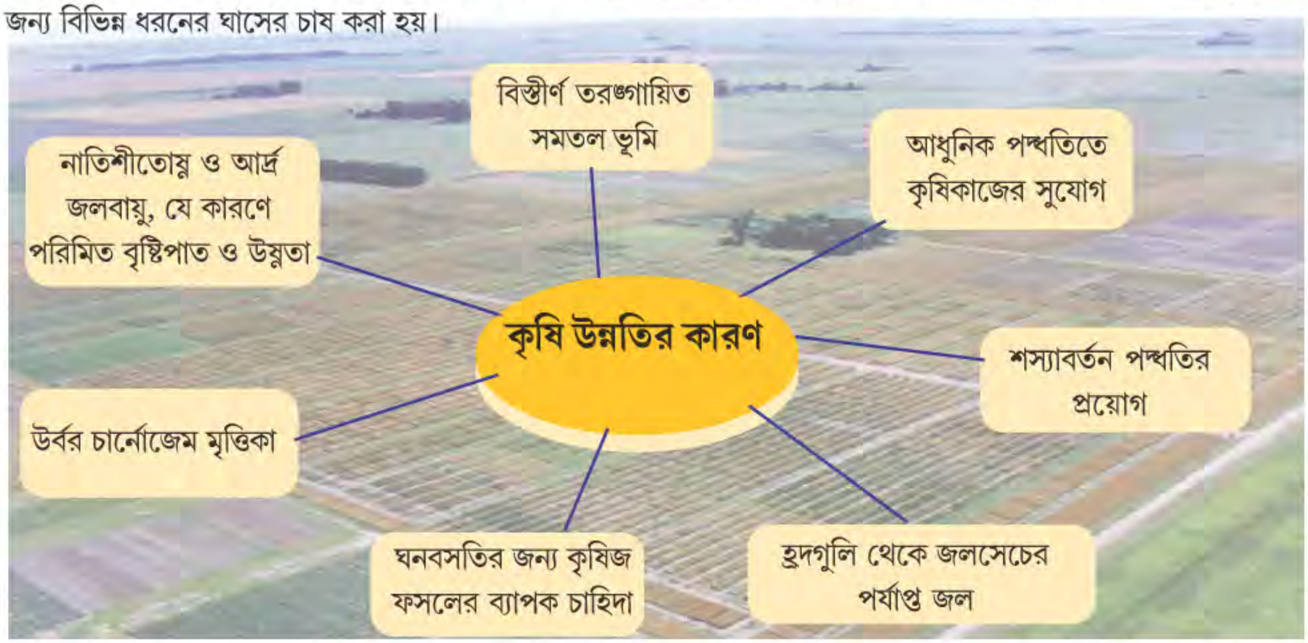

পশুপালন :

হ্রদ অঞ্চলের পার্শ্ববর্তী শহরগুলিতে দুধ, দুগ্ধজাত দ্রব্য ও মাংস সরবরাহ করার জন্য এখানে উন্নত পদ্ধতিতে গবাদি পশু ও শূকর প্রতিপালন করা হয়। হ্রদ অঞ্চলে অধিক দুগ্ধ প্রদানকারী জার্সি গোরু ও কোনো কোনো স্থানে মেষও পালন করা হয়। এছাড়া হাঁস-মুরগি প্রতিপালন করার জন্য এখানে পোল্ট্রি ফার্মও গড়ে উঠেছে। সবমিলিয়ে এই অঞ্চল পশুপালনে পৃথিবীর একটি অন্যতম প্রধান অঞ্চল। গবাদিপশু পালন ও দুগ্ধজাত দ্রব্য উৎপাদনে খ্যাতির জন্য মিচিগান ও সুপিরিয়র হ্রদ সংলগ্ন উইসকনসিন প্রদেশকে ডেয়ারি রাজ্য বলা হয়। মিচিগান হ্রদের তীরে অবস্থিত শিকাগো শহর মাংস উৎপাদন ও সংরক্ষণের কেন্দ্র হিসাবে বিখ্যাত। এই কারণে শিকাগো শহরকে পৃথিবীর কষাইখানা (Slaughter House of the World) বলা হয়। এখানে যেসকল কারণে পশুপালনে উন্নতি ঘটেছে তা হলো—

- প্রচুর পরিমাণে ভুট্টা, হে, ক্লোভার ঘাস জন্মায় যা পশুখাদ্যের পর্যাপ্ত জোগান দেয়।
- হ্রদ অঞ্চলের পর্যাপ্ত জল পশুদের প্রয়োজনীয় জলের চাহিদা মেটায়।
- বিস্তীর্ণ সমভূমি অঞ্চলে পশুদের অবাধ বিচরণের সুবিধা।
- এই অঞ্চলের শীতল জলবায়ুর জন্য দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য এবং মাংস প্রভৃতি পচনশীল উপাদানের সহজে সংরক্ষণ।

- ভারতে কোথায় এরকম পশুপালন ও তা থেকে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের সহবস্থান ঘটেছে তা জানার চেষ্টা করো।

কানাডার শিল্ড অঞ্চল

উত্তর আমেরিকার উত্তর-পূর্বাংশে যে প্রাচীন শিলাগঠিত ক্ষয়প্রাপ্ত মালভূমি অবস্থান করছে তাকে কানাডিয়ান শিল্ড অঞ্চল বলা হয়। কানাডার উত্তরাংশে হাডসন উপসাগরকে বেষ্টন করে প্রায় 'V' আকারে কানাডার শিল্ড অঞ্চলটি বিস্তৃত। পৃথিবীতে মোট ১১টি শিল্ড অঞ্চল আছে। এর মধ্যে কানাডার শিল্ড অঞ্চলটি বৃহত্তম। 'শিল্ড' কথাটির অর্থ হলো শক্ত পাথুরে তরঙ্গায়িত প্রাচীন ভূখণ্ড। কানাডিয়ান শিল্ডের অপর নাম লরেন্সীয় মালভূমি।

- **অবস্থান :** কানাডার শিল্ড অঞ্চলটি পূর্বে ৫৫° পশ্চিম দ্রাঘিমা থেকে পশ্চিমে প্রায় ১২০° পশ্চিম দ্রাঘিমা এবং দক্ষিণে ৪৫° উত্তর অক্ষাংশ থেকে উত্তরে ৮২° উত্তর অক্ষাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত।
- **সীমা :** কানাডার শিল্ড অঞ্চলের পূর্বে ল্যাব্রাডার উচ্চভূমি, পশ্চিমে গ্রেট বিয়ার, গ্রেট স্লেভ, আথাবাস্কা ও উইনিপেগ হ্রদ। উত্তরে সুমেরু মহাসাগর এবং দক্ষিণে উত্তর আমেরিকায় বৃহৎ পঞ্চহ্রদ ও সেন্টলরেন্স নদী উপত্যকা অবস্থিত।

ভূপ্রকৃতি ও নদনদী :

কানাডার শিল্ড অঞ্চলটি পৃথিবীর প্রাচীনতম ভূখণ্ডের অন্তর্গত। এই অঞ্চলটি প্রধানত গ্রানাইট এবং নিস দিয়ে গঠিত। তাই এই অঞ্চল শক্ত পাথরের মতো। দীর্ঘদিন ধরে হিমবাহের ক্ষয়কার্যের ফলে এই অঞ্চলটি বর্তমানে ক্ষয়প্রাপ্ত মালভূমিতে পরিণত হয়েছে। শিল্ড অঞ্চলের কোনো কোনো অংশ ক্ষয়কার্যের ফলে অবনমিত হয়ে হ্রদ সৃষ্টি হয়েছে। যেমন- গ্রেট বিয়ার, গ্রেট স্লেভ, আথাবাস্কা ইত্যাদি। সাধারণত এই অঞ্চলটির ভূমির ঢাল দক্ষিণ থেকে উত্তরে। সেইজন্য নদনদীগুলিও দক্ষিণ থেকে উত্তরদিকে প্রবাহিত হয়ে হাডসন উপসাগরে গিয়ে পড়েছে। এখানকার নদনদীগুলো হলো - ম্যাকেঞ্জি, চার্চিল, নেলসন। নদীগুলি এই অঞ্চলের পাশাপাশি সৃষ্টি হওয়া বহু হ্রদকে একসঙ্গে যুক্ত করেছে।

কানাডার শিল্ড অঞ্চলে অসংখ্য হ্রদ দেখা যায় কেন?

জলবায়ু ও স্বাভাবিক উদ্ভিদ :

শিল্ড অঞ্চলের উত্তর অংশটি অতিশীতল তুন্দ্রা জলবায়ুর অন্তর্গত। বছরের প্রায় সাত মাস তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নীচে থাকে। এই সময় অঞ্চলটি বরফাচ্ছন্ন থাকার জন্য কাজকর্ম করা ও যাতায়াত প্রায় অসম্ভব হয়ে ওঠে। গ্রীষ্মকাল এখানে খুবই ক্ষণস্থায়ী, তাপমাত্রা খুব বেশি বাড়ে না, প্রায় গড়ে ১০° সে.। বৃষ্টিপাত এখানে খুব কমই হয়, অধিকাংশই হয় গ্রীষ্মকালে। মোট বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বছরে ৪০ সেমির কম। শিল্ড অঞ্চলের উত্তরে এরূপ জলবায়ুর জন্য এখানে শৈবাল, গুল্ম ও ঔষধি গাছ ছাড়া বড়ো কোনো গাছ জন্মাতে পারে না।

শিল্ড অঞ্চলের দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্বের অংশটির জলবায়ু উষ্ণ প্রকৃতির। এই অঞ্চলের বার্ষিক উষ্ণতার গড় ৪° সে.। এই অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে সরলবর্গীয় বৃক্ষের অরণ্য দেখা যায়। যেমন পাইন, ফার, বার্চ, ম্যাপল ইত্যাদি। এইসব বনভূমির কাঠ শীতকালে কেটে বরফে ঢাকা নদীতে ফেলে রাখা হয়। গ্রীষ্মকালে বরফ গলে গেলে নদীর স্রোতের মাধ্যমে সহজেই কাঠগুলো কাঠ চেরাই কলে পৌঁছে যায়। এই কাঠের প্রাচুর্যতার কারণে কানাডা কাষ্ঠশিল্পে বেশ উন্নত।

জীবজন্তু : এখানকার সরলবর্গীয় বনভূমিতে বলগা হরিণ, বিভার, বনবিড়াল, লোমশ কুকুর দেখতে পাওয়া যায়। প্রচণ্ড ঠান্ডার জন্য এদের শরীর বড়ো বড়ো লোমযুক্ত হয়।

কৃষিকাজ : শিল্ড অঞ্চল কৃষিকার্যে উন্নত নয়। কারণ এখানে বছরের বেশিরভাগ সময় মাটি বরফাবৃত থাকে। তবে হাডসন উপসাগর ও সেন্টলরেন্স নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে স্বল্প পরিমাণে গম, যব, আলু, ওট, বিট চাষ করা হয়।

খনিজসম্পদ : প্রাচীন আগ্নেয় ও রূপান্তরিত শিলায় গঠিত হওয়ায় কানাডার শিল্ড অঞ্চল উত্তর আমেরিকার অন্যতম প্রধান খনিজ সমৃদ্ধ এলাকা। এখানকার প্রধান প্রধান খনিজসম্পদের নাম ও উত্তোলন কেন্দ্রগুলো হলো—

খনিজ সম্পদের নাম	উত্তোলক অঞ্চল
নিকেল	সাডবেরি (পৃথিবীর বৃহত্তম নিকেল খনি), থম্পসন।
সোনা	টিমিনিস (পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম স্বর্ণখনি)।
আকরিক লৌহ	নিউফাউন্ডল্যান্ড, ল্যাব্রাডর-কুইবেক সীমান্ত অঞ্চল।
আকরিক তামা	সাডবেরি, টিমিনিস, নোরান্ডা।
ইউরেনিয়াম	অন্টারিও ও সুপিরিয়র হ্রদের নিকটবর্তী অঞ্চল সমূহ।
কোবাল্ট, রুপো, প্লাটিনাম	সাডবেরি, থমসন, শেরিডন।

শিল্প :

কানাডার শিল্ড অঞ্চল কৃষিকাজে সমৃদ্ধ না হলেও শিল্পে যথেষ্ট উন্নত। দুর্গম অঞ্চল ও প্রতিকূল প্রাকৃতিক পরিবেশ সত্ত্বেও এখানে শিল্পের উন্নতি ঘটেছে। কারণগুলো হলো—

- এখানকার বনভূমির পর্যাপ্ত কাঠ, বন্যপশুর লোমশ চামড়া এবং খনিজপদার্থের সহজ-লভ্যতা।
- কানাডার উন্নতমানের প্রযুক্তি ও কারিগরী দক্ষতার সহায়তা।
- স্থানীয় নদীগুলি থেকে উৎপন্ন জলবিদ্যুৎ শক্তির প্রাপ্যতা।
- শিল্ড অঞ্চলের দক্ষিণ প্রান্তে পঞ্চহ্রদ ও সেন্টলরেন্স নদীর মাধ্যমে সৃষ্ট সুলভ জলপথ। এই কারণগুলোর সহযোগিতায় শিল্ড অঞ্চলের দক্ষিণ দিকে বিভিন্ন ধরনের শিল্প সমাবেশ ঘটেছে, যা এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির মূল ভিত্তি।

শিল্পের নাম	কেন্দ্রসমূহ	উৎপন্ন দ্রব্যসমূহ
কাগজ শিল্প	উইনিপেগ, মন্ট্রিল, বাকিংহাম।	কাগজ, কাগজের মন্ড, নিউজ প্রিন্ট (কানাডা বিশ্বে প্রথম স্থান অধিকার করে)।
কাষ্ঠশিল্প	অটোয়া, পরকুপাইন,কুইবেক	কাষ্ঠ ও কাষ্ঠমণ্ড
লৌহ ও ইস্পাত শিল্প	সল্ট সেন্ট মারি।	ইস্পাত ও লোহা।
ডেয়ারি শিল্প	কুইবেক।	দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য, যেমন—ঘি, মাখন, পনির, চিজ।
ফার শিল্প	উইনিপেগ, টরন্টো, মন্ট্রিল।	চামড়ার বিভিন্ন ধরনের পোশাক।
রেয়ন শিল্প	টরেন্টো, মন্ট্রিল, অটোয়া।	কৃত্রিম রেশম ও রেশম তন্তু।
ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প	মন্ট্রিল, অটোয়া, কুইবেক।	বিভিন্ন সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি।

কাষ্ঠ ও কাগজ শিল্প :

কাষ্ঠ ও কাগজ শিল্পে কানাডা বিশ্বে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে। কানাডার শিল্ড অঞ্চলে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে রয়েছে সরল বর্গীয় বৃক্ষের বনভূমি। আয়তনে এই বনভূমির স্থান বিশ্বে দ্বিতীয় (প্রথম হলো রাশিয়ার তৈগা বনভূমি)। এই বনভূমির কাঠই হলো কাষ্ঠ ও কাগজ শিল্পের প্রধান কাঁচামাল। এই বনভূমির কাঠ নরম প্রকৃতির, যা থেকে সহজেই কাগজ ও কাগজের মণ্ড উৎপাদন করা যায়। কাঁচামাল ছাড়াও অন্য যে কারণগুলি এই দুই শিল্পের উন্নতিতে সাহায্য করেছে—

- **পরিবহনের সুবিধা**

শীতকালে যখন চারিদিকে বরফ জমে যায় তখন গাছগুলি কেটে বরফ ঢাকা নদীর উপর ফেলে রাখা হয়। গ্রীষ্মকালে বরফ গলে গেলে গাছগুলি নদীর স্রোতে ভাসতে ভাসতে নীচের দিকে নামে। নদী তীরবর্তী কাঠ-চেরাই কলগুলিতে (**Saw mill**) সেগুলিকে সংগ্রহ করা হয়। এর ফলে পরিবহন খরচ খুব কম হয়।

- শিল্ড অঞ্চলে খরস্রোতা নদীগুলি থেকে উৎপন্ন জলবিদ্যুৎ শক্তি।
- কারখানাগুলিতে উন্নত প্রযুক্তিতে কাঠচেরাই।
- দক্ষ শ্রমিকের যোগান।
- প্রচুর মূলধনের সহযোগিতা।

ফার শিল্প : শিল্ড অঞ্চলের প্রায় সর্বত্রই এই শিল্প গড়ে উঠেছে। দীর্ঘ লোমযুক্ত পশুর চামড়া (ফার) থেকে শীতের পোশাক তৈরি করা হয়।

মিলিয়ে লেখো—

বাম দিক	ডান দিক
বাফেলো	বৃহত্তম মোটরগাড়ি নির্মাণ কেন্দ্র।
শিকাগো	লৌহ-ইস্পাত শিল্পের রাজধানী।
গ্যারি	ডেয়ারি শিল্পের প্রধান কেন্দ্র।
ডেট্রয়েট	বৃহত্তম ময়দা শিল্প কেন্দ্র।
উইসকনসিন	পৃথিবীর কসাইখানা।

দক্ষিণ আমেরিকা

পৃথিবীর দীর্ঘতম পর্বতশ্রেণি আন্দিজ

পৃথিবীর বৃহত্তম নদী আমাজন

পৃথিবীর উচ্চতম জলপ্রপাত অ্যাঞ্জেল

পৃথিবীর উচ্চতম হ্রদ টিটিকাকা

প্রাচীনকালে মায়া সভ্যতার নিদর্শন

- দক্ষিণ গোলার্ধে ত্রিভুজাকৃতি এই মহাদেশ পৃথিবীর চতুর্থ বৃহত্তম মহাদেশ।
- আয়তনে মহাদেশটি ভারতের প্রায় পাঁচ গুণ।
- পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষের দিকে পোর্তুগিজ নাবিক আমেরিগো ভেসপুচির অভিযানের ফলে এই মহাদেশটির কথা জানা যায়।

একনজরে
দক্ষিণ আমেরিকা

- **অবস্থান :** মহাদেশটি উত্তরে ১২°২৮´ উত্তর অক্ষাংশ থেকে দক্ষিণে ৫৫°৫৯´ দক্ষিণ অক্ষাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত। আর পূর্বে ৩৪°৫০´ পশ্চিম দ্রাঘিমা থেকে পশ্চিমে ৮১°২০´ পশ্চিম দ্রাঘিমার মধ্যে অবস্থিত।
- **সীমা :** মহাদেশটির চারপাশ সাগর মহাসাগর দিয়ে ঘেরা। উত্তর ও পূর্বদিকে আটলান্টিক মহাসাগর, পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগর এবং দক্ষিণে কুমেরু মহাসাগর অবস্থিত।
- উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত পানামা খাল মহাদেশটিকে উত্তর আমেরিকা মহাদেশ থেকে আলাদা করেছে।
- প্রধান নদী — আমাজন।
- উচ্চতম পর্বতশৃঙ্গ — আন্দিজ পর্বতের অ্যাকোনকাগুয়া (৬৯৬০ মি)।
- দেশের সংখ্যা — ১৩ টি।
- বিখ্যাত শহর — রিও-ডি-জেনিরো, সান্টিয়াগো, মন্টে ভিডিও, কুইটো, বুয়েনস-এয়ার্স।

লাতিন আমেরিকা :

দক্ষিণ আমেরিকা, মধ্য আমেরিকা, মেক্সিকো এবং ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জকে একসঙ্গে লাতিন আমেরিকা বলা হয়। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকে ইউরোপীয় অধিবাসীরা দক্ষিণ আমেরিকায় বসবাস শুরু করে। এদের মধ্যে স্প্যানিশ, পোর্তুগিজ, ফরাসি ও ইতালিয়ানরা ছিল প্রধান। তাই এই অঞ্চলগুলিতে ইউরোপীয় ভাষার প্রভাব দেখা যায়। এখানকার ভাষাগুলি মূলত প্রাচীন ভাষা ল্যাটিন থেকেই সৃষ্টি। বর্তমানেও এই ভাষাগুলি মধ্য আমেরিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলিতে প্রচলিত আছে। তাই এই অঞ্চলকে বলা হয় লাতিন আমেরিকা।

দক্ষিণ আমেরিকার প্রাকৃতিক পরিবেশ

ভূপ্রাকৃতিক বৈচিত্র্য

ভূপ্রাকৃতিক গঠনের বৈচিত্র্য অনুসারে দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশকে প্রধানত চারটি ভাগে ভাগ করা যায়।

➢ **পশ্চিমের পার্বত্য অঞ্চল :**

পশ্চিমের পার্বত্য অঞ্চলটি দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের পশ্চিমে প্রধানত আন্দিজ পর্বতমালা নিয়ে গঠিত। উত্তরে ক্যারিবিয়ান সাগর থেকে দক্ষিণে হর্ন অন্তরীপ পর্যন্ত এই পার্বত্য অঞ্চলটি বিস্তৃত। আন্দিজ পৃথিবীর দীর্ঘতম পর্বতমালা। অ্যাকোনকাগুয়া (৬৯৬০ মিটার) আন্দিজ পর্বতের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ। গড় উচ্চতায় পৃথিবীর দ্বিতীয় উচ্চতম পর্বতশ্রেণি হলো আন্দিজ (হিমালয়ের পরেই)। আন্দিজ পর্বতমালার বেশ কিছু জায়গায় পর্বতবেষ্টিত মালভূমি আছে। যেমন- বলিভিয়া, ইকুয়েডর, পেরু, টিটিকাকা মালভূমি। এদের মধ্যে উচ্চতম টিটিকাকা। এই মালভূমিতেই অবস্থিত টিটিকাকা হ্রদ (৩৮১০ মিটার) পৃথিবীর উচ্চতম হ্রদ।

অ্যাকোনকাগুয়া

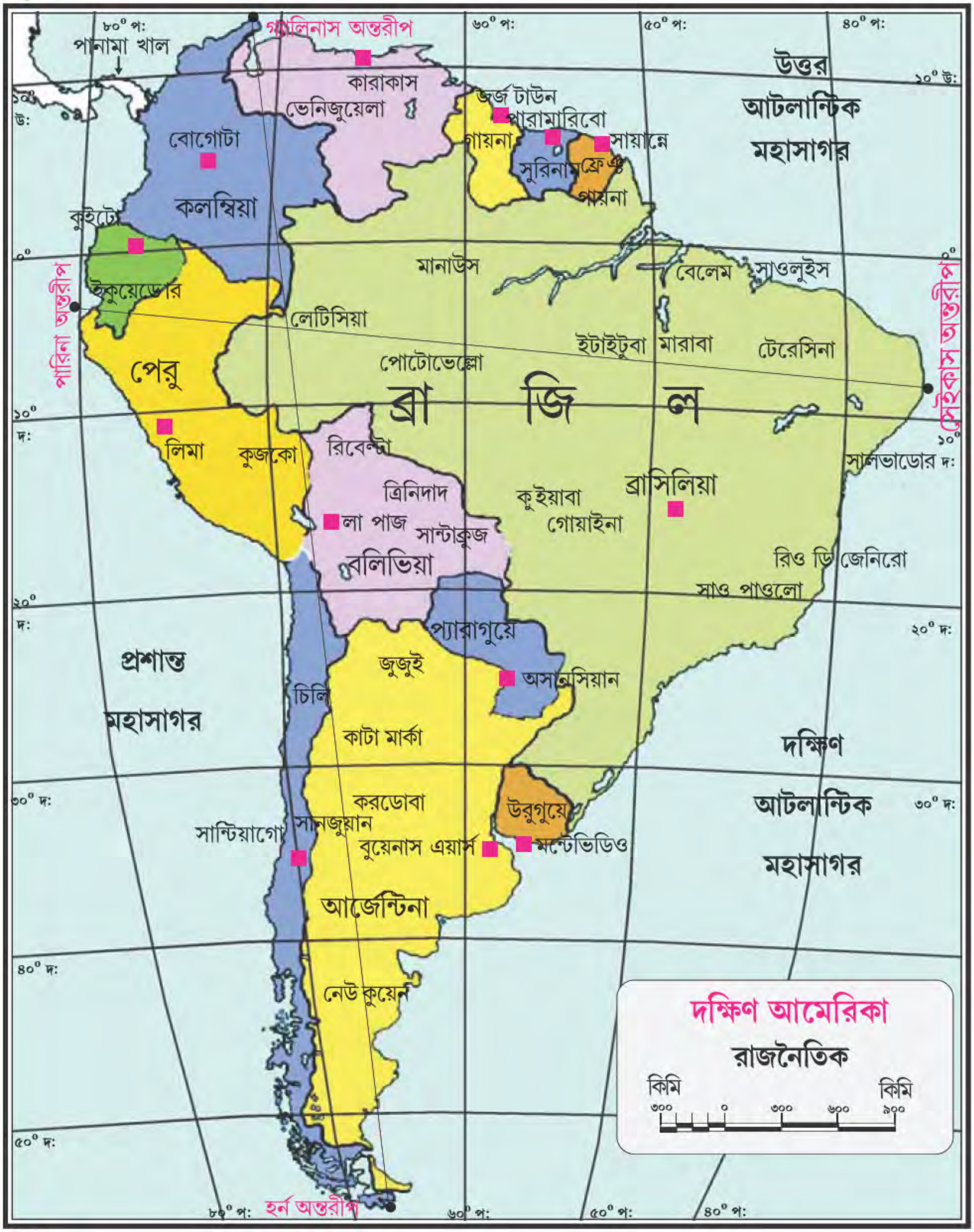
দক্ষিণ আমেরিকা
রাজনৈতিক
কিমি ৩০০ ০ ৩০০ ৬০০ ৯০০ কিমি
পানামা খাল
গ্যালিনাস অন্তরীপ
কারাকাস
ভেনিজুয়েলা
জর্জ টাউন
পারামারিবো
সায়ান্নে
গায়না
সুরিনাম
ফ্রেঞ্চ গায়না
বোগোটা
কলম্বিয়া
কুইটো
ইকুয়েডোর
পারিনা অন্তরীপ
মানাউস
বেলেম
সাওলুইস
লেটিসিয়া
ইটাইটুবা
মারাবা
টেরেসিনা
পোটোভেল্লো
ব্রা জি ল
পেরু
লিমা
কুজকো
রিবেল্টা
সালভাডোর
সেইকাস অন্তরীপ
ত্রিনিদাদ
কুইয়াবা
ব্রাসিলিয়া
লা পাজ
সান্টাক্রুজ
গোয়াইনা
বলিভিয়া
রিও ডি জেনিরো
সাও পাওলো
প্যারাগুয়ে
অসানসিয়ান
জুজুই
চিলি
কাটা মার্কা
করডোবা
উরুগুয়ে
সান্টিয়াগো
সানজুয়ান
বুয়েনাস এয়ার্স
মন্টেভিডিও
আর্জেন্টিনা
নেউ কুয়েন
হর্ন অন্তরীপ
প্রশান্ত মহাসাগর
উত্তর আটলান্টিক মহাসাগর
দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসাগর
৮০° প:
৬০° প:
৫০° প:
৪০° প:
১০° উ:
০°
১০° দ:
২০° দ:
৩০° দ:
৪০° দ:
৫০° দ:

আন্দিজ পার্বত্য অঞ্চল ভূমিকম্পপ্রবণ

এই পার্বত্য অঞ্চলটি প্রশান্ত মহাসাগরীয় আগ্নেয় বলয়ের অংশ। এই অঞ্চলে অসংখ্য আগ্নেয়গিরি রয়েছে। এদের মধ্যে কিছু কিছু এখনও সক্রিয়। মাউন্ট চিম্বোরাজো (৬২৭২ মিটার) এবং কটোপ্যাক্সি (৫৮৯৬ মিটার) স্থলভাগে অবস্থিত পৃথিবীর প্রথম ও দ্বিতীয় উচ্চতম সক্রিয় আগ্নেয়গিরি।

➢ **পশ্চিমের সংকীর্ণ উপকূলীয় অঞ্চল :**

অঞ্চলটি মহাদেশের পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূল এবং আন্দিজ পর্বতমালার মাঝখানের সংকীর্ণ অংশ। সমগ্র পশ্চিম উপকূল জুড়ে মহাদেশটির উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত সংকীর্ণ উপকূল অঞ্চলে গড়ে উঠেছে। এর মধ্যভাগে প্রায় ১১০০ কিমি দীর্ঘ আটাকামা মরুভূমি অবস্থিত। এই মরুভূমি অঞ্চলটি পৃথিবীর অন্যতম শুষ্ক ও খরাপ্রবণ অঞ্চল।

আটাকামা মরুভূমি

➢ **পূর্বের উচ্চভূমি অঞ্চল :**

দক্ষিণ আমেরিকার পূর্বদিকে দুটি উচ্চভূমি অঞ্চল আছে। দুটি উচ্চভূমিই বহু প্রাচীন ভূখণ্ডের অংশ। এগুলি ভারতের দাক্ষিণাত্য মালভূমি ও উত্তর-আমেরিকার কানাডিয়ান শিল্ড অঞ্চলের সমসাময়িক। এই দুটি উচ্চভূমি আমাজন নদী দ্বারা বিভক্ত। (ক) আমাজন নদীর উত্তর দিকে গায়না উচ্চভূমি অবস্থিত (গড় উচ্চতা ৮০০ মি)। ভেনেজুয়েলা, ফ্রেঞ্চ গায়না, সুরিনাম, গায়না প্রভৃতি দেশে এই উচ্চভূমি বিস্তৃত। উচ্চভূমিটি উত্তর ও পূর্ব উপকূলের দিকে ক্রমশ ঢালু। পৃথিবীর উচ্চতম জলপ্রপাত অ্যাঞ্জেল এই গায়না উচ্চভূমিতেই সৃষ্টি হয়েছে। রোরোইমা (২৭৬৯ মি) হলো এই উচ্চভূমির সর্বোচ্চ শৃঙ্গ। (খ) আমাজন নদীর দক্ষিণ দিকে ব্রাজিল উচ্চভূমি (গড় উচ্চতা ১০০০ মি) অবস্থিত। এই উচ্চভূমির দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে আটলান্টিক মহাসাগরের তীরে অবস্থিত পিকো-ডো-বানডাইরা হলো এর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ। ব্রাজিল উচ্চভূমি ও আন্দিজ পর্বতের মাঝে ম্যাটোগ্রাসো মালভূমি অবস্থিত। এই মালভূমি আমাজন ও লা-প্লাটা নদীর জলবিভাজিকা হিসাবে অবস্থান করছে।

➢ **মধ্যভাগের বিশাল সমভূমি অঞ্চল :**

পশ্চিমের পার্বত্য অঞ্চল এবং পূর্বের উচ্চভূমির মাঝে এই বিশাল সমভূমি অঞ্চল অবস্থিত। এর আয়তন দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের অর্ধেকেরও বেশি। ওরিনোকো, আমাজন ও লা-প্লাটা (পারানা, প্যারাগুয়ে, উরুগুয়ে) নদীর সম্মিলিত অববাহিকা হলো এই সমভূমি অঞ্চল। এই সমভূমি অঞ্চল বিভিন্ন নদী অববাহিকায় বিভিন্ন নামে পরিচিত—

ওরিনোকো নদীর অববাহিকা ল্যানোস সমভূমি	আমাজন নদীর অববাহিকা সেলভা সমভূমি	পারানা-প্যারাগুয়ে নদীর অববাহিকায় গ্রানচাকো সমভূমি	লা-প্লাটা নদীর অববাহিকা পম্পাস সমভূমি

এদের মধ্যে সেলভা সমভূমি বৃহত্তম। আমাজন নদীর অববাহিকায় সৃষ্ট এই সেলভা সমভূমিতে পৃথিবীর বৃহত্তম চিরহরিৎ অরণ্যের সৃষ্টি হয়েছে এর নাম সেলভা অরণ্য। অপরদিকে ল্যানোস ও পম্পাস সমভূমি হলো প্রকৃতপক্ষে তৃণভূমি অঞ্চল।

ক্যারিবিয়ান সাগর
পানামা খাল
ল্যানস সমভূমি
গায়না উচ্চভূমি
উত্তর
আটলান্টিক
মহাসাগর
মাউন্ট
কটোপ্যাক্সি
অ্যামাজন অববাহিকা
ম্যাটোগ্রাসো
মালভূমি
ব্রাজিলের উচ্চভূমি
বলিভিয়ার মালভূমি
আটাকামা মরুভূমি
গ্রানচাকো সমভূমি
প্রশান্ত
মহাসাগর
মাউন্ট
অ্যাকোনকাগুয়া
সমভূমি
পম্পাস
দক্ষিণ
আটলান্টিক
মহাসাগর
প্যাটাগোনিয়া
মরুভূমি
ম্যাজেলান প্রণালী
দক্ষিণ আমেরিকা
প্রাকৃতিক বিভাগ
কিমি
কিমি
৩০০ ০ ৩০০ ৬০০ ৯০০
৮০° প:
৬০° প:
৫০° প:
৪০° প:
১০° উ:
০°
১০° দ:
২০° দ:
৩০° দ:
৪০° দ:
৫০° দ:

নদনদী

নদ নদীর নাম	উৎস	মোহনা	উপনদী	বিশেষ বৈশিষ্ট্য
আমাজন নদী (৬৪৩৭ কিমি)	আন্দিজ পর্বতের মিশমি শৃঙ্গ	উত্তর আটলান্টিক মহাসাগর	জুরুয়া, পুরুস, জিঙ্গু, মাদিরা	দৈর্ঘ্যের বিচারে আমাজন নদী পৃথিবীর দ্বিতীয় দীর্ঘতম নদী। নদী অববাহিকার আয়তন এবং জলপ্রবাহের দিক থেকে পৃথিবীতে বৃহত্তম।
ওরিনোকো নদী (২১৫০ কিমি)	গায়না উচ্চভূমির পারিমা পর্বত	আটলান্টিক মহাসাগর	ক্যারোনি, মেতা, জাপুরে	ওরিনকো নদীর ওপর সৃষ্ট অ্যাঞ্জেল জলপ্রপাত পৃথিবীর উচ্চতম জলপ্রপাত। এর উচ্চতা প্রায় ৯০০ মিটার।

দক্ষিণ আমেরিকার নদনদী

লা-প্লাটা নদী (৩৫০০ কিমি):

পারানা, প্যারাগুয়ে ও উরুগুয়ে এই তিনটি নদীর মিলিত প্রবাহকে একসাথে লা-প্লাটা নদী বলা হয়। পারানা ও প্যারাগুয়ে নদী দুটি ব্রাজিলের পৃথক দুটি উচ্চভূমি থেকে উৎপন্ন হয়েছে। এরপর আলাদা আলাদা ভাবে প্রায় ২৪০০ কিমি পথ প্রবাহিত হওয়ার পর নদী দুটি মিলিত হয়েছে। পারানা ও প্যারাগুয়ের মিলিত প্রবাহ পারানা নদী নামে আর্জেন্টিনা সমভূমির ওপর দিয়ে আরও ১১০০ কিমি পথ প্রবাহিত হয়েছে। এরপর উরুগুয়ে নদী উত্তর পূর্ব দিক থেকে এসে পারানা নদীর সাথে মিলিত হয়েছে। তিনটি নদীর মিলিত প্রবাহ (পারানা, প্যারাগুয়ে ও উরুগুয়ে) লা-প্লাটা নামে প্রবাহিত হয়ে আটলান্টিক মহাসাগরে মিশেছে। লা-প্লাটা নদী মোহনা অঞ্চলে রিও-ডি-লা-প্লাটা নামে পরিচিত। এই মোহনা অঞ্চল বন্দর ও জলপথ পরিবহনে বেশ উন্নত।

নদনদীর বৈশিষ্ট্য :

- দক্ষিণ আমেরিকার অধিকাংশ নদী দীর্ঘ এবং আয়তনে বিশাল।
- নদীগুলি বৃষ্টির জল ও বরফ গলা জলে পুষ্ট তাই চিরপ্রবাহী।
- অধিকাংশ নদীই আন্দিজ পর্বত থেকে উৎপন্ন হয়েছে।
- ওরিনোকো নদী ছাড়া অন্য কোনো নদীর মোহনায় ব-দ্বীপ সৃষ্টি হয়নি।

আরো জানো

আমাজন নদীর মোহনা অঞ্চলে বিপুল পরিমাণে স্বাদু জল সমুদ্রে মিলিত হয়। তাই আটলান্টিক মহাসাগরের ওই অঞ্চলে বেশ কিছুদূর পর্যন্ত সমুদ্রের জলের লবণতা কমে যায়।

আমাজন- পৃথিবীর বৃহত্তম নদী

- আমাজন অববাহিকা নিরক্ষীয় জলবায়ু অঞ্চলে অবস্থিত। এখানে সারা বছর প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টিপাত হয়।
- দক্ষিণ-পূর্ব আয়ন বায়ুর প্রবাহ পথে আন্দিজ পর্বতমালা অবস্থান করায় জলীয় বাস্পপূর্ণ বায়ু পর্বতে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টিপাত ঘটায়।
- আমাজন অববাহিকার আয়তন ৭০,৫০,০০০ বর্গ কিমি। প্রতি সেকেন্ডে জলপ্রবাহের পরিমাণ ২,০৯,০০০ ঘন মিটার।
- আমাজন নদীর উপনদীর সংখ্যা প্রায় ১,০০০-এরও বেশি। এই উপনদীগুলো বেশ দীর্ঘ (ভারতের গঙ্গা নদীর মতো)।

বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে আমাজন অববাহিকা অবস্থিত হওয়ায় প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টির জল এই নদীতে এসে পড়ে। এই অববাহিকা সমুদ্রের দিকে বেশ ঢালু। তাই সমগ্র অববাহিকার জল মূল নদী দিয়ে প্রবল বেগে আটলান্টিক মহাসাগরে মেশে। আমাজন নদীর মোহনা বেশ প্রশস্ত হওয়ায় সমুদ্রের জোয়ারের জল নদীতে অবাধে প্রবেশ করতে পারে। মোহনা অঞ্চলে উপকূল সংলগ্ন সমুদ্র স্রোতও শক্তিশালী। এই সব কারণে আমাজান নদীর মোহনায় ব-দ্বীপ সৃষ্টি হয়নি।

শব্দছক পূরণ করো :

- দক্ষিণ আমেরিকার একটি মরুভূমি
- পৃথিবীর উচ্চতম হ্রদ।
- পারানা-প্যারাগুয়ে ও উরুগুয়ে নদীর মিলিত প্রবাহ।
- পৃথিবীর বৃহত্তম নদী অববাহিকা।
- ওরিনোকো নদীর অববাহিকায় সৃষ্ট সমভূমি।
- পৃথিবীর উচ্চতম জলপ্রপাত।

			টি			ল্যা
		টা		মা		
			কা			
লা		আ		জ		
			অ্যা			

জলবায়ু

দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশটির উত্তরের কিছুটা অংশ উত্তর গোলার্ধে অবস্থিত। ফলে মহাদেশটির উত্তর ও দক্ষিণ অংশে বিপরীত ধরনের ঋতু পরিবর্তন দেখা যায়। যেমন উত্তর গোলার্ধে যখন গ্রীষ্মকাল দক্ষিণ গোলার্ধে তখন শীতকাল। এছাড়াও মহাদেশটির জলবায়ুর বৈচিত্র্যের অন্যান্য কারণগুলো হলো—

জলবায়ুর বৈচিত্র্যের কারণ

অক্ষাংশগত অবস্থান	সমুদ্র থেকে দূরত্ব	ভূমির উচ্চতা	সমুদ্র স্রোত	বায়ু প্রবাহ
দক্ষিণ আমেরিকার উত্তরদিকে নিরক্ষরেখা আর প্রায় মাঝ বরাবর মকরক্রান্তিরেখা বিস্তৃত। অক্ষাংশগত অবস্থানের হিসাবে মহাদেশটির ৭০ শতাংশ উষ্ণমণ্ডলে,২০ শতাংশ নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে এবং ১০ শতাংশ শীতল নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে অবস্থিত।	মহাদেশটির উত্তরাংশ প্রশস্ত এবং দক্ষিণ অংশ অত্যন্ত সংকীর্ণ। এই কারণে মহাদেশের উত্তরে, অভ্যন্তরভাগে সমুদ্রের প্রভাব পড়ে না।	প্রশান্ত মহাসাগরীয় আর্দ্র পশ্চিমা বায়ু আন্দিজ পর্বতে বাধা পায় বলে মহাদেশের দক্ষিণে প্রবেশ করতে পারে না। তাই এখানে প্যাটাগোনিয়া মরুভূমির সৃষ্টি হয়েছে। আন্দিজ পর্বত, গায়না উচ্চভূমি ও ব্রাজিলের উচ্চভূমি উষ্ণমণ্ডলে অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও উষ্ণতা সারা বছর কম থাকে।	একই অক্ষাংশে অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও উষ্ণ ব্রাজিল স্রোতের জন্য মহাদেশের পূর্বদিকের জলবায়ু উষ্ণ হয়, শীতল পেরু স্রোতের জন্য পশ্চিমদিকের জলবায়ু শীতল হয়।	এই মহাদেশের পশ্চিমপ্রান্তে আটাকামা মরুভূমির সৃষ্টি হয়েছে। দক্ষিণ-পূর্ব আয়ন বায়ু আন্দিজ পর্বতে বাধা পায় বলে এই পর্বতের পশ্চিম ঢাল বৃষ্টিচ্ছায় অঞ্চলে পরিণত হয়েছে।
দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশটির বেশির ভাগ অংশ কোন জলবায়ু অঞ্চলের অন্তর্গত?	তাহলে এই মহাদেশের কোন অংশ সমুদ্রের দ্বারা বেশি প্রভাবিত? কোন অংশের জলবায়ু সমভাবাপন্ন?	এই অঞ্চলের জলবায়ুতে ভূমির উচ্চতার প্রভাব কী আছে?	সমুদ্র স্রোত কীভাবে এই অঞ্চলের জলবায়ুকে প্রভাবিত করে?	মহাদেশের ক্রান্তীয় অঞ্চলের পশ্চিম প্রান্তে মরুভূমির সৃষ্টি হয় কেন?

জলবায়ু ও স্বাভাবিক উদ্ভিদের সম্পর্ক

জলবায়ু ও স্বাভাবিক উদ্ভিদের প্রকৃতি	অবস্থান	জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য	স্বাভাবিক উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য
নিরক্ষীয় জলবায়ু ও চিরহরিৎ (সেলভা) অরণ্য	নিরক্ষরেখার নিকটবর্তী আমাজন ও ওরিনোকো নদীর অববাহিকা। এছাড়া ব্রাজিল, কলম্বিয়া, ভেনেজুয়েলা, ও সুরিনামের দক্ষিনাংশ।	সারা বছর প্রায় একই রকম উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ু, দেখা যায়। এখানে কোনো ঋতু পরিবর্তন হয় না।	রোজউড, আয়রন উড, ব্রাজিলনাট, বাঁশ ঘনসন্নিবিষ্ট ভাবে জন্মায় বলে কোথাও কোথাও সূর্যালোক প্রবেশ করতে পারে না। এই কারণে এই স্থান গোধূলি অঞ্চল' (Region of twilight) নামে পরিচিত।
সাভানা জলবায়ু ও সাভানা তৃণভূমি	এই তৃণভূমি অঞ্চল গায়না উচ্চভূমি ও ব্রাজিল উচ্চভূমিতে নদী উপত্যকায় দেখা যায়।	গ্রীষ্মকাল উষ্ণ ও আর্দ্র এবং শীতকাল শীতল ও শুষ্ক। বেশিরভাগ বৃষ্টিপাত গ্রীষ্মকালেই হয়।	সাভানা তৃণভূমি অঞ্চলে বিভিন্ন উচ্চতার লম্বা ঘাস (প্রায় ৪ মিটার), বিচ্ছিন্নভাবে শাল, শেগুন গাছ দেখা যায়।
উষ্ণ ক্রান্তীয় জলবায়ু ও স্বাভাবিক উদ্ভিদ	ব্রাজিলের পূর্বাংশ এই জলবায়ু অঞ্চলের অন্তর্গত।	পূর্বদিক থেকে আগত জলীয় বাষ্পপূর্ণ আয়ন বায়ুর প্রভাবে প্রধানত গ্রীষ্মকালে বৃষ্টিপাত হয়।	শাল, সেগুন, জারুল, মেহগনি ইত্যাদি বনভূমি দেখা যায়।
ক্রান্তীয় মরু জলবায়ু ও স্বাভাবিক উদ্ভিদ	মহাদেশের পশ্চিমে আটাকামা মরুভূমিতে এই জলবায়ু দেখা যায়।	গ্রীষ্মকাল খুব উষ্ণ ও শীতকাল শীতল। এই অঞ্চলটি পৃথিবীর শুষ্কতম অঞ্চল।	বৃষ্টিহীন শুকনো জলবায়ুর জন্য এখানে গুল্ম, কাঁটাগাছ, ঝোপঝাড় এবং ক্যাকটাস জাতীয় গাছ জন্মায়।
ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু ও স্বাভাবিক উদ্ভিদ	মধ্য চিলির অন্তর্গত আটাকামা মরুভূমির দক্ষিণে এই জলবায়ু দেখা যায়।	গ্রীষ্মকাল উষ্ণ ও শুষ্ক। শীতকালে বৃষ্টিপাত মাঝারি ধরনের হয়।	বৃষ্টিহীন গ্রীষ্মকালে আর্দ্রতা ধরে রাখার জন্য উদ্ভিদের লম্বা মূল ও মোমযুক্ত পাতা হয়। কাঁটাযুক্ত ঝোপঝাড়, ক্যাকটাস, অ্যাকাসিয়া গাছ জন্মায়।
শীতল সামুদ্রিক জলবায়ু ও স্বাভাবিক উদ্ভিদ	দক্ষিণ চিলি এই জলবায়ুর অন্তর্গত।	সারা বছরই সমভাবাপন্ন জলবায়ু থাকে।	চির সবুজ ও পর্ণমোচী গাছের মিশ্র বনভূমি দেখা যায়।
নাতিশীতোষ্ণ (তৃণভূমি) জলবায়ু ও স্বাভাবিক উদ্ভিদ	আর্জেন্টিনা ও উরুগুয়ের উত্তর-পূর্বাংশের পম্পাস তৃণভূমি এই জলবায়ুর অন্তর্গত।	জলবায়ু প্রায় সমভাবাপন্ন। তবে গ্রীষ্মকাল বেশ উষ্ণ।	এই তৃণভূমির ঘাসগুলো সাভানা তৃণভূমির মত লম্বা নয়।
নাতিশীতোষ্ণ (মরু) জলবায়ু ও স্বাভাবিক উদ্ভিদ	মরুভূমি প্রধান প্যাটাগোনিয়া অঞ্চলে এই জলবায়ু দেখা যায়।	গ্রীষ্মকাল উষ্ণ ও শীতকাল শীতল। পশ্চিমাবায়ুর বৃষ্টিচ্ছায় অঞ্চলে অবস্থিত হওয়ায় বৃষ্টিপাত কম হয়।	ঝোপঝাড় এবং কাঁটাজাতীয় ঘাস দেখা যায়।
পার্বত্য জলবায়ু ও স্বাভাবিক উদ্ভিদ	সমগ্র মহাদেশ জুড়ে উত্তর থেকে দক্ষিণে আন্দিজ পার্বত্য অঞ্চলে এই ধরনের জলবায়ু দেখা যায়।	এই অঞ্চলের উচ্চ অংশে অতি শীতল জলবায়ু এবং পর্বত পাদদেশীয় অঞ্চলে অপেক্ষাকৃত কম উষ্ণ জলবায়ু দেখা যায়।	অধিক উচ্চ স্থানে ঘাস, লাইকেন জন্মায়। পর্বতের ঢালে নীচের দিকে পর্ণমোচী বৃক্ষের বনভূমি দেখা যায়।

উত্তর
আটলান্টিক মহাসাগর
সাভানা জলবায়ু
অঞ্চল (ল্যানোস তৃণভূমি)
নিরক্ষরেখা
পার্বত্য জলবায়ু
অঞ্চল ও স্বাভাবিক
উদ্ভিদ
নিরক্ষীয় জলবায়ু অঞ্চল ও
সেলভা অরণ্য
সাভানা জলবায়ু অঞ্চল
(ক্যাম্পোস তৃণভূমি)
ক্রান্তীয় মরু
জলবায়ু অঞ্চল ও
স্বাভাবিক উদ্ভিদ
ক্রান্তীয় জলবায়ু
ও স্বাভাবিক উদ্ভিদ
সাভানা জলবায়ু
(গ্রানচাকো তৃণভূমি)
মকরক্রান্তি রেখা
দক্ষিণ
প্রশান্ত মহাসাগর
নাতিশীতোষ্ণ মরু জলবায়ু ও স্বাভাবিক উদ্ভিদ
নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমি
(পম্পাস)
দক্ষিণ
আটলান্টিক মহাসাগর
ভূমধ্যসাগরীয়
জলবায়ু অঞ্চল ও
স্বাভাবিক উদ্ভিদ
শীতল সামুদ্রিক জলবায়ু ও
স্বাভাবিক উদ্ভিদ
দক্ষিণ আমেরিকা
জলবায়ু ও স্বাভাবিক উদ্ভিদ
কিমি
কিমি
৩০০
০
৩০০
৬০০
৯০০

সেলভা — চিরহরিৎ বৃক্ষের বনভূমি

নিরক্ষরেখা উভয় পাশে বিশেষত আমাজন নদী অববাহিকায় অধিকাংশ স্থান জুড়েই এই বনভূমি দেখা যায়। এখানে সারাবছর প্রচুর উষ্ণতা ও বৃষ্টিপাত হয়। বার্ষিক গড় উষ্ণতা ২৫° সে. -২৭° সে., বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ২৫০ সেমি -৩০০ সেমি। কোনো কোনো স্থানে প্রায় ১০০০ সেমিরও বেশি বৃষ্টিপাত হয়। এখানে ঘন চিরহরিৎ গাছের বনভূমির সৃষ্টি হয়েছে। এই অরণ্যকে ক্রান্তীয় বৃষ্টি অরণ্য বলে। আমাজন নদী অববাহিকা জুড়ে অবস্থিত এই অরণ্য পৃথিবীর বৃহত্তম ও নিবিড়তম ক্রান্তীয় বৃষ্টিঅরণ্য, যা আয়তনে ভারতীয় উপমহাদেশের দ্বিগুণেরও বেশি। এখানকার গাছগুলোর পাতা বড়ো ও শক্ত। গাছগুলো ঘন সন্নিবিষ্ট হওয়ায় অরণ্যের তলদেশে সূর্যের আলো পৌঁছাতে পারে না। যেন মনে হয় অরণ্যের ওপরটা চাঁদোয়ার (Canopy) মতো ঢাকা আছে। এই অরণ্যে বৃক্ষ শ্রেণির গাছের সাথে সাথে লতানো পরজীবী গাছ প্রচুর পরিমাণে জন্মায়। সূর্যের আলো পৌঁছতে না পারায় এই অরণ্যের তলদেশ স্যাঁতস্যাঁতে প্রকৃতির। দুর্গম ও অপ্রবেশ্য সেলভা অরণ্যের এই পরিবেশে ফার্ন, ছত্রাক, শৈবাল ও বিভিন্ন ধরনের আগাছার সাথে সাথে বিষাক্ত অ্যানাকোনডা সাপ, ট্যারেনটুলা মাকড়সা, মাছি, মাংসাশী পিঁপড়ে, রক্তচোষা বাদুর, জোঁক প্রভৃতি জীবজন্তু দেখা যায়। এছাড়া এই অঞ্চলের নদীতে মাংসাশী পিরানহা মাছ, কুমির দেখা যায়।

একনজরে সেলভা অরণ্য

- **অবস্থান:** ব্রাজিল (৬০%), পেরু (১৩%), কলম্বিয়া (১০%) এবং ভেনেজুয়েলা, বলিভিয়া, গায়না, সুরিনাম ও ফ্রেঞ্চ গায়নার অংশ বিশেষ।
- **আয়তন:** ৫৫,০০০০০ বর্গ কিমি।
- পৃথিবীর মোট জীবন্ত প্রজাতির ১০ শতাংশের বসবাসের স্থান।
- পৃথিবীর ২০ শতাংশ অক্সিজেনের যোগান দেয় তাই একে পৃথিবীর ফুসফুস বলা হয়।
- ২.৫ লক্ষ পতঙ্গ এবং ৪ লক্ষ উদ্ভিদ প্রজাতির আবাসস্থল।

পম্পাস অঞ্চল

পম্পাস স্পেনীয় শব্দ, যার অর্থ বিস্তীর্ণ সমতলক্ষেত্র। এই অঞ্চলের বিস্তীর্ণ তৃণভূমি পম্পাস তৃণভূমি নামে পরিচিত। এই তৃণভূমি অঞ্চল আর্জেন্টিনা ও উরুগুয়ের দক্ষিণ পশ্চিমে লা-প্লাটা নদীর অববাহিকা অঞ্চলে অবস্থিত। এর আকৃতি অনেকটা আধখানা চাঁদের মতো।

অবস্থান ও সীমা :

১) আর্জেন্টিনা ও উরুগুয়ের প্রায় সমগ্র অংশ নিয়ে এই তৃণভূমি অঞ্চল গঠিত। ব্রাজিলের দক্ষিণের সামান্য অংশ এর অন্তর্গত। এই তৃণভূমি অঞ্চল ৩০° দক্ষিণ থেকে ৩৮° দক্ষিণ অক্ষাংশ এবং ৫৪° পশ্চিম থেকে ৬৫° পশ্চিম দ্রাঘিমা পর্যন্ত বিস্তৃত।

২) এই তৃণভূমির উত্তরে গ্রানচাকো সমভূমি ও ব্রাজিল উচ্চভূমি, পূর্বে আটলান্টিক মহাসাগর, দক্ষিণে প্যাটাগোনিয়া মরুভূমি ও পশ্চিমে আন্দিজ পর্বতের পাদদেশ অঞ্চল অবস্থিত।

দক্ষিণ আমেরিকার পম্পাস তৃণভূমি

ভূপ্রকৃতি ও নদনদী :

পম্পাস তৃণভূমি অঞ্চল নদী বাহিত পলি মৃত্তিকা এবং বায়ু বাহিত লোয়েস মৃত্তিকা দিয়ে গঠিত হয়েছে। এই অঞ্চল সমভূমি হলেও কোথাও কোথাও ছোটো ছোটো পাহাড় বা টিলা দেখা যায়। সমগ্র পম্পাস অঞ্চল পশ্চিমে আন্দিজ পর্বতের পাদদেশ থেকে পূর্বে আটলান্টিক মহাসাগরের দিকে ঢালু। পারানা ও প্যারাগুয়ে এই অঞ্চলের প্রধান দুটি নদী। এই দুটি নদীর আর্জেন্টিনার রাজধানী বুয়েনস্ এয়ার্স শহরের কাছে উরুগুয়ের সাথে মিলিত হয়ে লা-প্লাটা নামে আটলান্টিক মহাসাগরে পড়েছে।

জলবায়ু ও স্বাভাবিক উদ্ভিদ :

এই অঞ্চল সমুদ্রের নিকটবর্তী হওয়ায় এখানকার জলবায়ু বেশ আরামদায়ক। গ্রীষ্মকালীন গড় তাপমাত্রা ২০° সে—২৪° সে এবং শীতকালীন গড় তাপমাত্রা ৮° সে—১০° সে থাকে। বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বেশ কম (গড়ে ৫০ সেমি—১০০ সেমি)। এই বৃষ্টিপাতের পরিমাণ পশ্চিম দিকের তুলনায় পূর্বদিকে বেশি হয়।

বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কম হওয়ার জন্য এখানে তৃণভূমি সৃষ্টি হয়েছে। তবে পূর্বদিকে বৃষ্টিপাত তুলনায় বেশি হওয়ার জন্য তৃণভূমির মাঝে কোথাও কোথাও পপলার, ইউক্যালিপটাস গাছ দেখা যায়। বর্তমানে এই তৃণভূমি অঞ্চলের অধিকাংশই পরিবহন ও কৃষিকাজের জন্য কেটে ফেলা হয়েছে।

কৃষিকাজ :

কৃষিকাজে দক্ষিণ আমেরিকার পম্পাস অঞ্চল বেশ উন্নত। এখানকার নদী গঠিত উর্বর পলি মৃত্তিকা, পরিমিত বৃষ্টিপাত কৃষিকাজের পক্ষে অনুকূল। এখানকার প্রধান কৃষিজ ফসল হলো গম। আর্জেন্টিনায় এতো বেশি পরিমাণে গম উৎপন্ন হয় যে এই দেশ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গম রপ্তানি কারক দেশে পরিণত হয়েছে। গম ছাড়াও এখানে ভুট্টা, বার্লি, আখ, তুলা, নানারকম ফল, শাকসবজি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার এবং উন্নত প্রথায় এখানে কৃষিকাজ করায় উৎপাদনের পরিমাণ বেশি। বর্তমানে পম্পাস অঞ্চল দক্ষিণ আমেরিকার শস্য ভাণ্ডার নামে পরিচিত।

পশুপালন :

পম্পাস অঞ্চল পশুপালনের উপযোগী। এখানকার পশুচারণভূমিকে এস্টেনশিয়া বলা হয়। অধিবাসীরা প্রধানত মাংস এবং দুধের জন্য পশুপালন করে। এই অঞ্চলের পূর্বদিকে বেশি বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে গবাদিপশু ও দক্ষিণ-পশ্চিমে কম বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে ভেড়া পালন করা হয়। আন্দিজ পর্বতের পাদদেশে অবস্থিত করডোবা অঞ্চল দুগ্ধ শিল্পের জন্য বিখ্যাত। এখানে প্রধানত দুগ্ধ প্রদানকারী গোরু প্রতিপালন করা হয়। বুয়েনস্ এয়ার্স প্রদেশের দক্ষিণ-পূর্ব অংশই পম্পাস অঞ্চলের প্রধান পশুপালন কেন্দ্র। আর্জেন্টিনার প্রায় ৪০ শতাংশ ভেড়াই বুয়েনস্ এয়ার্স প্রদেশে প্রতিপালন করা হয়। পম্পাস অঞ্চল থেকে প্রচুর পরিমাণে গো-মাংস, মাখন, পনির, চিজ, পশম, চামড়া, চর্বি (হিমশীতল অবস্থায়) বিদেশে রপ্তানি করা হয়। মাংস রপ্তানিতে পম্পাস অঞ্চল তথা আর্জেন্টিনা পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে।

খনিজসম্পদ ও শিল্প :

এই অঞ্চল খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ নয়। সেই জন্য এখানে বড়ো কোনো শিল্প গড়ে ওঠেনি। এখানে পর্যাপ্ত পরিমাণে পশুজাত ও কৃষিজাত দ্রব্য পাওয়া যায়। এগুলিকে ভিত্তি করে এখানে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও অন্যান্য শিল্প গড়ে উঠেছে। পশুজাত কাঁচামালকে ভিত্তি করে গুঁড়ো দুধ, পনির, মাখন, ঘি, চিজ প্রভৃতি দুগ্ধজাত এবং মাংস প্রক্রিয়াকরণ শিল্প গড়ে উঠেছে; কৃষিজাত কাঁচামালকে কেন্দ্র করে ময়দা, চিনি, বেকারি প্রভৃতি শিল্প গড়ে উঠেছে।

ওশিয়ানিয়া

ইস্টার আইল্যান্ডের রহস্যময় মূর্তি

মৌনালোয়া আগ্নেয়গিরি

পৃথিবীর গভীরতম স্থান- মারিয়ানা খাত

পৃথিবীর দীর্ঘতম প্রবাল প্রাচীর গ্রেট বেরিয়ার রিফ

সিডনি হারবার ব্রিজ

অদ্ভুত প্রাণী ক্যাঙারু

- আয়তনের দিক থেকে ওশিয়ানিয়া পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম মহাদেশ।
- অবাক করার মতো হলেও প্রায় দশ হাজারেরও বেশি দ্বীপ নিয়ে গড়ে উঠেছে এই মহাদেশ।
- একটা গোটা মহাদেশ অথচ লোকসংখ্যা কত জানো? মাত্র প্রায় সাড়ে তিন কোটি। পশ্চিমবঙ্গের মোট জনসংখ্যার অর্ধেকেরও অনেক কম।
- বিচিত্র সব প্রাণী ও উদ্ভিদের বসবাস এই মহাদেশে, যাদের অন্য কোনো মহাদেশে দেখা যায় না। যেমন - ক্যাঙারু, ওয়ালবি, হংসচঞ্চু (প্লাটিপাস), কোয়ালা (ছোট্ট ভাল্লুক কিন্তু গাছে থাকে), এমু (পাখি অথচ উড়তে পারে না, উটের মতো দৌড়ায়), কিউই পাখি (ডানা নেই)। ইউক্যালিপটাসের জন্ম এখানে। জারা, কারি প্রভৃতি চিরহরিৎ গাছ কেবল এই মহাদেশেই দেখা যায়।
- পর্যটন ওশিয়ানিয়ার দেশগুলির অর্থনীতিতে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। প্রতিবছর প্রায় ১ কোটি ২০ লক্ষ লোক এখানে বেড়াতে আসেন।
- বেশিরভাগ অঞ্চল যেহেতু দক্ষিণ গোলার্ধে তাই জুন-জুলাই মাস শীতকাল আর ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাস গরমকাল।

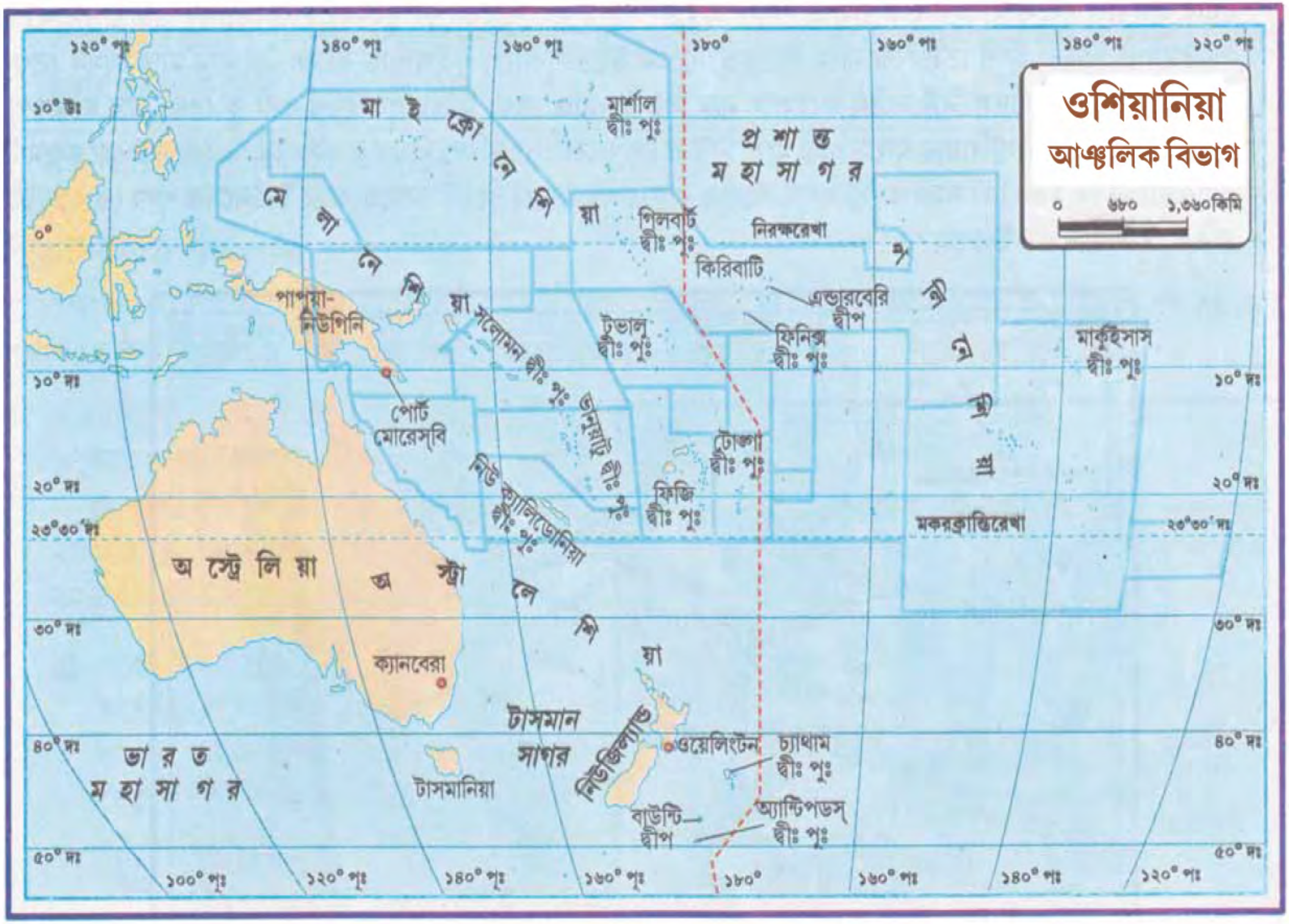
ওশিয়ানিয়া
আঞ্চলিক বিভাগ
০ ৬৮০ ১,৩৬০কিমি
মাইক্রোনেশিয়া
মেলানেশিয়া
পলিনেশিয়া
প্রশান্ত মহাসাগর
ভারত মহাসাগর
অস্ট্রেলিয়া
মার্শাল দ্বীঃ পুঃ
গিলবার্ট দ্বীঃ পুঃ
নিরক্ষরেখা
কিরিবাটি
এন্ডারবেরি দ্বীপ
ফিনিক্স দ্বীঃ পুঃ
টুভালু দ্বীঃ পুঃ
পাপুয়া-নিউগিনি
সলোমন দ্বীঃ পুঃ
ভানুয়াটু দ্বীঃ পুঃ
পোর্ট মোরেসবি
টোঙ্গা দ্বীঃ পুঃ
ফিজি দ্বীঃ পুঃ
নিউ ক্যালিডোনিয়া দ্বীঃ পুঃ
মার্কুইসাস দ্বীঃ পুঃ
মকরক্রান্তিরেখা
ক্যানবেরা
টাসমান সাগর
নিউজিল্যান্ড
ওয়েলিংটন
চ্যাথাম দ্বীঃ পুঃ
টাসমানিয়া
বাউন্টি-দ্বীপ
অ্যান্টিপডস্ দ্বীঃ পুঃ
১২০° পূঃ
১৪০° পূঃ
১৬০° পূঃ
১৮০°
১৬০° পঃ
১৪০° পঃ
১২০° পঃ
১০০° পূঃ
১০° উঃ
০°
১০° দঃ
২০° দঃ
২৩°৩০' দঃ
৩০° দঃ
৪০° দঃ
৫০° দঃ

এক নজরে
ওশিয়ানিয়া

- **আয়তন :** ৪৪ লক্ষ বর্গ কিমি।
- **সীমা :** উত্তরে ১৫° উত্তর অক্ষাংশ (হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের উত্তরসীমা) থেকে দক্ষিণে ৪৭° দক্ষিণ অক্ষাংশ (নিউজিল্যান্ডের দক্ষিণ সীমা) আর পশ্চিমে ১১৪° পূর্ব দ্রাঘিমা (অস্ট্রেলিয়ার পশ্চিম সীমা) থেকে ১৩৪°পশ্চিম দ্রাঘিমা (গ্যাম্বিয়ার দ্বীপপুঞ্জ) পর্যন্ত বিস্তৃত।
- **সর্বোচ্চ শৃঙ্গ :** পাপুয়া নিউগিনির মাউন্ট উইলহেলম (৪৫০৯ মি)।

  দীর্ঘতম নদী: অস্ট্রেলিয়ার মারে-ডার্লিং (৩৭৫২ কিমি)।
- **দেশ:** সার্বভৌম দেশের সংখ্যা - ১৪ নির্ভরশীল অঞ্চলের সংখ্যা-২১ (ক্ষুদ্রতম দেশ- নাউরু, বৃহত্তম দেশ- অস্ট্রেলিয়া।
- **জনসংখ্যা :** ৩,৫১, ৬২, ৬৭০ জন (২০১১সাল)।
- **ভাষা :** ২৮ টি।
- **প্রধান প্রধান শহর :** ক্যানবেরা, সিডনি, মেলবোর্ন, পারথ, এডিলেড, হোবার্ট (অস্ট্রেলিয়া), ওয়েলিংটন, অকল্যান্ড (নিউজিল্যান্ড), পোর্ট মোরেসবি (পাপুয়া নিউগিনি)।

- ওশিয়ানিয়া যেহেতু দ্বীপ মহাদেশ তাই সব দিকেই কোনো না কোনো সাগর বা মহাসাগর দিয়ে ঘেরা। মানচিত্র দেখে লিখে ফেলো কোন দিকে কোন মহাসাগর আছে।

- সবাই মানচিত্র ভালো করে দেখো আর বন্ধুরা একে অন্যকে ওশিয়ানিয়ার নানা দেশ বা শহর খুঁজে বার করতে বলো।

ওশিয়ানিয়া অভিযান

ইউরোপীয়দের অভিযানের আগে ওশিয়ানিয়ার দ্বীপগুলিতে বসবাস করত বিভিন্ন আদিবাসীরা। যেমন- অস্ট্রেলিয়ায় অ্যাবরিজিন্যাল, নিউজিল্যান্ডে মাওরি। ষোড়শ শতাব্দীতে ফার্দিনান্দ ম্যাগেলান তার বিখ্যাত পৃথিবী পরিভ্রমণের সময় ম্যারিনাস সহ কয়েকটি দ্বীপের সন্ধান পান। ১৬৪৪ সালে ডাচ নাবিক এবেল তাসমান অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, টোঙ্গা, ফিজি দ্বীপপুঞ্জে পৌছান। ১৭৭০ সালে জেমস কুক অস্ট্রেলিয়ার পূর্ব উপকূল (সিডনি) ও প্রশান্ত মহাসাগরের বিভিন্ন দ্বীপে পা রাখেন।

এবেল তাসমান

১৭৮৯ সালে ব্রিটিশ রয়্যাল নৌবাহিনীর বিদ্রোহীরা পিটকেয়ার্ন দ্বীপে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। এরপরে অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, ফিজিতে ব্রিটিশ উপনিবেশ স্থাপিত হয়। পরে অন্যান্য ইউরোপীয় শক্তি বিশেষত ফরাসিরা কয়েকটি দ্বীপে আধিপত্য বিস্তার করে। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে অস্ট্রেলিয়ায় সোনার খনি আবিষ্কার এবং অন্যান্য সম্পদের টানে ইউরোপ থেকে দলে দলে মানুষ এসে ভিড় করতে থাকে।

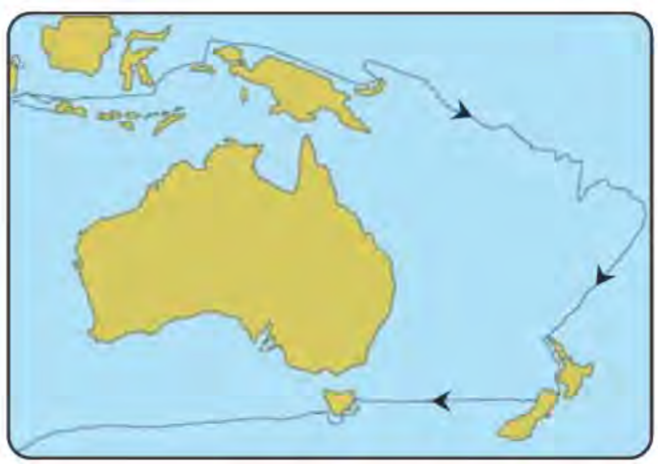

এবেল তাসমানের ভ্রমণ পথ

ওশিয়ানিয়ার আঞ্চলিক বিভাগ

অস্ট্রেলেশিয়া
অস্ট্রেলিয়া আর নিউজিল্যান্ড

মেলানেশিয়া
(মেলা — কালো, নেশিয়া —ভূখণ্ড বা দেশ। এখানকার দেশগুলোর অধিবাসীদের গায়ের রং কালো বলে এরকম নাম।)
নিউগিনি, সলোমন, ফিজি, নরফোক, নিউ ক্যালিডোনিয়া, নিউ হেব্রিডিজ প্রভৃতি।

মাইক্রোনেশিয়া
(মাইক্রো—ক্ষুদ্র)
গুয়াম, মার্শাল, নাউরু, কিরিবাটি প্রভৃতি ছোটো ছোটো দ্বীপ নিয়ে গঠিত।

পলিনেশিয়া
(পলি — বহু)
ওশিয়ানিয়ার একেবারে পূর্বদিকে হাওয়াই, সামোয়া, টোঙ্গা, কুক, ইস্টার, পিটকেয়ার্ন, তাহিতি প্রভৃতি অসংখ্য দ্বীপ নিয়ে গঠিত।

মানচিত্রের মধ্যে ওশিয়ানিয়ার চারটি অঞ্চলের দ্বীপগুলোকে খুঁজে বার করে পেনসিল দিয়ে চিহ্নিত করো।

ওশিয়ানিয়ার প্রাকৃতিক পরিবেশ

ভূপ্রাকৃতিক বৈচিত্র্য

ছোটো বড়ো অসংখ্য দ্বীপ নিয়ে গঠিত ওশিয়ানিয়া। ভূপ্রকৃতির মধ্যেও অনেক পার্থক্য রয়েছে। এখানকার প্রধান ভূখণ্ডগুলোর ভূপ্রকৃতি হলো—

অস্ট্রেলিয়ার ভূপ্রকৃতি :

ভূপ্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে অস্ট্রেলিয়াকে চারটি অঞ্চলে ভাগ করা যায় —

➢ **পূর্বের উচ্চভূমি** — অস্ট্রেলিয়ার পূর্বদিক বরাবর উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত হয়েছে একটি প্রাচীন ভঙ্গিল পর্বতশ্রেণি। এর নাম গ্রেট ডিভাইডিং রেঞ্জ। এই পর্বতশ্রেণি বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নামে পরিচিত। যেমন -ডার্লিং ডাউনস্, অস্ট্রেলিয়ান আল্পস, ব্লু রেঞ্জ, নিউ ইংল্যান্ড রেঞ্জ, লিভারপুল রেঞ্জ। নিউইংল্যান্ড রেঞ্জের মাউন্ট কোসিয়াস্কো (২২৩০ মিটার) অস্ট্রেলিয়ার সর্বোচ্চ শৃঙ্গ।

মাউন্ট কোসিয়াস্কো

গ্রেটস্যান্ডি মরুভূমি

➢ **পশ্চিমের মালভূমি** — অস্ট্রেলিয়ার পশ্চিমে অর্ধেকের বেশি অংশ জুড়ে উঁচু নিচু ঢেউ খেলানো মালভূমি দেখা যায়। এখানকার গড় উচ্চতা ২০০-৫০০ মিটার। এই মালভূমির শিলাগুলো ভারতের দাক্ষিণাত্য মালভূমির মতোই পুরানো। পূর্ব ও পশ্চিমে কয়েকটি ছোটো ছোটো পাহাড় দেখা যায়। আর মাঝখানে রয়েছে মরুভূমি অঞ্চল। এই মরুভূমির বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন নাম রয়েছে। যেমন — ভিক্টোরিয়া, গিবসন, গ্রেটস্যান্ডি মরুভূমি। মরুভূমির মধ্যে মাঝে মাঝে লবণাক্ত জলের হ্রদ (প্লায়া) ও মরুদ্যান দেখা যায়।

লাল স্যান্ডস্টোন শিলায় গঠিত আয়ার রক অস্ট্রেলিয়ার পশ্চিমের মালভূমি অঞ্চলের একটি দর্শনীয় বস্তু। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত-দিনের বিভিন্ন সময় এর রং পরিবর্তন হয়। কখনো এটাকে লালচে বাদামি কখনো হলদে কখনো বা হালকা বেগুনি দেখতে লাগে।

➢ **মধ্যভাগের সমভূমি** — পূর্বে গ্রেট ডিভাইডিং রেঞ্জ আর পশ্চিমে মালভূমির মাঝের অঞ্চল সমতল। গ্রে আর সেলউইন নামে দুটি উচ্চভূমি এই সমতল ভূমিকে তিনভাগে ভাগ করেছে। দক্ষিণে রয়েছে মারে ডার্লিং নদীর অববাহিকা বা রিভোরিনা সমভূমি, মাঝে আয়ার হ্রদের অববাহিকা আর উত্তরে কার্পেন্টেরিয়া নিম্নভূমি। কার্পেন্টেরিয়া নিম্নভূমি অঞ্চলে শিলাস্তরের আকৃতি এমনই (গামলার মতো) যে কূপ খুঁড়লে মাটির নিচের জল পাম্পের সাহায্য ছাড়াই বেরিয়ে আসে। এই ধরনের কূপকে আর্টিজিও কূপ বলে।

➢ **উপকূলের সমভূমি** - অস্ট্রেলিয়ার চারপাশের উপকূলেই সমভূমি রয়েছে। তবে বেশিরভাগ সমভূমিই খুব সংকীর্ণ। উত্তরে কার্পেন্টারিয়া উপসাগর ও দক্ষিণে গ্রেট অস্ট্রেলিয়ান বাইটের উপকূল কিছুটা চওড়া। আর উত্তর-পূর্ব উপকূল বরাবর সমুদ্রের মধ্যে সমান্তরালে অবস্থান করছে পৃথিবীর বৃহত্তম প্রবাল প্রাচীর গ্রেট ব্যারিয়ার রিফ।

নানা জীবের আবাসস্থল গ্রেট ব্যারিয়ার রিফ

- গ্রেট ব্যারিয়ার রিফ অস্ট্রেলিয়ার পূর্ব উপকূলের একটি আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। অস্ট্রেলিয়ার উত্তর-পূর্ব উপকূল থেকে ৮০-২০৫ কিমি দূরত্বে প্রবাল কীট জমে সমুদ্রের মধ্যে এক আশ্চর্য প্রাচীর সৃষ্টি হয়েছে। এই প্রবাল প্রাচীর উপকূলের সমান্তরালে ২০০০ কিমি প্রসারিত হয়েছে। জাহাজ চলাচলে বাধা সৃষ্টি করে বলে এই প্রাচীরের নাম গ্রেট ব্যারিয়ার রিফ। এর সম্পর্কে ছবি ও তথ্য জোগাড় করো।
- আমাদের দেশের কোথায় কোথায় প্রবাল দ্বীপ আছে বলোতো?
- মানচিত্রের মধ্যে কোসিয়াস্কো শৃঙ্গ, গ্রেট ভিক্টোরিয়া মরুভূমি, কিম্বার্লি মালভূমি, কার্পেন্টারিয়া উপসাগর, গ্রেট অস্ট্রেলিয়ান বাইট চিহ্নিত করো।

নিউজিল্যান্ডের ভূপ্রকৃতি :

উত্তর ও দক্ষিণ নামে দুটি বড় দ্বীপ আর স্টুয়ার্ট, চ্যাথাম প্রভৃতি কয়েকটি ছোটো দ্বীপ নিয়ে গড়ে উঠেছে নিউজিল্যান্ড। এখানকার বেশিরভাগ ভূমিই পর্বতময়। অনেকগুলো আগ্নেয়গিরি (মাউন্ট এগমন্ট, রুহাপেহু) আছে এখানে। দক্ষিণ দ্বীপের দক্ষিণ আল্পস প্রধান পর্বতশ্রেণি। এই পর্বতশ্রেণির মাউন্ট কুক (৩৭৬৪ মি) নিউজিল্যান্ডের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ। এই দ্বীপের পূর্ব উপকূল বরাবর গড়ে উঠেছে বিখ্যাত 'ক্যান্টারবেরি সমভূমি'। নিউজিল্যান্ডের প্রধান প্রধান নদ-নদী হলো ওয়াইটাকি, ক্লুথ, ওয়ানগামুই, টায়েরি। এগুলো দৈর্ঘ্যে ছোটো এবং খরস্রোতা। এদেশের পার্বত্য অঞ্চলে অনেক হিমবাহ সৃষ্ট হ্রদ রয়েছে।

মাউন্ট কুক

ক্যান্টারবেরি সমভূমি

মেলানেশিয়া, মাইক্রোনেশিয়া ও পলিনেশিয়ার ভূপ্রকৃতি :

হাজার হাজার দ্বীপ নিয়ে গঠিত এই তিনটি অঞ্চল। এখানকার বেশিরভাগ দ্বীপগুলি গঠিত হয়েছে সমুদ্রের তলদেশে আগ্নেয় পদার্থ জমা হয়ে। পাপুয়া নিউগিনির মাউন্ট উইলহেলম্ (৪৫০৯ মি.) ওশিয়ানিয়ার সর্বোচ্চ শৃঙ্গ। হাওয়াই, সলোমন, ফিজি, তাহিতি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য আগ্নেয় দ্বীপ। হাওয়াই দ্বীপে মৌনালোয়া, কিলাউইয়া প্রভৃতি আগ্নেয়গিরি অবস্থিত। মার্শাল, গিলবার্ট, ক্যারোলাইন প্রভৃতি দ্বীপগুলি আবার মৃত প্রবাল জমে সৃষ্টি হয়েছে।

মৌনালোয়ার মোট উচ্চতা মাউন্ট এভারেস্টের থেকেও বেশি!

বিষয়টা কিন্তু সত্যি! এর মোট উচ্চতা সমুদ্র তলদেশ থেকে ৯,১৭০ মিটার। এর মধ্যে ৫,০০০ মিটার রয়েছে সমুদ্রপৃষ্ঠের নীচে আর বাকি ৪,১৭০ মিটার রয়েছে সমুদ্রপৃষ্ঠের উপরে (মাউন্ট এভারেস্টের উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৮,৮৪৮ মিটার)। তাই মোট উচ্চতার বিচারে মৌনালোয়ার উচ্চতা বেশি। কিন্তু পৃথিবীর স্থলভাগের উচ্চতা মাপা হয় সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে। তাই মাউন্ট এভারেষ্ট পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ।

নদনদী ও হ্রদ

নদীর নাম	উৎস	মোহনা	বৈশিষ্ট্য
অস্ট্রেলিয়া			
মারে—ডার্লিং	মারে—অস্ট্রেলিয়ান আল্পস ডার্লিং—নিউ ইংল্যান্ড রেঞ্জ	এনকাউন্টার উপসাগর	ওশিয়ানিয়ার দীর্ঘতম নদী
হান্টার, ফ্রিজয়, ব্রিসবেন	গ্রেট ডিভাইডিং রেঞ্জ	প্রশান্ত মহাসাগর	
কুপার, আয়ার	পূর্ব ও পশ্চিমের মালভূমি	আয়ার হ্রদ	অন্তর্বাহিনী নদী
নিউজিল্যান্ড			
ওয়াইটাকি	বেনমোর হ্রদ	প্রশান্ত মহাসাগর	নিউজিল্যান্ডের দীর্ঘতম নদী
ক্লাথা	ওয়ানাকা হ্রদ	প্রশান্ত মহাসাগর	
পাপুয়া-নিউগিনি			
ফ্লাই	ভিক্টর ইমানুয়েল রেঞ্জ	পাপুয়া উপসাগর	

অস্ট্রেলিয়ার মধ্য ও পশ্চিমে অসংখ্য হ্রদ রয়েছে। তবে বেশির ভাগই শুষ্ক ও লবণাক্ত। এদের মধ্যে মধ্যভাগের আয়ার, টরেন্স আর পশ্চিমের মরুভূমির ম্যাকে, উইলস উল্লেখযোগ্য। নিউজিল্যান্ডের পার্বত্য অঞ্চলে অসংখ্য হিমবাহ সৃষ্ট হ্রদ আছে। তাউপো হলো এদের মধ্যে বৃহত্তম।

জলবায়ু

ওশিয়ানিয়া উত্তরে উত্তর দ্বীপ (১০° উঃ) থেকে দক্ষিণে স্টুয়ার্ট দ্বীপ (৪৭° দঃ) পর্যন্ত বিস্তৃত। ফলে এই অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে জলবায়ুর পার্থক্য দেখা যায়। ছোটো ছোটো দ্বীপগুলির জলবায়ুতে সমুদ্রের প্রভাব দেখা যায়। আবার অস্ট্রেলিয়ার মতো বড়ো স্থলভাগের ভেতরে জলবায়ু চরমভাবাপন্ন হয়। এই পার্থক্যের জন্য মহাদেশকে কয়েকটি জলবায়ু অঞ্চলে ভাগ করা যায়।

➢ **নিরক্ষীয় জলবায়ু** -মেলানেশিয়া,পলিনেশিয়া, মাইক্রোনেশিয়ার দ্বীপপুঞ্জগুলোতে নিরক্ষীয় জলবায়ু দেখা যায়। সারা বছর উচ্চ তাপমাত্রা (২৮° সে) ও বৃষ্টিপাত (২০০ সেমি) এখানকার জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য।

➢ **ক্রান্তীয় মৌসুমি জলবায়ু** — অস্ট্রেলিয়ার উত্তর ও উত্তর পূর্বাংশে এই জলবায়ু দেখা যায়। এখানে শীতকাল শীতল ও শুষ্ক আর গ্রীষ্মকালে মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে বৃষ্টিপাত হয়। বাৎসরিক গড় বৃষ্টিপাত ১৫০ সেমি।

➢ **নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু** — অস্ট্রেলিয়ার মারে-ডার্লিং অববাহিকা ও পূর্ব উপকূলে ব্রিসবেনে এই জলবায়ু লক্ষ করা যায়। এখানকার উপকূল অঞ্চলে সারা বছর আয়ন বায়ু (গ্রীষ্মকালে) ও পশ্চিমা বায়ুর (শীতকালে) প্রভাবে বৃষ্টি হয়।

➢ **ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু** — অস্ট্রেলিয়ার উপকূল বরাবর পারথ্ আর অ্যাডিলেড অঞ্চলে এই জলবায়ুর প্রভাব রয়েছে। এখানে পশ্চিমা বায়ুর প্রভাবে শীতকালে বৃষ্টি (বাৎসরিক গড় বৃষ্টিপাত ৭৫ সে) হয়, গ্রীষ্মকাল উষ্ণ।

➢ **ক্রান্তীয় মরু ও মরুপ্রায় জলবায়ু** — অস্ট্রেলিয়ার মধ্য ও পশ্চিমাংশের এই জলবায়ু অঞ্চলে বৃষ্টি হয় না বললেই চলে। বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ২৫ সেমির কম। গ্রীষ্মকাল বেশ উষ্ণ আর শীতকাল শীতল।

➢ **ব্রিটিশ জলবায়ু** — দক্ষিণ-পূর্ব অস্ট্রেলিয়া, তাসমানিয়া, নিউজিল্যান্ডে এই জলবায়ু দেখা যায়। গ্রীষ্মকাল হালকা উষ্ণ (১৫°সে) আর শীতকালে বেশ শীত (৫° সে)। পশ্চিমা বায়ুর প্রভাবে এখানে সারাবছর প্রচুর বৃষ্টি (২০০ সেমি) হয়।

স্বাভাবিক উদ্ভিদ

জলবায়ুর তারতম্যের কারণে ওশিয়ানিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে বনভূমির পার্থক্য দেখা যায়।

➢ **ক্রান্তীয় চিরহরিৎ অরণ্য** : মেলানেশিয়া, মাইক্রোনেশিয়া আর পলিনেশিয়ার বিভিন্ন দ্বীপে উষ্ণতা ও আর্দ্রতা বেশি হওয়ায় ঘন চিরহরিৎ বনভূমির সৃষ্টি হয়েছে। এখানে মেহগিনি, পাম, এবনি প্রভৃতি গাছ জন্মায়।

➢ **ক্রান্তীয় পর্ণমোচী অরণ্য** : অস্ট্রেলিয়ার উত্তর ও উত্তর-পূর্ব দিকে মৌসুমি জলবায়ুর প্রভাবে পর্ণমোচী জাতীয় বনভূমি দেখা যায়। পাম, বার্চ , সিডার, বাঁশ এখানে জন্মায়।

➢ **নাতিশীতোষ্ণ অরণ্য** : পূর্ব অস্ট্রেলিয়া, তাসমানিয়া আর নিউজিল্যান্ডে বৃহৎ পাতা যুক্ত নাতিশীতোষ্ণ পর্ণমোচী গাছ দেখা যায়। এরা শীতের আগে পাতা ঝরিয়ে দেয়। ওক, ম্যাপল, পপলার, এলম এখানকার প্রধান প্রধান উদ্ভিদ।

➢ **ক্রান্তীয় তৃণভূমি** : অস্ট্রেলিয়ার উত্তরে কম বৃষ্টিপাত যুক্ত অঞ্চলে বড়ো বড়ো ঘাস জন্মায়। অস্ট্রেলিয়ার এই অঞ্চল 'পার্কল্যান্ড সাভানা' নামে পরিচিত। এই তৃণভূমিতে মাঝে মাঝে ইউক্যালিপটাস, জুরা জাতীয় গাছ দেখা যায়।

➢ **নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমি** : গ্রেট ডিভাইডিং রেঞ্জের পশ্চিমদিকে মারে-ডার্লিং অববাহিকায় ছোটো ছোটো ঘাসের বিশাল তৃণভূমি দেখা যায়। এই তৃণভূমি 'ডাউনস্' নামে পরিচিত।

➢ **মরু উদ্ভিদ** : অস্ট্রেলিয়ার পশ্চিমের মরুভূমি অঞ্চলে কম বৃষ্টিপাতের কারণে ক্যাকটাস, মালাগার, লবণাম্বু ঝোপঝাড় প্রভৃতি জন্মায়।

➢ **ভূমধ্যসাগরীয় উদ্ভিদ :** অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণাংশে বিক্ষিপ্তভাবে এই বনভূমি গড়ে উঠেছে। জারা, কারি, ব্লু-গাম প্রভৃতি প্রধান উদ্ভিদ।

ডাউনস্ তৃণভূমি

● ওশিয়ানিয়ার জলবায়ু ও স্বাভাবিক উদ্ভিদের মানচিত্রের মধ্যে কী কোনো মিল দেখতে পাচ্ছো? মিলগুলো লিখে ফেলো।

শূন্যস্থানে সঠিক শব্দ বসাও

জলবায়ু	স্বাভাবিক উদ্ভিদ/তৃণভূমি
______	মেহগনি
নাতিশীতোষ্ণ	______
______	মালাগার
ক্রান্তীয় মৌসুমি	______

মারে-ডার্লিং অববাহিকা

অস্ট্রেলিয়ার পূর্বে গ্রেট ডিভাইডিং রেঞ্জ আর পশ্চিমে মালভূমি অঞ্চল। এদের মাঝে অবস্থিত মধ্যভাগের সমভূমি। এই সমভূমির দক্ষিণ অংশে (অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ-পূর্বে) মারে আর তার প্রধান উপনদী ডার্লিং এবং অন্যান্য উপনদী যে সমভূমি গঠন করেছে তা মারে-ডার্লিং অববাহিকা নামে পরিচিত। এই অঞ্চল অস্ট্রেলিয়ার সবচেয়ে সমৃদ্ধ, ঘনবসতিপূর্ণ ও উন্নত অঞ্চল। কৃষি ও পশুপালনের জন্য এই অঞ্চল পৃথিবী বিখ্যাত।

সীমা ও আয়তন - এই অঞ্চলটি ২৪° দক্ষিণ অক্ষাংশ থেকে ৩৯° দক্ষিণ অক্ষাংশ এবং ১৩৮° পূর্ব দ্রাঘিমা থেকে ১৪৯° পূর্ব দ্রাঘিমার মধ্যে বিস্তৃত। এই অববাহিকার উত্তর আর পূর্ব দিকে আছে গ্রেট ডিভাইডিং রেঞ্জ, পশ্চিমে রয়েছে লফটি রেঞ্জ, ব্যারিয়ার রেঞ্জ, গ্রে রেঞ্জ আর দক্ষিণে আছে গ্রেট অস্ট্রেলিয়ান বাইট। এই অববাহিকা অস্ট্রেলিয়ার প্রায় ২০ ভাগ স্থান জুড়ে অবস্থান করছে।

ভূপ্রকৃতি — এই অববাহিকা একটি নিম্ন সমতলভূমি। মারে-ডার্লিং নদী দীর্ঘদিন ধরে পলি জমা করে এই সমভূমি গঠন করেছে। এই অঞ্চলের গড় উচ্চতা ১০০-২০০ মিটার।এই অববাহিকা মধ্যভাগ থেকে ক্রমশ পশ্চিমে ও পূর্ব দিকে উঁচু হয়ে গেছে।

দেখো তো উত্তর দিতে পারো কিনা :

মারে ডার্লিং নদীর অববাহিকার ঢাল কোন দিক থেকে কোন দিকে?

সূত্র — নদীর গতিপথ দেখো

ধারণা মানচিত্রটি পূরণ করে ফেলো

নদনদী — এই অববাহিকার প্রধান নদী হলো মারে ডার্লিং। ডার্লিং হলো মারের উপনদী। মারের উৎপত্তি হয়েছে অস্ট্রেলিয়ান আল্পস পর্বত থেকে। আর ডার্লিং এর সৃষ্টি হয়েছে নিউইংল্যান্ড রেঞ্জ থেকে। দুটি নদী ওয়েন্টওয়ার্থ শহরের কাছে মিলিত হয়েছে। এরপর এই মিলিত প্রবাহ দক্ষিণ পশ্চিমে প্রবাহিত হয়ে এনকাউন্টার উপসাগরে পড়েছে।

ধারণা মানচিত্রে ছকগুলো পূরণ করো।

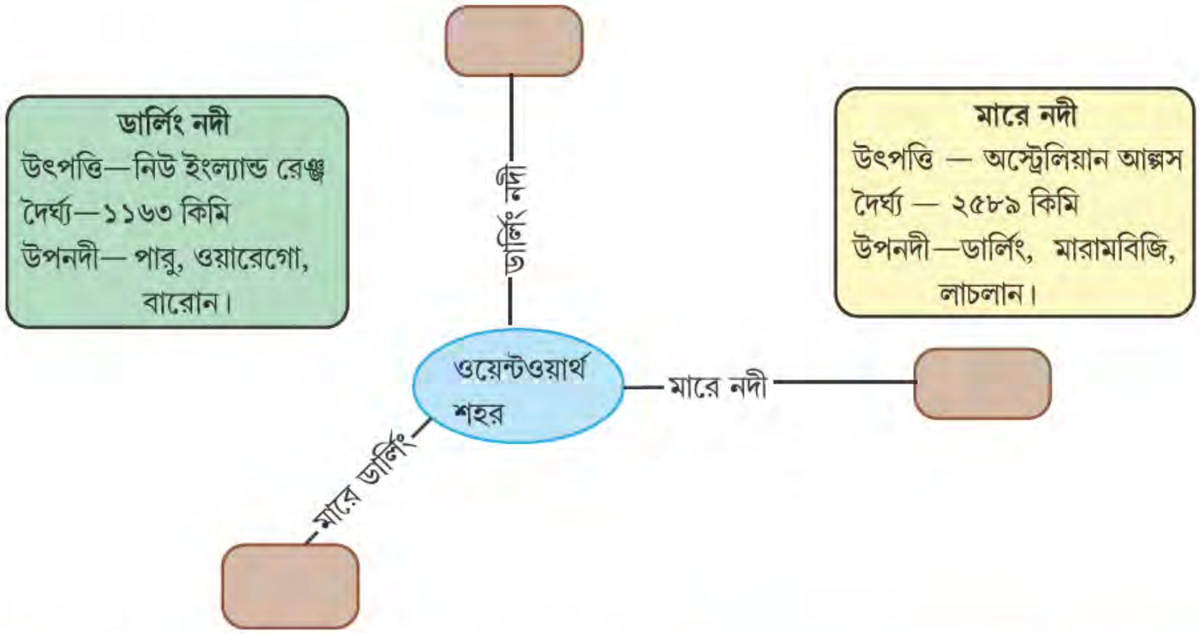

জলবায়ু — এই অববাহিকার জলবায়ু মূলত নাতিশীতোষ্ণ প্রকৃতির। গ্রীষ্মকাল ও শীতকালে গড় তাপমাত্রা থাকে যথাক্রমে ২৫° সে এবং ১০° সে। গ্রেট ডিভাইডিং রেঞ্জের পশ্চিমে বৃষ্টিছায় অঞ্চলে অবস্থিত বলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কম, বছরে মাত্র ৫০সেমি — ৭৫ সেমি। দক্ষিণের সমুদ্র উপকূলে ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুর প্রভাব দেখা যায়।

স্বাভাবিক উদ্ভিদ — নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু ও কম বৃষ্টিপাতের জন্য এখানে তৃণভূমির সৃষ্টি হয়েছে যা ডাউনস নামে পরিচিত। কয়েকটি স্থানে ওক, ম্যাপল, পপলার প্রভৃতি পর্ণমোচী গাছ দেখা যায়। অ্যাডিলেড অঞ্চলে ভূমধ্যসাগরীয় উদ্ভিদ জন্মায়।

কৃষি ও পশুপালন — মারে-ডার্লিং অববাহিকা অস্ট্রেলিয়ার সবচেয়ে কৃষি সমৃদ্ধ অঞ্চল। এখানে উন্নত যন্ত্রের সাহায্যে গম, যব, ভুট্টা, ওট, রাই উৎপাদন করা হয়। দক্ষিণের ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু অঞ্চলে আঙুর, লেবু, আপেল, পিচ, কমলালেবু, ন্যাসপাতি প্রভৃতি ফলের চাষ হয়।

এই অববাহিকার ডাউনস তৃণভূমিতে মেরিনো, লিঙ্কন, মার্স প্রভৃতি ভালো জাতের ভেড়া পালন করা হয়। এই অঞ্চলের উত্তরে কুইন্সল্যান্ড আর দক্ষিণ-পূর্বে নিউ সাউথওয়েলসে গবাদি পশুপালন করা হয়। এদের থেকে প্রচুর মাংস ও দুগ্ধজাত দ্রব্য উৎপাদিত হয়। অস্ট্রেলিয়া গো-মাংস উৎপাদনে পঞ্চম ও পশম উৎপাদনে প্রথম স্থান অধিকার করে।

এখানকার পশুখামারগুলো খুব বড়ো আর যারা এখানে শ্রমিকের কাজ করে তাদের **জ্যাকোস (Jackaos)** বলে।

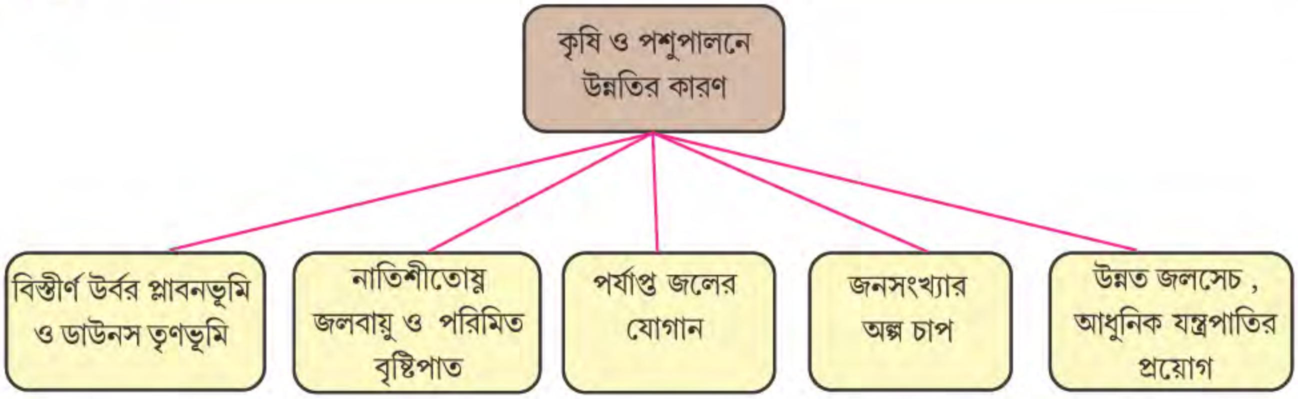

ডাউনস তৃণভূমি

মেরিনো মেষের লোম কাটা হচ্ছে

খনিজ সম্পদ — এখানে খনিজ সম্পদ সেভাবে পাওয়া যায় না। অববাহিকার প্রান্তবর্তী অঞ্চলে সোনা, রুপা, তামা, সিসা, টিন পাওয়া যায়। ব্রোকেনহিলে রুপা, তামা আর কোবারে তামা উত্তোলিত হয়। **ব্রোকেনহিলকে রুপোর শহর** বলা হয়। অ্যাডিলেড অঞ্চলে সামান্য কয়লা পাওয়া যায়।

ব্রোকেন হিলের রুপোর খনি

মারে-ডার্লিং অববাহিকার খনিজ সম্পদ

শিল্প— খনিজ সম্পদের অভাবে এখানে ধাতব শিল্পের সেভাবে বিকাশ ঘটেনি। কৃষি ও পশু সম্পদের ওপর নির্ভর করে পশম, বস্ত্রবয়ন, ডেয়ারি, ময়দা, বেকারি, মাংস শিল্প গড়ে উঠেছে। এছাড়া ইঞ্জিনিয়ারিং ও রাসায়নিক শিল্পও গড়ে উঠেছে। অ্যাডিলেড, ব্রোকেনহিল, মিলডুরা এখানকার প্রধান শিল্পকেন্দ্র।

জনবসতি ও শহর—এই অঞ্চল কিছুটা ঘনবসতিপূর্ণ। তবে জনসংখ্যার বেশিরভাগ বাস করে উপকূলবর্তী অঞ্চলে। অ্যাডিলেড এই অববাহিকার প্রধান শহর ও বাণিজ্যকেন্দ্র। ব্রোকেনহিল, মিলডুরা অন্যান্য উল্লেখযোগ্য শহর।

➢ মিলিয়ে নাও।

ক	খ
মারে	শ্রমিক
ওক	উৎকৃষ্ট পশমপ্রদায়ী মেষ
মেরিনো	রুপোর শহর
ব্রোকেনহিল	অস্ট্রেলিয়ান আল্পস
জ্যাকোস	স্বাভাবিক উদ্ভিদ

➢ ছকের মধ্যে লিখে ফেলো কেন / কীভাবে পরিচিত।

নিউ ইংল্যান্ড রেঞ্জ	মারামবিজি	ডাউনস্	অ্যাডিলেড

➢ মারে নদীর গতিপথ দেখে ক্রমান্বয়ে সাজিয়ে লেখো।

ওয়েন্টওয়ার্থ শহর, অস্ট্রেলিয়ান আল্পস, এনকাউন্টার উপসাগর, মারামবিজি।

তোমার পাতা

তোমার পাতা

অষ্টম শ্রেণি

নমুনা প্রশ্নপত্র

১। বহু বিকল্পভিত্তিক প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মান ১)

সঠিক উত্তর নির্বাচন করো :—

(ক) সিয়াল ও সিমা স্তরের মাঝে গুটেনবার্গ/কনরাড/মোহো/লেহম্যান বিযুক্তি রেখা দেখা যায়।

(খ) কানাডার শিল্ড অঞ্চলের ভূমিরূপ প্রধানত নদী/বায়ু/হিমবাহ/সমুদ্রের ক্ষয়ের ফলে সৃষ্টি হয়েছে।

২। নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন/অতিসংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মান ১)

(i) শূন্যস্থান পূরণ করো :—

(খ) কলোরাডো নদীতে গ্র্যান্ড ______________ সৃষ্টি হয়েছে।

(খ) গ্রিসে প্রধানত ______________ জলবায়ু দেখা যায়।

(ii) শুদ্ধ/অশুদ্ধ লেখো : —

(ক) মধ্য সামুদ্রিক শৈলশিরা বরাবর পাতের অপসারণ ঘটছে।

(খ) নিরক্ষীয় অঞ্চলে বায়ুর নিম্নমুখী স্রোত দেখা যায়।

(iii) স্তম্ভ মেলাও : —

ক	খ
পরিচলন স্রোত	আর্বতন গতি
বায়ুর গতিবিক্ষেপ	বজ্রপাত ঝড় বৃষ্টি
কিউমুলোনিম্বাস	পাতের সরণ

(iv) এক কথায় উত্তর দাও :—

(ক) ইউরোপের একটি আগ্নেয়গিরির নাম করো।

(খ) কোন শিলায় প্রধানত মহাদেশীয় ভূত্বক তৈরি হয়?

৩। সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন [প্রতিটি প্রশ্নের মান ২]

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও (অনধিক দু-তিনটি বাক্য) :—

(ক) ভূমিকম্প হঠাৎ শুরু হলে কী করা উচিত?

(খ) অস্ট্রেলিয়ার একটি পর্বতশ্রেণি ও একটি মরুভূমির নাম লেখো।

৪। সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যামূলক উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মান ৩)

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও (অনধিক ছয় বাক্য) :—

(ক) পাললিক শিলা ও রূপান্তরিত শিলার তুলনা করো।

(খ) পরিবেশের অবনমন কীভাবে ঘটে?

৫। ব্যাখ্যামূলক উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মান ৫)

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও (অনধিক বারোটি বাক্য) :—

(ক) পাতের চলনের ফলে কীভাবে বিভিন্ন ভূমিরূপ সৃষ্টি হয় তা ব্যাখ্যা করো।

(খ) দক্ষিণ আমেরিকার ভূপ্রকৃতির শ্রেণিবিভাগ করো। যেকোনো একটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

৬। পৃথিবীর রেখা মানচিত্রে প্রতীক ও চিহ্নসহ নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বসাও (প্রতিটির মান ১)।

(ক) সুপিরিয়র হ্রদ (খ) অ্যাকোনকাগুয়া (গ) আটাকামা মরুভূমি (ঘ) মাউন্ট কুক (ঙ) ক্যানবেরা।

ওপরের নমুনা ছাড়াও আরও অন্যান্য ধরনের প্রশ্নও দেওয়া যেতে পারে। যেমন—

➧ নীচের রেখাচিত্রটিতে পৃথিবীর চাপবলয়গুলি চিহ্নিত করে খাতায় লেখো:(১/২ × ৬)

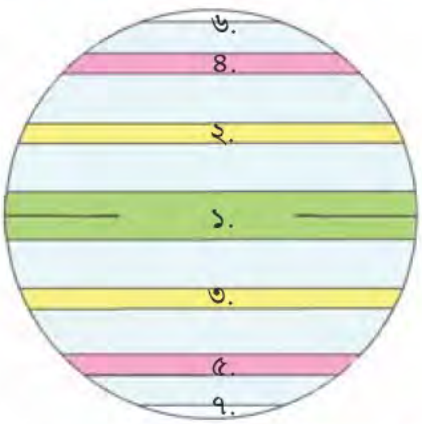

➧ নীচের ছবিটি কী ধরনের পর্বত বলে তোমার মনে হয়? এই ধরনের পর্বত কী জাতীয় পাত সীমানায় সৃষ্টি হয়? (১ + ১)

➧ নীচের ছবি দুটোর মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে লেখো। (মান ২)

শব্দছক সমাধান, শব্দের ধাঁধা, ধারণা মানচিত্র তৈরি, তথ্য মৌচাক পূরণ, বেমানান শব্দ শনাক্তকরণ (Odd one out), ভুল সংশোধন, 'আমি কে' (যেমন— আমি স্তরে স্তরে সজ্জিত শিলা। আমি কে?) ইত্যাদি ধরনের প্রশ্ন।

অষ্টম শ্রেণির বাৎসরিক পাঠ্যসূচি বিভাজন

পর্ব-I পাঠ একক	পর্ব-II পাঠ একক	পর্ব-III পাঠ একক
১. পৃথিবীর অন্দরমহল	১. চাপবলয় ও বায়ুপ্রবাহ	১. জলবায়ু অঞ্চল
২. অস্থিত পৃথিবী	২. মেঘ-বৃষ্টি	২. মানুষের কার্যাবলী ও পরিবেশের অবনমন
৩. শিলা	৩. উত্তর আমেরিকা	৩. ওশিয়ানিয়া
৪. ভারতের প্রতিবেশী দেশসমূহ ও তাদের সঙ্গে সম্পর্ক	৪. দক্ষিণ আমেরিকা	

বিশেষ দ্রষ্টব্য : তৃতীয় পর্বভিত্তিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নির্দেশিত পাঠ একক ছাড়াও প্রথম ও দ্বিতীয় পর্ব থেকে যথাক্রমে পৃথিবীর অন্দরমহল, অস্থিত পৃথিবী, শিলা, চাপবলয় ও বায়ুপ্রবাহ, মেঘ-বৃষ্টি পাঠ এককগুলি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

তৃতীয় পর্বভিত্তিক মূল্যায়নে ৫ নম্বর মানচিত্র চিহ্নিতকরণ (পৃথিবীর রেখা মানচিত্রে উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা ও ওশিয়ানিয়ার পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত বিষয়) আবশ্যিক করতে হবে।

শিখন পরামর্শ

অষ্টম শ্রেণির ভূগোল বইটিতে জীবজগৎ ও পরিবেশের পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে। বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে ভূগোল বিষয়কে জানতে ও শিখতে শেখানো এই বই-এর উদ্দেশ্য। শ্রেণি অনুযায়ী বেড়ে ওঠার সাথে সাথে নিজেকে পরিবেশের অন্তর্গত করে নেওয়া শিক্ষার অঙ্গ। সহজ ভাষা, সহজ উদাহরণের সাহায্যে শিক্ষার্থীর বাড়ি, স্কুল, পাড়া, গ্রাম, শহর অর্থাৎ তার আশপাশের পরিবেশের সাথে ভূগোল বিষয়ের মূল ধারণার সংযোগ সাধন করার জন্যই এই প্রয়াস—

শিক্ষক/শিক্ষিকার প্রতি—

- প্রাকৃতিক ও আঞ্চলিক ভূগোল বিভাগের প্রতিটি অধ্যায়ে মূল বিষয়ের ধারণা স্পষ্ট করার জন্য প্রচুর ধারণা মানচিত্র, আলোকচিত্র,সহজ মানচিত্র ব্যবহার করা হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রতিটি শিক্ষার্থীর নিজস্ব অভিজ্ঞতা, অনুমান, সংস্কার, বিশ্বাসকে কাজে লাগাতে হবে।
- শিক্ষার্থীরা যখন আলোচনা করে সিদ্ধান্তে আসবে, আপনি মূল বিষয়ে প্রবেশ করবেন। প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীর বিষয়গত ধারণা পরিষ্কার হয়েছে কিনা তা জানাবার পথ তৈরি করতে হবে। প্রশ্ন করে তাকে অপ্রস্তুত করে নয়, বরং গল্পের ছলে বা খেলার ছলে কাজটা করতে হবে।
- বইটিতে 'অনুসন্ধান', 'সমীক্ষা', এবং 'হাতে কলমে'র উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীর নিজস্ব পরিবেশ সচেতনতা এবং মানুষ ও প্রকৃতির পারস্পরিক সম্পর্ক অনুধাবন করা। এই প্রসঙ্গে অন্য কোনো উদ্ভাবনী পরীক্ষা-নিরীক্ষাও করানো যেতে পারে।
- বইটির যেখানে যেখানে হাতে কলমে কাজ করার সুযোগ তৈরি করা আছে, শিক্ষার্থীদের সেগুলো করতে উৎসাহ দেবেন। শ্রেণিকক্ষে বা শ্রেণিকক্ষের বাইরে কাজগুলো করতে প্রয়োজন বুঝে সাহায্য করবেন।
- দলগতভাবে শ্রেণিকক্ষে তথ্য ও ছবির কোলাজ তৈরি করে মূল বিষয় অনুধাবন করবে।
- আপনার সক্রিয় সহায়তা ছাড়া শিক্ষার্থীরা শিখনস্তর অতিক্রম করতে পারবে না ঠিকই, তবে শ্রেণিকক্ষে ও শ্রেণিকক্ষের বাইরে আপনিই 'মুখ্য'—এই ভাব প্রদর্শন কখনই করবেন না। শিক্ষার্থীকে স্বাধীনতা দেবেন, যাতে সে নিজেই বিষয়গুলোকে বুঝতে পারে।
- পিছিয়ে পড়াদের দিকে বিশেষ নজর দেবেন। যারা খুব সহজে শিখন স্তরে অগ্রসর হতে পারে, শুধুমাত্র তারা বুঝতে পারলেই নিশ্চিন্ত হবেন না। প্রতিটি শিক্ষার্থী যাতে সক্রিয়তা ভিত্তিক শিখনে অংশগ্রহণ করে সেইদিকে নজর দেবেন।
- শিক্ষার্থীদের নিজস্ব পরিবেশেই যে ভূগোলের বিষয়বস্তু লুকিয়ে আছে তা উদ্ভাবন করার কাজে সাহায্য করবেন।
- আশপাশের পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করার জন্য শিক্ষার্থীদের বছরের কোনো একদিন কৃষিক্ষেত্র, জলাশয়, কারখানা, প্ল্যানেটারিয়াম, আবহাওয়া অফিস, বিজ্ঞান উদ্যান বা সম্ভব হলে চিড়িয়াখানা, বনাঞ্চলে নিয়ে যাবেন। তারা ঘুরে এসে নিজস্ব প্রতিবেদন তৈরি করবে।
- শিক্ষার্থীদের কোনো কাজে ত্রুটি হলে সেটাকে ভুল বলবেন না। শিক্ষার্থীর ভুল ধারণাকে সঠিক ধারণায় নিয়ে যেতে হবে বাস্তব অভিজ্ঞতার উদাহরণ দিয়ে।